রেখার স্বামী
মুকেশের আত্মহত্যা :
অন্তরালের ঘটনাক্রম !

মিত্র প্রকাশন প্রকাশনা

আলোকপাত

নভেম্বর ১৯৯০ • মূল্য ৭·০০

শরীরের কলকব্জার বাজার

কিডনি, লিভার, চোখ ও চামড়ার বেচাকেনা

সুব্রত ভট্টাচার্য : মোহনবাগানের 'মিল্লা'

পশ্চিমবঙ্গে সংরক্ষণবিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা কম কেন ?

সেই চিঠি : জগন্ময় মিত্রের হালহকিকৎ

দেবজ্যোতি

ধুলোখেলা

অতীতের সাগর সেঁচে মনি মানিক্যের সন্ধান

Please visit : http://dhulokhela.blogspot.in/

পড়ুন ও আমাদের সংরক্ষনে সাহায্য করুন

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি : নিলয় হাজরা

স্ক্যান : দেব কুমার দেব

এডিট : স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

পঞ্চম বর্ষ * নবম সংখ্যা * নভেম্বর ১৯৯০

আলোকপাত

প্রধান সম্পাদক: আলোক মিত্র
সহায়ক সম্পাদক: রমাপ্রসাদ ঘোষাল
সহ সম্পাদক: প্রদীপ বসু
উপ সম্পাদক: গুরুপ্রসাদ মহান্তি
সংবাদদাতা
দিল্লি: পুষ্কর পুষ্প
হায়দরবাদ: পারভেজ খান
মাদ্রাজ: লক্ষ্মী মোহন
লণ্ডন: বলবন্ত কাপুর
ওয়াশিংটন: শেখর তেওয়ারি
লস এঞ্জেলেস: আফসান সফি
বম্বে ব্যুরো প্রধান: রবীন্দ্র শ্রীবাস্তব
আলোকচিত্রী: বিকাশ চক্রবর্তী
ভিসুয়ালাইজার: শ্যামল চক্রবর্তী

দিল্লি কার্যালয়:
সঞ্জয় লাল: ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপক
৩০৫ রোহিত হাউস, ৩ তলস্তয় মার্গ
নয়াদিল্লি-১১০০০১
দূরভাষ: ৩৩১৪৫৩০, ৩৩১৩৭৪৯, ৩৩১৭৪১৬
টেলেক্স: ০৩১ ৬৭১৫ নিউজ ইন
বম্বে কার্যালয়:
অনুপ জুৎসি: আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
৮১০ এমব্যাসি সেন্টার
নরীম্যান পয়েন্ট
বম্বে-৪০০০২১
দূরভাষ: ২৪৩৫৭৭, ২৪৪৮৪৬, ২৪৪৮৪৭
টেলেক্স: ০১১ ২৫৫৭ মায়া ইন
লখনউ কার্যালয়:
বি-১০৩, গোপালা অ্যাপার্টমেন্টস,
৫০, রামতীর্থ মার্গ, হজরতগঞ্জ, লখনউ-২২৬০০১
দূরভাষ: ২৪৮৮৭৮/২৪৬৩০০
ব্যুরো প্রধান: অজয় কুমার
কলকাতা সম্পাদকীয় ও ব্যবসায় কার্যালয়:
স্টিফেনস কোর্ট
ফ্ল্যাট-৫ এ (পাঁচতলা)
১৮ এ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০১৬
দূরভাষ: ২৯৯০৩৫, ২৯৮৫৪০, ২৯৭৮২৮
টেলেক্স: ০২১ ৫১৭৩, নিউজ ইন
প্রধান কার্যালয়:
মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
২৮১ মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ ২১১০০৩
দূরভাষ: ৫৩৬৮১, ৫১০৪২, ৫৫৮২৫, ৫৫৭৭৩
গ্রাম: মায়া এলাহাবাদ
টেলেক্স: ০৫৪-২৮০
প্রকাশক: দীপক মিত্র
মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২৮১ মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ-২১১০০৩ থেকে প্রকাশিত
এবং মায়া প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে অশোক মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত।
ফোটোকম্পোজিং: মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, এলাহাবাদ-এর একটি ইউনিট-সুরুচি অফসেট।

AIR SURCHARGE 50 PAISE PER COPY
for Dibrugarh, Silchar, Tinsukia, Jorhat, Tejpur, Shilong, Kathmandu and Agartala

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন পৃষ্ঠা: ৭৫

ভারতবর্ষের প্রায় সব বড় শহরের নামী হাসপাতালগুলিকে কেন্দ্র করে হত দরিদ্র বস্তি এবং টোলাগুলিতে ধরা পড়েছে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রির রমরমা গোপন বাজার, ইদানীং যা কিনা হয়ে দাঁড়িয়েছে কেন্দ্রিয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের উৎকণ্ঠার কারণ। চিকিৎসা-দুনিয়ায় ঘটে চলা এই অমানবিক ব্যবসাকে নিয়েই এবারের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন।

অনুসন্ধান পৃষ্ঠা: ৮৫

স্বামী মুকেশের আত্মহত্যায় আবারো রহস্যময়ী হয়ে পড়লেন চিত্রতারকা রেখা। কেন-ই বা তিনি হঠাৎ বিয়ে করতে গেলেন দিল্লির নব্য ব্যবসায়ী মুকেশ আগরওয়ালকে? কে এই মুকেশ? কি তাঁর পারিবারিক পশ্চাদপট? তাঁর আত্মহত্যার কারণই বা কি?-এক তথ্যময় অনুসন্ধান।

আলোকপাত

শরীরের কলকব্জার বাজার
লিভার, চোখ ও চামড়ার বেচাকেনা

সুব্রত ভট্টাচার্য: মোহনবাগানের 'মিল্লা'
পশ্চিমবঙ্গে সংরক্ষণবিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা কম কেন?
সেই চিঠি: জগন্ময় মিত্রের হালহকিকৎ
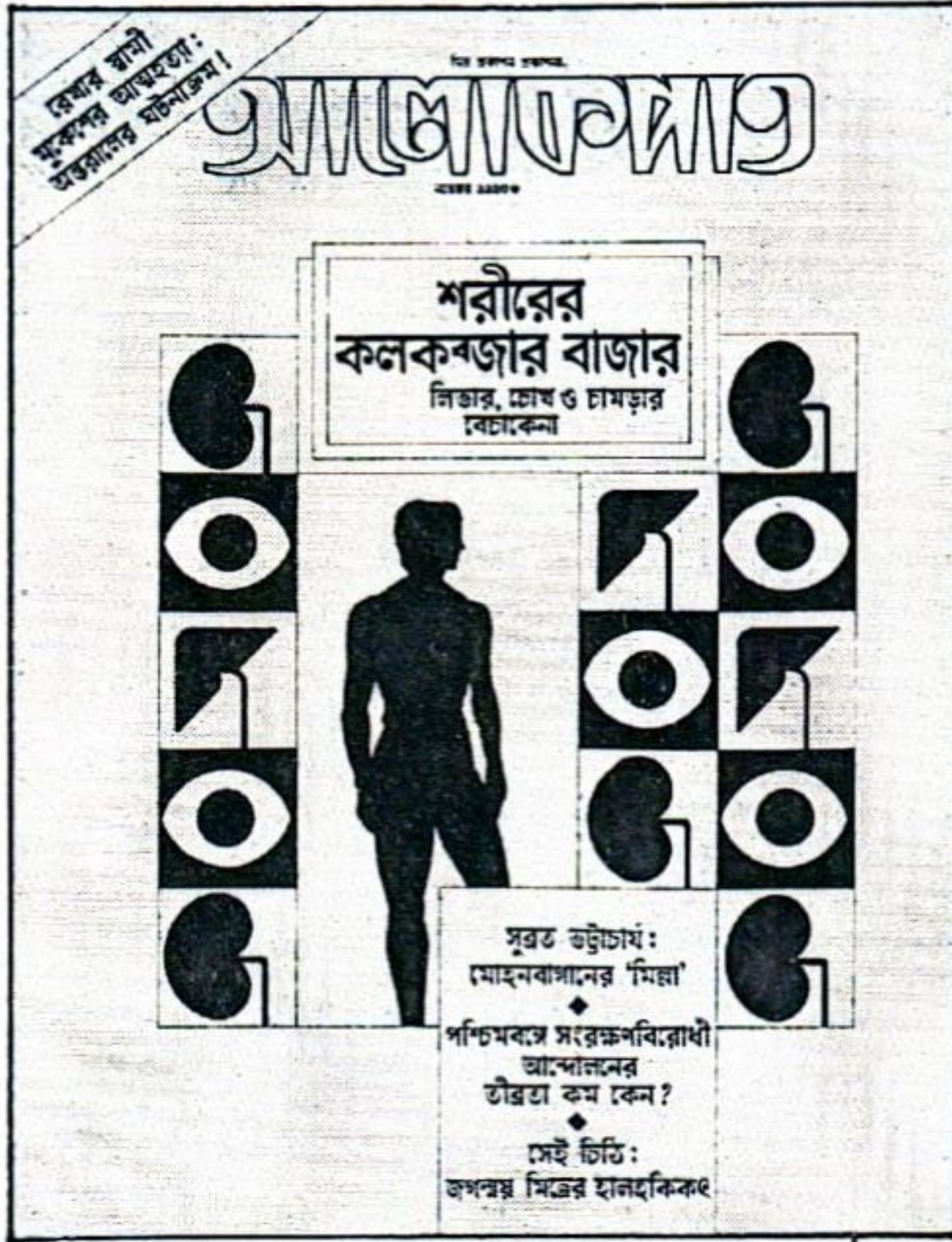
আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। দীপাবলীর এই আনন্দমুহূর্তে 'আলোকপাত'ও তার বৈচিত্র্যের পসরা নিয়ে উপস্থিত। আমাদের বিগত সংখ্যাটি ছিল শারদীয় সংখ্যা, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জীবনবৈচিত্র্যের সেই বিস্তৃতসম্ভারের পাশে এই সংখ্যাটি যদিও স্বল্পকলেবর কিন্তু সমৃদ্ধতায় ও অভিনবত্বে এটিও সমান ঐতিহ্যানুসারী।

আমাদের এ সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদন, বহুব্যাপ্ত বিজ্ঞানের বর্তমান অগ্রগতির পরিসরে চিকিৎসাবিজ্ঞানের গতির আনুষঙ্গিক একটি কুফলের দিকে—শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কেনাবেচার ক্রমবর্ধমান প্রবণতাটির দিকে দৃষ্টিনির্দেশ করেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন তথা কসমেটিক সার্জারির নামে যে রীতিমত সংগঠিত ব্যবসার পত্তন হয়েছে তা একশ্রেণীর স্বার্থপর ব্যবসায়ীর হাতে পড়ে কিভাবে বিপজ্জনক মোড় নিতে চলেছে, তার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে এই সময়োচিত প্রতিবেদনে।

গয়া; বাঙালির ঐতিহ্যে এই স্থাননাম পারলৌকিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে। এই শহরের মহাত্ম্য যুক্ত হয়েছে হিন্দুর পবিত্রতম ধর্মীয় অনুষঙ্গের সঙ্গে। কিন্তু গয়ার ইতিহাসই.বা কি, আজই বা কি অবস্থায় রয়েছে এই শহর—এসব নিয়ে পেশ করা হয়েছে একটি সচিত্র প্রতিবেদন।

খেলা প্রসঙ্গেই রয়েছে 'মোহনবাগান' এর দীর্ঘদিনের উজ্জ্বল উপস্থিতির খেলোয়াড় সুব্রত ভট্টাচার্য সম্বন্ধে একটি অন্তরঙ্গ প্রতিবেদন।

'মহাভারত', দূরদর্শনের এই জনপ্রিয়তম মহাকাব্যিক সিরিয়ালটির চিত্রনাট্যকার ছিলেন উর্দু ও হিন্দির প্রখ্যাত কবি ও লেখক ডঃ রাহী মাসুম রেজা। এনিয়ে কিছু বিতর্কও উঠেছিল সেসময়। এপ্রসঙ্গে একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে ডঃ রেজা জানিয়েছেন যে 'মহাভারত' শুধু হিন্দুর নয়—একটি জাতির মহাকাব্য। ধর্মীয় বাধাবন্ধন চিত্রনাট্য লেখনে কোনও প্রতিবন্ধকতারই সৃষ্টি করেনি। এও এক নতুন দিকদর্শন।

ফেলে আসা দিনের স্মৃতিমেদুর সঙ্গীত-স্মৃতিতে অমর হয়ে আছে জগন্ময় মিত্রের গান। জগন্ময় মিত্রের সঙ্গীত জগতের স্মৃতিসত্তাভবিষ্যৎ নিয়ে পেশ করা হয়েছে একটি অনুপুঙ্খ প্রতিবেদন।

কলকাতার পরবাসে 'অ-বাঙালি'রা কেমন আছেন, এনিয়ে যেমন রয়েছে একটি বৈচিত্র্যময় রচনা, তেমনিই পেশ করা হয়েছে ব্রিটেনে বসবাসকারী ভারতীয়দের উদ্যোগে গড়ে ওঠা একটি বিচিত্র সংগঠনের হালহকিকৎ নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন।

সদ্যপ্রয়াত প্রফুল্ল সেনের কর্মময় দীর্ঘজীবনের প্রতি জ্ঞাপন করা হয়েছে স্মৃতি-অর্ঘ্য।

সব মিলিয়ে, আমাদের নভেম্বর সংখ্যাটিও পাঠকদের রুচি ও চাহিদার প্রতি নজর রেখেছে, যথারীতি।

আলোক মিত্র

অক্ষরবিদ্যার নিউম্যান

আগস্ট '৯০ সংখ্যা আলোকপাতে সংস্কৃতি বিভাগে অক্ষরবিদ্যা প্রসঙ্গে লেখায় শিল্পী পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে যে শিল্প নিদর্শনের খবর তুলে ধরা হয়েছে তাতে এক জায়গায় বলা হয়েছে, আলপিনের মাথার ওপরে পঁচিশটি অক্ষরের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে, যা কি না গিনেসবুক অব ওয়ার্ল্ডেও বিরল। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই এমন সূক্ষ্ম ক্যালিগ্রাফি শিল্পের কাজ শ্যামনগরের ঘোষ পাড়া রোডের পার্থপ্রতিমই প্রথম দেখালেন তা নয়, তার চেয়ে কম বয়সের ছেলে অনেক আগেই পিনের ডগায় বিশ্বকোষ রচনা করে বিশ্বে সাড়া জাগিয়ে ফেলেছিল।

খবরটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য যে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র টম নিউম্যান (বর্তমান বয়স ৩০ বছর) অতি সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক রশ্মি দিয়ে লেখার এক অদ্ভুত পন্থা আবিষ্কার করে। এর ফলে যে কোন বইয়ের একটা পাতাকে সওয়া ছ'কোটি ভাগ ছোট একটা জায়গার মধ্যে লিখে ফেলা যায়। যদি হিসেব করা যায় তা হলে দেখা যাবে সওয়া ছ'কোটি ভাগ ছোট করলে পুরো এনসাইক্লোপিডিয়ার আকার দাঁড়ায় ওই পিনের ডগার মতই।

এমন কৃতিত্ব অর্জনকারী টম নিউম্যানকে ১,০০০ ডলার দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যাপক রিচার্ড পি· কেইনম্যান। গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ডে তার নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে।

পথিক মণ্ডল
নিউব্যারাকপুর,
উত্তর ২৪ পরগণা।

মেয়েদের পোশাক বিতর্ক

'আলোকপাত' জুলাই সংখ্যা সংগ্রহ করলাম। 'পশ্চাদপট' বিভাগে বিশেষ প্রতিনিধির 'মেয়েদের পোশাক বিতর্ক' পড়লাম। এক শ্রেণীর মেয়েরা অশ্লীল পোশাক পরছেন। এতে তারা কতখানি সভ্যতার পরিচয় দিচ্ছেন বলতে পারব না; তবে এটুকু বলতে পারি বর্তমান মেয়েরা নিজেরা নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারছেন। আধুনিক সমাজে মেয়েদের এ ব্যাপারে সঠিক ভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন বলে মনে করি। মেয়েরা প্রসাধনের আকর্ষণে উগ্রভাবে অপসংস্কৃতির অক্টোপাশে জড়িয়ে ক্রমশ পথঘাটে বিকৃত রুচির বন্যায় গা ভাসিয়ে নিজেদের বিপদ ডেকে আনছেন। উচ্ছৃঙ্খল মেয়েরা বাড়ির অভিভাবকদের হেয়ো করে কুরুচির যুপকাষ্ঠে বলি হচ্ছেন নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে। এর জন্যে দায়ী আজকের শিক্ষিত মেয়েরাই।

মানব বিশ্বাস
বাঁশবেড়িয়া
হুগলী

বাংলাদেশের বিশ্বাস

ভারত ও ভারতীয় সংবাদপত্র সম্পর্কে বাংলাদেশী জনগণের একটা ভুল ধারণা জন্মে গেছে ইদানিং–কিছু মৌলবাদী দল ও পত্র পত্রিকার দৌলতে। তাদের ধারণা ভারতে কোন পত্র পত্রিকা বাংলাদেশ সম্পর্কে সুষ্ঠু সংবাদ পরিবেশন করে না বরং সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়ায়। কিন্তু আগস্ট ১৯৯০ সংখ্যা আলোকপাত পড়ে আমার সে ধারণা পাল্টে গেল। ভারত-বাংলাদেশ বিবাদ প্রতিবেদনে তিনবিঘা প্রসঙ্গ–জল বন্টন প্রসঙ্গ–কোর্টের রায় ইত্যাদি নিয়ে যে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে তাতে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কের কথা–বড় দেশ হিসেবে ভারত থেকে কি পাওয়ার ছিল, বাংলাদেশ আর কি কি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, আর আমরা সাধারণ মানুষরা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি তার চুলচেরা বিশ্লেষণ সৎ সাংবাদিকতারই পরিচায়ক। এ জাতীয় লেখা আমাদের ধারণা পাল্টে দেবে ভারত সম্পর্কে। আলোকপাত প্রতিবেদকদের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা।

ফয়জুল ইসলাম
নাজির শংকরপুর রোড
যশোর ৭৪০০
বাংলাদেশ

মৌসুমী কোথায়?

বেশ কিছুদিন পূর্বে ৯ বৎসর বয়সী মৌসুমীর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবার ব্যাপারে টি·ভি·, আলোকপাত ও বিভিন্ন পত্রিকায় খুব লেখালেখি হয়েছিল। তা পড়ে আমার খুব ভাল লেগেছিল, এবং উৎসাহিত হয়েছিলাম। আমিও আমার কনিষ্ঠ ভাই, বোনদের উৎসাহিত করে তুলেছিলাম। কিন্তু বর্তমানে আর কোন পত্রিকা, টি·ভি· ও আপনারাও এই সুরস্ত মেয়েটির কথা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করছেন না। অনুরোধ, এই পত্রিকায় আপনারা ওই মেয়েটির কথা বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করুন।

অশোকতরু মান্না
হাটগাছা, হাওড়া-৪

৮৪ বনাম ৬৮

জুলাই সংখ্যার 'পায়রাডাঙ্গার সর্পমানব' শীর্ষক প্রতিবেদনের জন্য দু'একটি কথা জানাতে চাই।

শ্রী হীরেন্দ্রকুমার রায় জানিয়েছেন, 'ভারতবর্ষে ৩০০ রকমের সাপ পাওয়া যায় তার মধ্যে মাত্র ৮৪ জাতের সাপ বিষাক্ত।' বিখ্যাত সর্পবিশারদ শ্রী বিকাশকান্তি সাহার মতে ভারতে ২১৬টি প্রজাতির সাপ আছে যার মধ্যে ৬৮টি প্রজাতির সাপ বিষধর।

সাপের কান ও চোখের কর্মক্ষমতার ঘাটতি পূরণ করে এদের তীব্র ঘ্রাণ শক্তি। এ কথাটি লেখার মধ্যে কোথাও পেলাম না। ঘ্রাণ নেওয়ার কাজে নাক ছাড়াও সাহায্য করে একজোড়া জ্যাকবসন ইন্দ্রিয়, যেগুলো থাকে মুখের তালুতে। এদের সাথে মস্তিষ্কের শ্রবণ অনুভূতি অংশের যোগ রয়েছে স্নায়ুর মাধ্যমে।

সাপ মারার পর তাকে পুড়িয়ে না ফেললে তার সঙ্গী বা সঙ্গিনী প্রতিশোধ নেয় মৃত সাপের চোখে হত্যাকারীর ছবি দেখে।– এ ধরনের হাস্যকর তথ্য শ্রী রায় কোথায় পেলেন জানতে ইচ্ছে করছে।

মেরে না ফেলে যদি শুধু আঘাত করা হয় তাহলেও আঘাতকারীকে চিনে রাখার কোন ক্ষমতা নেই কারণ এদের মস্তিষ্কের সেরিব্রাম অংশটা খুবই অনুন্নত।

একমাত্র কোবরার বিষের প্রতিষেধক বের হয়েছে। এ তথ্যও ঠিক নয়। ভারতের প্রত্যেকটি বিষধর সাপেরই সিরাম ইতিমধ্যে বেরিয়ে গেছে।

জানতে পারলাম শ্রী রায় অনেক মৃত্যুপথ যাত্রীকে বাঁচিয়েছেন তাঁর তৈরি সিরাম প্রয়োগে। বম্বের হ্যাসকিনস্ ইনস্টিটিউট সাপের বিষের জন্য যে সকল গাছ-গাছড়া ওঝারা সাধারণত ব্যবহার করেন (বেতরাজ এবং শ্রী রায় কথিত মণিরাজ সহ) সেগুলিকে নিয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে এসেছেন সাপে কাটা রোগীকে বাঁচাতে এদের কোন কার্যকর ভূমিকা নেই।

আসলে বিষধর সাপে কামড়ালেও যে মানুষ মারা যাবে তারও কোন মানে নেই যদি না নির্দিষ্ট পরিমাণ (লেথাল ডোজ) বিষ মানুষটির শরীরে ঢুকে থাকে। সাপ সম্পর্কে যেহেতু ছোটবেলা থেকেই আমাদের একটা ভীতি রয়েছে, তাই নির্বিষ সাপে কামড়ালেও আমরা আতংকেই অর্ধমৃত হয়ে যাই।

আমরা সাপে কাটা রোগীদের বাঁচানর জন্য এ ধরনের ভেষজ চিকিৎসার কথা শুনলে অনুসন্ধান চালিয়ে থাকি। শ্রী রায় একজন সর্পবিশেষজ্ঞ হিসেবে আমাদের এই সৎ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাবেন আশা রাখি। আমরা তাঁর ভেষজ ওষুধ নিয়ে একটি অনুসন্ধান চালাতে চাই। তিনি আমাদের সমিতির কেন্দ্রিয় কার্যালয়ে যোগাযোগ করলে বাধিত থাকব।

দেবকুমার হালদার
সংযুক্ত সম্পাদক
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি
কলকাতা-৭০০ ০৭৪

ভুল তথ্যঃ জলেজঙ্গলে, গোস্বামী পরিবার

জলে জঙ্গলে –মে ১৯৯০। 'আমি নিজ হাতে মারা প্রাণীর মাংস খাই না', 'বোমরা আমার···দু'টো বার্কিং হরিণ···মদ্দাটার দিকে তাক···সেটা পড়ল সঙ্গে সঙ্গে', 'হরিণের মাংস··· মাংসটা যে সুস্বাদু হয়েছিল আজও সে কথা মনে আছে। মাংস সহযোগে রাম, আমায় ট্রানজিস্টারের গান···।' প্রশ্ন–লেখক শিকারী। ১৯৪৪ সালের কথা লিখেছেন। ঘটনা ১৯৪৫ জানুয়ারি –নিজহাতে মারা প্রাণীর মাংস খান না অথচ সুস্বাদু হয়েছিল কি করে জানলেন? ১৯৪৪/৪৫ সালে কি ট্রানজিস্টার এদেশে চালু হয়েছিল? যতদূর মনে পড়ে এদেশে ৫০ এর দশকে ট্রানজিস্টারের প্রচলন হয়। 'জাপান ভারত আক্রমণে উদ্যত', জাপান ১৯৪২ সালে ভারতের ওপর হামলা চালায়।

২) প্রভুপাদ অদ্বৈতাচার্য, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও লোকনাথ ব্রহ্মচারীর পরিবারের কথা:

'১৯৯০ সাল শ্রী শ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সার্ধ শত বর্ষ আবির্ভাব মহোৎসব' অতএব শ্রী শ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্ম ১২৪৭ সনের শ্রাবণ মাস হবে।

১৩০৬ সাল/সন ২২শে জৈষ্ঠ্য লোকান্তর অতএব ১৮০৮ সালে। ১০ চৈত্র 'শ্রী গোস্বামী সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে পদত্যাগ করনে'। আশা করি লেখক ভুল সংশোধন করবেন।

শ্রী পরমানন্দ দাস
নলহাটি, বীরভূম।

ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলা-হীনতার আসল তথ্য

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু স্বরাজ্যে 'ত্রিপুরাদিবস' পালন করতে গিয়ে ত্রিপুরার আইনশৃঙ্খলা-হীনতার প্রতিবাদ করছেন; অন্যদিকে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার বলছেন এ রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা হীনতার কথা;—কোন রাজ্যে সত্যিকার অবস্থা কি তারই তথ্যসমৃদ্ধ রিপোর্ট।

ছবি : তাপস কুমার দেব

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু

ছবি : বিকাশ চক্রবর্তী

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার
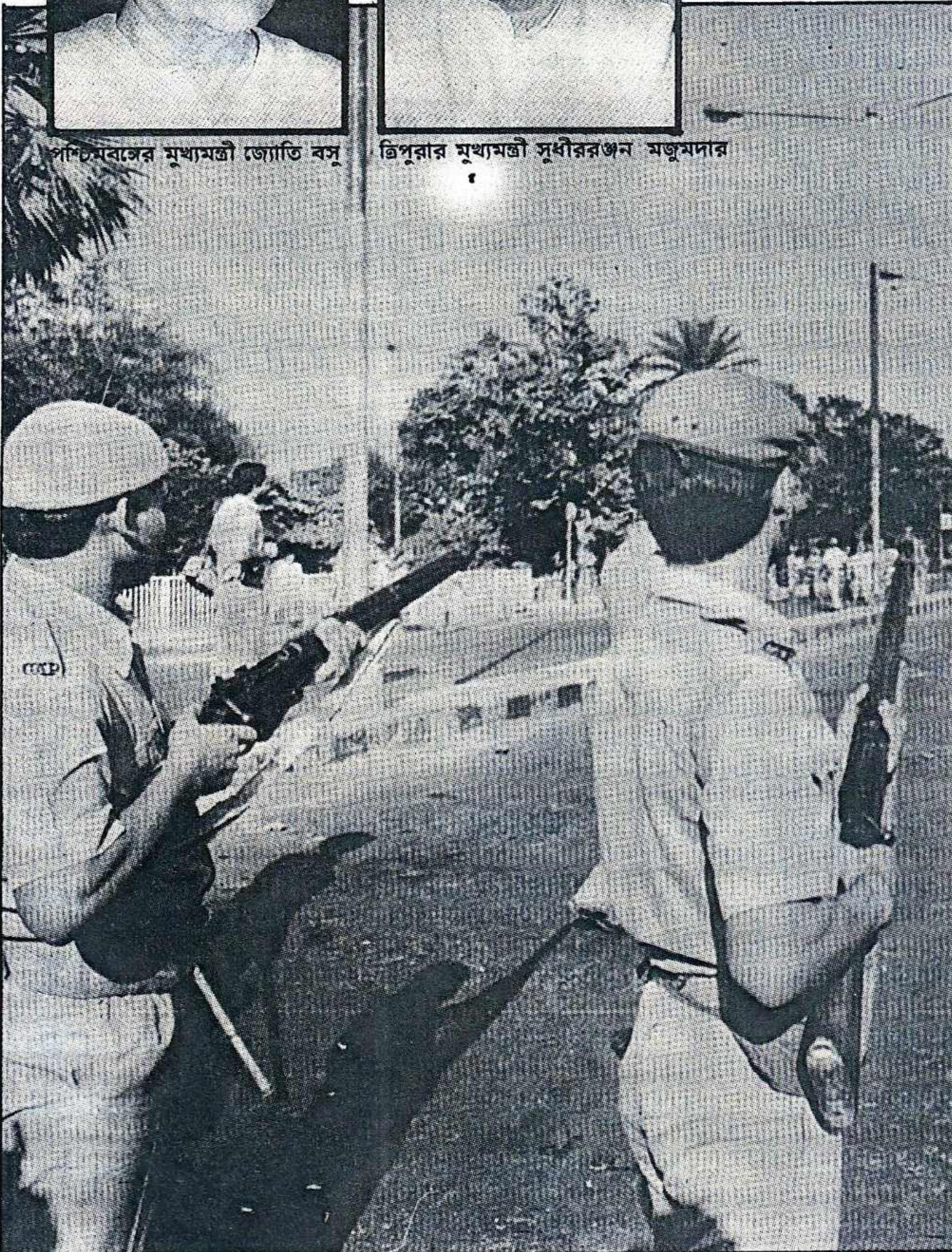
কলকাতা পুলিশ, জনবিক্ষোভে আগ্নেয়াস্ত্রের বহুল ব্যবহার

এই বছরের আটই জুলাই ত্রিপুরার অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী ও সি পি আই এম নেতারা বেশ জোরালো ভাবে আওয়াজ তুললেন, ত্রিপুরার আইনশৃংখলা বিপন্ন। সি পি আই এম কর্মীদের ওপর নারকীয় অত্যাচার চালিয়ে মেশিনারি কব্জা করে ভোটে জিতেছে কংগ্রেস। গুন্ডাবাজি, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার থেকে শুরু করে মাস্তানরাজের আশ্রয় নিয়ে তারা সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু করেছে। সব মিলিয়ে ত্রিপুরার আইন শৃংখলার সার্বিক পরিস্থিতির চূড়ান্ত অবনতি হয়েছে বলে অভিযোগ জানালেন সি পি আই এম নেতারা। এবং ত্রিপুরার বুকে কংগ্রেসি আমলে সন্ত্রাসের প্রতিবাদ জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গাতে পালন করা হল ত্রিপুরা-দিবস। বর্তমান কংগ্রেসি আমলে সি পি আই এম কর্মী হত্যা, এ ডি সি ভোটে কারচুপি থেকে শুরু করে সন্ত্রাস বিশৃংখল পরিস্থিতির বিবরণ জানাতে এই রাজনৈতিক ক্যাম্পেনিং-এর পুরোভাগে ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী।

ত্রিপুরার সি পি আই এম নেতারা যখন এ রাজ্যের, সাধারণ মানুষদের সামনে ত্রিপুরার বিশৃংখল পরিস্থিতির বিবরণ জানিয়ে ত্রিপুরাদিবস পালনের জন্য জোর কদমে নেমেছিলেন ঠিক তখনই ত্রিপুরাতে পালন করা হল পশ্চিমবঙ্গদিবস। ত্রিপুরার মাটিতে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসি নেতারা পেশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক আইন শৃঙ্খলার ভয়াবহ চিত্র। গুন্ডারাজ, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা, ক্যাডাররাজ, পুর নির্বাচনে মাস্তান-মাসলম্যান আগ্নেয়াস্ত্রর যথেচ্ছ ব্যবহার, সর্বোপরি বানতলা-বিরাটি সহ কংগ্রেসের ডাকা বন্ধে মমতার ওপর ক্যাডার বাহিনীর আক্রমণের তথ্য উপস্থিত করা হল ত্রিপুরায়।

এমন কি ১৬ আগস্ট কংগ্রেসের ডাকা কলকাতা বন্ধ এবং এস·ইউ·সি·আই· ও বারটি নকশালি দলের মিছিলের ওপর গুলি চালানোর পরিপ্রেক্ষিতে যখন তামাম রাজ্য জুড়ে ব্যাপক অশান্তি দেখা গিয়েছিল, তখন কলকাতার বিভিন্ন
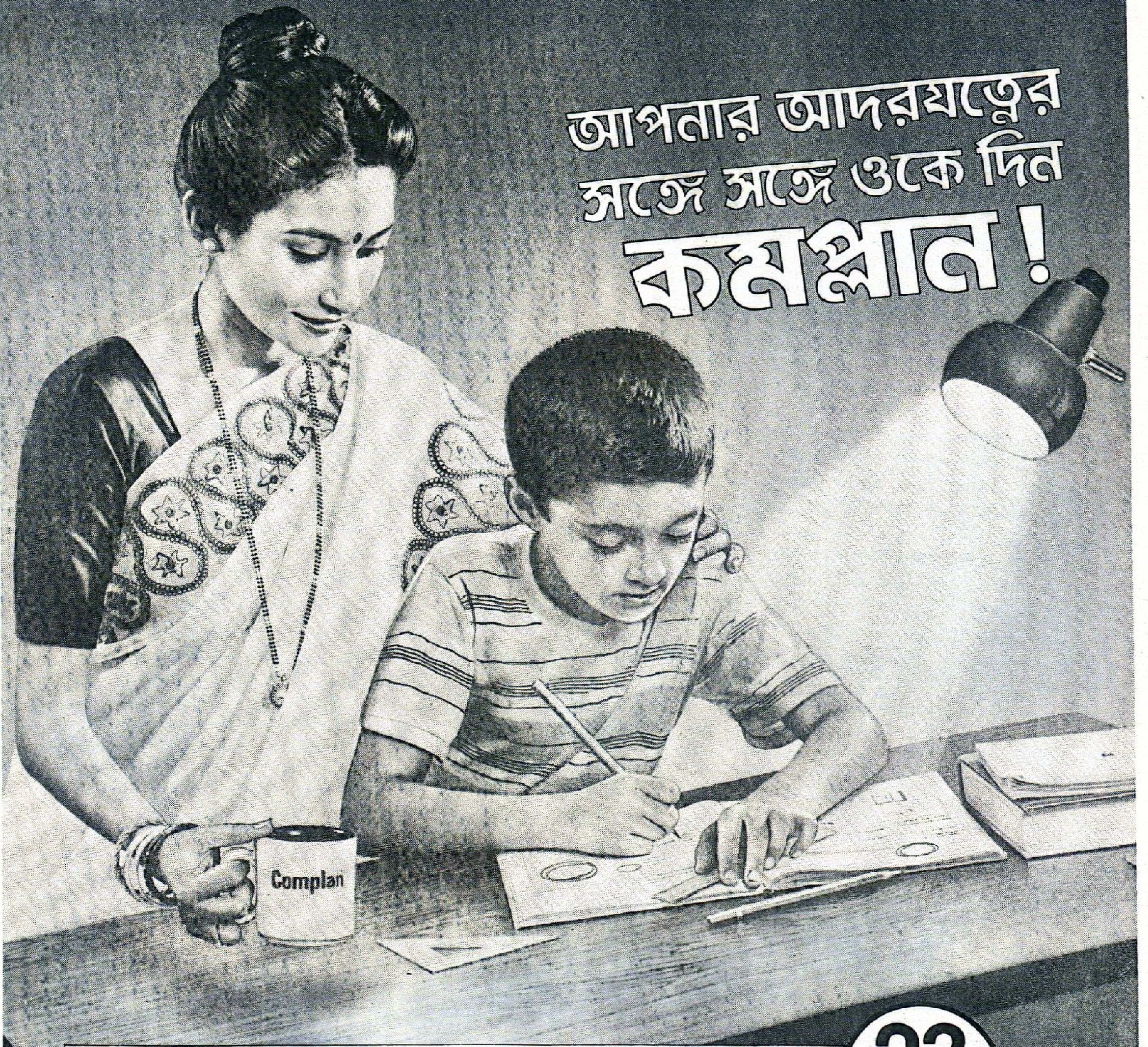
অঞ্চলে সি পি আই এম মহিলা নেত্রীরা গর্জে উঠলেন ত্রিপুরায় কংগ্রেস শাসনে নানাবিধ অরাজকতার বিরুদ্ধে। পার্টি মেম্বার ঠাসা ওই পথসভায় সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে নেত্রীরা একের পর এক অভিযোগ করলেন ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পার্ক সার্কাস থেকে যাদবপুর, টালা থেকে টালিগঞ্জে সি·পি· আই এম এর প্রচার চলতে লাগল পুরোদমে। সারা রাজ্য যখন সন্ত্রাস, খুন ক্যাডাররাজ সহ নানাবিধ সমস্যায় টালমাটাল, তখনই যেন মার্ক্সবাদীদের ত্রিপুরা নিয়ে প্রচারের মাত্রা ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় ত্রিপুরার আইনশৃঙ্খলা শতগুণ বিপন্ন, এই প্রচার সভাগুলির নেতারা সত্যে প্রতিপন্ন করতে শুরু করেন। তবে পাবলিক পালস বুঝে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের উচ্চস্তরের নেতারা এই কৌশল সফল করার জন্য মহিলা নেত্রীদের নামালেন ফোরফ্রন্টে। উদ্দেশ্য, জনসাধারণের ক্ষোভ প্রশমিত করা।

এ ডি সি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংঘটিত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে গত জুলাই মাসের শেষাশেষি রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকারের প্রেরিত একটি দল উপদ্রুত ত্রিপুরা ঘুরে যান। এই দলের নেতৃত্ব দেন যশোবন্ত সিং। ত্রিপুরা সরজমিন ঘুরে যশোবন্ত সিং কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। সেই রিপোর্টে ত্রিপুরার কংগ্রেস সরকারের শাসনকালে খুন, ধর্ষণ, রাজনৈতিক সংঘর্ষের তথ্য পেশ করা হয়। সেই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার কংগ্রেস দলের সর্বভারতীয় সভাপতি রাজীব গান্ধীকে একটি নোট পাঠান। সেই নোটে তিনি কেন্দ্রিয় সরকারের প্রেরিত দলের ত্রিপুরা সফরের পরিপ্রেক্ষিতে রিপোর্টকে 'উদ্দেশ্য প্রণোদিত' আখ্যা দেন। সি·পি· আই এম নেতাদের সহায়তায় এ ডি সি নির্বাচনে সংঘটিত অরাজক অবস্থার যে বিবরণ ওই রিপোর্টে পেশ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণই মিথ্যে বলে সুধীরবাবুর বক্তব্য। সুধীরবাবু আরও অভিযোগ করেন যে রাজ্যের মার্ক্সবাদী নেতারা বিকৃত তথ্য পেশ করে রাষ্ট্রীয় মোর্চার প্রেরিত প্রতিনিধিদলকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। এবং কেন্দ্রিয় দল প্রকৃত তথ্য যাচাই না করে সেই বিকৃত তথ্যই পেশ করেছেন বলে অভিযোগ তুললেন ত্রিপুরার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, এমন কি কাল্পনিক ধর্ষণের সংবাদও পেশ করা হয়েছে ওই রিপোর্টে।

একদিকে যখন ত্রিপুরার সরকারের বিরুদ্ধে এ ডি সি নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস, অরাজকত[illegible] ভুরিভুরি অভিযোগ উঠেছে, তখন পশ্চিমবঙ্গে[illegible] বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে উঠেছে সন্ত্রাস, ধর্ষ[illegible] নারী নির্যাতন আর গুণ্ডাবাজির অভিযোগ। প[illegible] ক্যাডাররা পিস্তল বোমা নিয়ে সন্ত্রাস চালিয়ে [illegible] নির্বাচনে দখল করেছে বুথ। কংগ্রেসি নেতা[illegible] বিভিন্ন সভায়, মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ মদতে প্রকা[illegible] রাজপথে কংগ্রেসি নেত্রীকে আক্রমণসহ আ[illegible] নানাবিধ সন্ত্রাসের নমুনা তুলে ধরলেন। বানতল[illegible] নারীহত্যা, বিরাটিতে গণধর্ষণ––সব মিলিয়ে [illegible] বছরের শাসনে বেশ বড়সড় চ্যালেঞ্জের মুখোমু[illegible] হল বামফ্রন্ট। এমন কি ডাকাত–পুলি[illegible] যোগসাজসের অভিযোগ করে বসলেন বা[illegible] ফ্রন্টেরই এক মন্ত্রী।

অভিযোগ–পাল্টা অভিযোগে না গিয়ে [illegible] রাজ্যের বিগত দশ বছরের আইনশৃঙ্খল[illegible] পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা যাক্। প্রথমেই আসা যা[illegible] ত্রিপুরার আইনশৃঙ্খলার বিষয়ে। সময়কাল ধ[illegible] যাক, উনিশ আশি সাল থেকে উনিশশ নব্বই স[illegible] পর্যন্ত। আশি থেকে অষ্টআশি––এই বছরগুলি[illegible] দু'টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। আশি সা[illegible] ত্রিপুরার ক্ষমতাসীন সি এফ ডি সরকারের আম[illegible] ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে ১৫৮টি, খুনের সং[illegible]
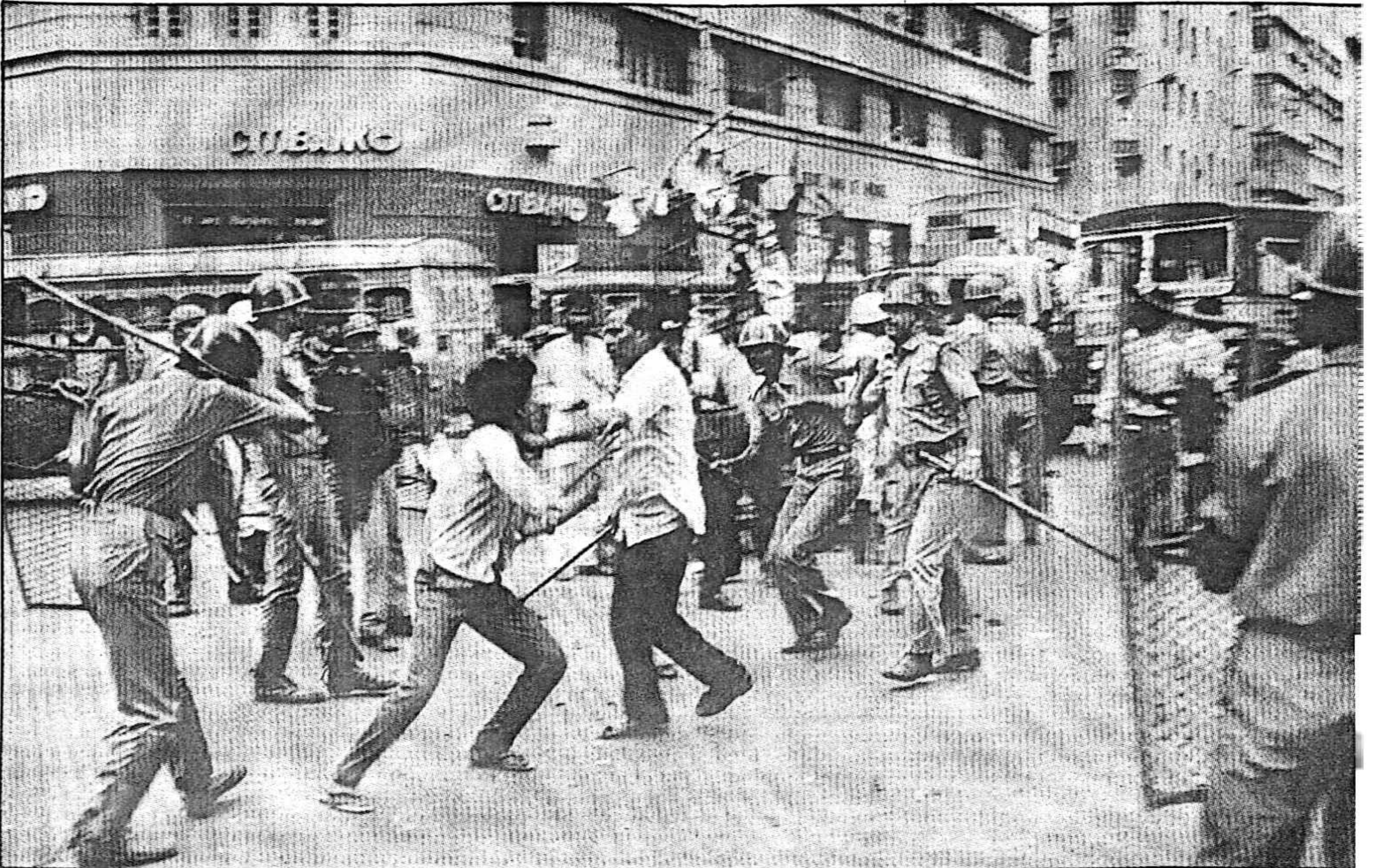
জনবিক্ষোভের বিরুদ্ধে কলকাতায় পুলিশি আক্রোশ

২২২টি, লুঠতরাজ ১৩৬টি, ১,২২৫টি প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে, চুরির সংখ্যা ১,৩০৪, দাঙ্গার সংখ্যা ৬৩৯। এছাড়া নানাবিধ ফৌজদারি অপরাধের সংখ্যা ২,৩২৭টি। সব মিলিয়ে অপরাধমূলক ঘটনার সংখ্যা ৬,০১১। পরের বছর সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬,৩৪৭টি। এর মধ্যে ডাকাতির সংখ্যা ১৫৭টি, খুনের সংখ্যা ৯১টি। লুঠতরাজের সংখ্যা ১৫৫টি, প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে ১,২৬৯, চুরির সংখ্যা ১,৪৫৬টি। দাঙ্গার সংখ্যা ৪৮৮টি। নানাবিধ ফৌজদারি অপরাধের সংখ্যা ৬,৩৪৭টি। বিরাশি সালে ডাকাতির সংখ্যা ১৯৯টি, খুনের সংখ্যা ১০৮, লুঠতরাজ হয়েছে ১৬৩টি। প্রতারণার সংখ্যা ১,০২৪, চুরির সংখ্যা ১,১৮৭টি, লুঠতরাজ সংঘঠিত হয়েছে ৪১৩টি। নানাবিধ ফৌজদারি অপরাধের সংখ্যা ১,৯৯৬টি। সব মিলিয়ে সংঘঠিত অপরাধের সংখ্যা ৫,০৯০টি। পরের বছর অপরাধের ঘটনা আরও বেড়ে যায়। ওই বছর ডাকাতির সংখ্যা ছিল ২৭২টি, খুনের সংখ্যা ১২৫টি, লুঠতরাজ হয়েছে ১৯১টি, প্রতারণা হয়েছে ১,১০৫টি, চুরির সংখ্যা ১,৪৫৯টি। দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে ৪৫৫টি। সারা বছরে সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা ৬,০৩৩টি।

এবার মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আসে। মুখ্যমন্ত্রী হন নৃপেন চক্রবর্তী। নৃপেনবাবুর ক্ষমতায় আসার পর অপরাধের সংখ্যা অব্যাহতই থাকে। উনিশশ চুরাশি সালে ডাকাতির সংখ্যা ছিল ২৮৪টি, খুনের সংখ্যা ১১৮টি, ১১৮টি লুঠের ঘটনা ঘটে। প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে ১,১৮৯টি, চুরির সংখ্যা ১,৩৫১টি, দাঙ্গার সংখ্যা ৪৯২টি। নানাবিধ অপরাধমূলক ঘটনার সংখ্যা ২,৫২৮টি,—সব মিলিয়ে সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা ৬,২১৭টি। পঁচাশি সালে ডাকাতির সংখ্যা ২১২টি, খুনের সংখ্যা ১৫০টি, ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে ২১৮টি, প্রতারণার সংখ্যা ৯৫৫টি, চুরির সংখ্যা ১,১৩১টি, দাঙ্গার সংখ্যা ৪৩৩টি—নানাবিধ অপরাধমূলক ঘটনার সংখ্যা ১,৯৭৩টি। ওই বছর সার্বিক অপরাধ সংঘটিত হওয়ার ঘটনা ৫,০৭২টি। উনিশশ ছিয়াশি সালে ডাকাতির সংখ্যা ১২০টি, খুনের সংখ্যা ১২৭টি, লুঠরাহাজানি ১৩৭টি, প্রতারণার সংখ্যা ৭৪৯, চুরির সংখ্যা ৮৮৭, দাঙ্গার মামলা নথিভুক্ত হয়েছে ৭৭৩টি, বিবিধ অপরাধমূলক ঘটনার সংখ্যা ১,৯৩৩টি। সব মিলিয়ে ৪,৭২০৬টি অপরাধমূলক ঘটনা ঘটেছে নৃপেনবাবুর আমলে। ১৯৮৭ সালে ডাকাতির সংখ্যা ৪৯টি, খুনের সংখ্যা ১৪২টি, লুঠতরাজ হয়েছে ৮৪টি, প্রতারণার সংখ্যা ৬৫৩টি, চুরির ঘটনা ৮৫০টি, দাঙ্গা ৫৮৩টি বিবিধ অপরাধমূলক ঘটনার সংখ্যা ২,২৭৬টি। ওই বছর সব মিলিয়ে অপরাধের সংখ্যা ৪,৬৩৭টি।

উনিশ'শ অষ্টআশি সালের পাঁচ ফেব্রুয়ারির বিধানসভা নির্বাচনে সি·পি·আই·এমকে সরিয়ে ক্ষমতায় আসে কংগ্রেস আই–ত্রিপুরা উপজাতি

ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী

সমিতি জোট। এবার দেখা যাক্, বিগত অকংগ্রেসি সরকারের শাসনের তুলনায় এই ক'বছর ত্রিপুরার আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি কি রকম। ১৯৮৮ সালের সরকারি নথিভুক্ত অপরাধমূলক ঘটনার সংখ্যা ৫,৪৬২টি। বামফ্রন্টের আমলের তুলনায় অপরাধের সংখ্যা সেরকম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়নি। উনিশ'শ নব্বই সালের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে মাত্র ৯৬টি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। বামফ্রন্টের আমলে ৮৭ সাল ছাড়া যা সব সময়ই এক'শর ঘর অতিক্রম করে গিয়েছে। এমন কি খুনের সংখ্যা নথিভুক্ত হয়েছে ১৫৪টি। সি পি আই এম এর আমলে এই সংখ্যা বরাবরই ছিল এক'শর থেকে অনেক বেশি। ১৯৮৮ সাল ও ১৯৮৯ সাল এই দু'বছরে ডাকাতি, খুন, প্রতারণা, রাহাজানি, দাঙ্গার সংখ্যা বিগত সি এফ ডি ও সি·পি· আই এম সরকারের তুলনায় যে অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়নি তার প্রমাণ মিলেছে সরকারি নথিপত্রে।

এ ডি সি নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার বিপর্যস্ত আইন-শৃঙ্খলার অভিযোগ নিয়ে যখন সি পি আই এম নেতারা দিল্লিতে দরবার করতে ছুটেছিলেন তখন রাজ্যের ডিরেকটর জেনারেল ১৯৮৮-১৯৮৯ সালে ত্রিপুরার আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি নোট পেশ করেন। সেই নোটে ডিরেক্টর জেনারেল লিখিতভাবে মন্তব্য করেন যে ১৯৮০ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত সমগ্র ত্রিপুরায় হিংসাত্মক ঘটনা ছিল নিয়মিত ব্যাপার। এই রমরমা একটু নিয়ন্ত্রণে আসে ১৯৮৬ সালের পর। ওই সময় টি এন ভির উগ্রপন্থী হানাহানির বিরুদ্ধে বিরোধীপক্ষ সোচ্চার হয়ে উঠলে, এবং গণ প্রতিবাদ শুরু হবার পর অপরাধের সংখ্যা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়। তিনি তাঁর লিখিত বিবৃতিতে জানান যে ১৯৮৮ সালের শেষ থেকে উগ্রপন্থীর আক্রমণ ও দাপট সরকার এবং পুলিশের হস্তক্ষেপে একেবারেই ক্ষীণ হয়ে আসে। লিখিত বিবৃতিতে তিনি এও স্বীকার করেছেন যে ১৯৮৬, ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের তুলনায় ১৯৯০ সালে খুনের সংখ্যা অনেক কম। এবং ১৯৮৫ সালের তুলনায় ১৯৮৯ সালে ডাকাতি, রাহাজানি প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। এছাড়া অন্যান্য অপরাধের সংখ্যাও আনুপাতিক হারে কমেছে বলে পুলিশ প্রধানের বক্তব্য।

এ তো গেল সরকারি পক্ষের বক্তব্য, পরিসংখ্যান। এবার আসা যাক এ ডি সি নির্বাচনে সি পি আই এম এর পেশ করা সন্ত্রাসের অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে। জুলাই মাসের পনের তারিখে 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' এর একটা সংবাদ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। ত্রিপুরার তথ্যমন্ত্রী রতন চক্রবর্তী প্রেস কনফারেন্সে সি·পি· আই এম এর বিরুদ্ধে অরাজকতা সৃষ্টির অভিযোগ তুলে বললেন যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী তাঁর ক্যাডারদের অস্ত্র হাতে তুলে নেবার নির্দেশ দিয়েছেন। নৃপেনবাবুর বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ, তিনি

ক্যাডারদের পার্টির অনুমতি ছাড়াই অস্ত্র তুলে নিতে বলেছেন। এমন কি এ ডি সি নির্বাচনের দিন যে দশজন খুন হন তারমধ্যে সাতজনই ছিল কংগ্রেস আই সমর্থক।

সি·পি· আই এম এর এ ডি সি নির্বাচন সংক্রান্ত সন্ত্রাসের অভিযোগ কতটা সত্যি তা যাচাই করতে স্থানীয় বেসরকারি কাগজগুলির নির্বাচন সংক্রান্ত খবরগুলি বিশ্লেষণ করা যাক। 'স্যন্দন' পত্রিকার দশই জুলাই ইস্যুতে সি পি আই এম যে নিরপেক্ষ সাংবাদিকদেরও রেহাই দেয়নি তা ফলাও করে লেখা হয়েছে। ওই দিনের কাগজে সরাসরিই সি·পি· আই এম কর্মীরা 'স্যন্দন'–এর প্রতিনিধির ওপর হামলা করার সংবাদও প্রকাশিত হয়। এবং ভোটের দিন মার্ক্সবাদী দলটির বিরুদ্ধে আক্রমণ ও হামলার অভিযোগও করে ওই কাগজটি। সি·পি· আই এম এর সন্ত্রাসের জ্বলন্ত নমুনা দেখা যায় দৈনিক 'গণদূত' পত্রিকায়। তাতে পরিষ্কার লেখা হয় যে এ ডি সি নির্বাচনে হাঙ্গামার বলি হয়েছেন ৮জন কংগ্রেস আই কর্মী। মন্ত্রী সুরজিৎ দত্ত থেকে শুরু করে কংগ্রেস বিধায়ক দীপক নাগ, রতন ঘোষ, যুবসমিতির দুই প্রার্থীর ওপর বোমা, বন্দুক ও তীর নিয়ে আক্রমণের সংবাদও ছাপা হয় স্থানীয় কাগজগুলিতে। 'স্যন্দন' পত্রিকাতে দুই কংগ্রেস কর্মীর গলা কাটা মৃতদেহ কবর থেকে উদ্ধারের সংবাদ প্রকাশিত হয়। সব থেকে উল্লেখযোগ্য, 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার এগারোই জুলাই এর সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সংবাদ––সেই সংবাদে স্পষ্টতই ক্যাডারদের খুন সন্ত্রাসকে 'চেতনার প্রথম স্তর' বলে নৃপেনবাবু আখ্যা দেন। নৃপেনবাবুর এই মন্তব্য প্রথম প্রকাশিত হয় সি পি এম এর নিজস্ব মুখপত্র 'ডেইলি দেশের কথা'য় 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকার সতের জুলাই এর সংখ্যায় সরাসরিই এ ডি সি নির্বাচনে সি·পি· আই এম এর বিরুদ্ধে খুন সন্ত্রাসে প্রশ্রয় দেবার অভিযোগ ওঠে। প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, সি·পি· আই এম কর্মীরা ১৫ জন কংগ্রেস কর্মীকে খুন করেছে বলে 'টেলিগ্রাফ' জানায়। ত্রিপুরার এ ডি সি নির্বাচনের একমাসব্যাপী ক্যাম্পেনিং–এ মোট ১৭ জন খুন হন। এর মধ্যে মাত্র তিনজন হলেন সি·পি· আই এম সমর্থক। সরকার, পুলিশের বিবৃতি ছাড়াও বেসরকারি সমস্ত কাগজগুলি সংঘঠিত খুনের ঘটনাগুলিকে স্বীকৃতি দেয়।

ত্রিপুরার সাম্প্রতিক আইন শৃঙ্খলার বিপর্যয় নিয়ে সি·পি· আই এম ত্রিপুরাদিবস পালন করার জন্য যখন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্পেনিং শুরু করেছে, তখন এই পরিসংখ্যানটি বিশ্লেষণ করে ওই রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতির সত্য মিথ্যা প্রমাণ করা যেতে পারে।

ত্রিপুরার পরিস্থিতির পাশাপাশি এবার পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা যাক। কংগ্রেসি সরকারের আমলে ত্রিপুরার বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলার

১৯৮৮-৮৯ সালে খুনের সংখ্যা বিগত ১২ বছরের পরিসংখ্যানকে বিস্ময়করভাবে ছাপিয়ে না গেলেও একই ধারাকে ধরে রেখেছে। আনুমানিক পনের'শর মত খুন হয়েছে এই দুই বছরে।

ত্রিপুরার ডি আই জি-র নোট
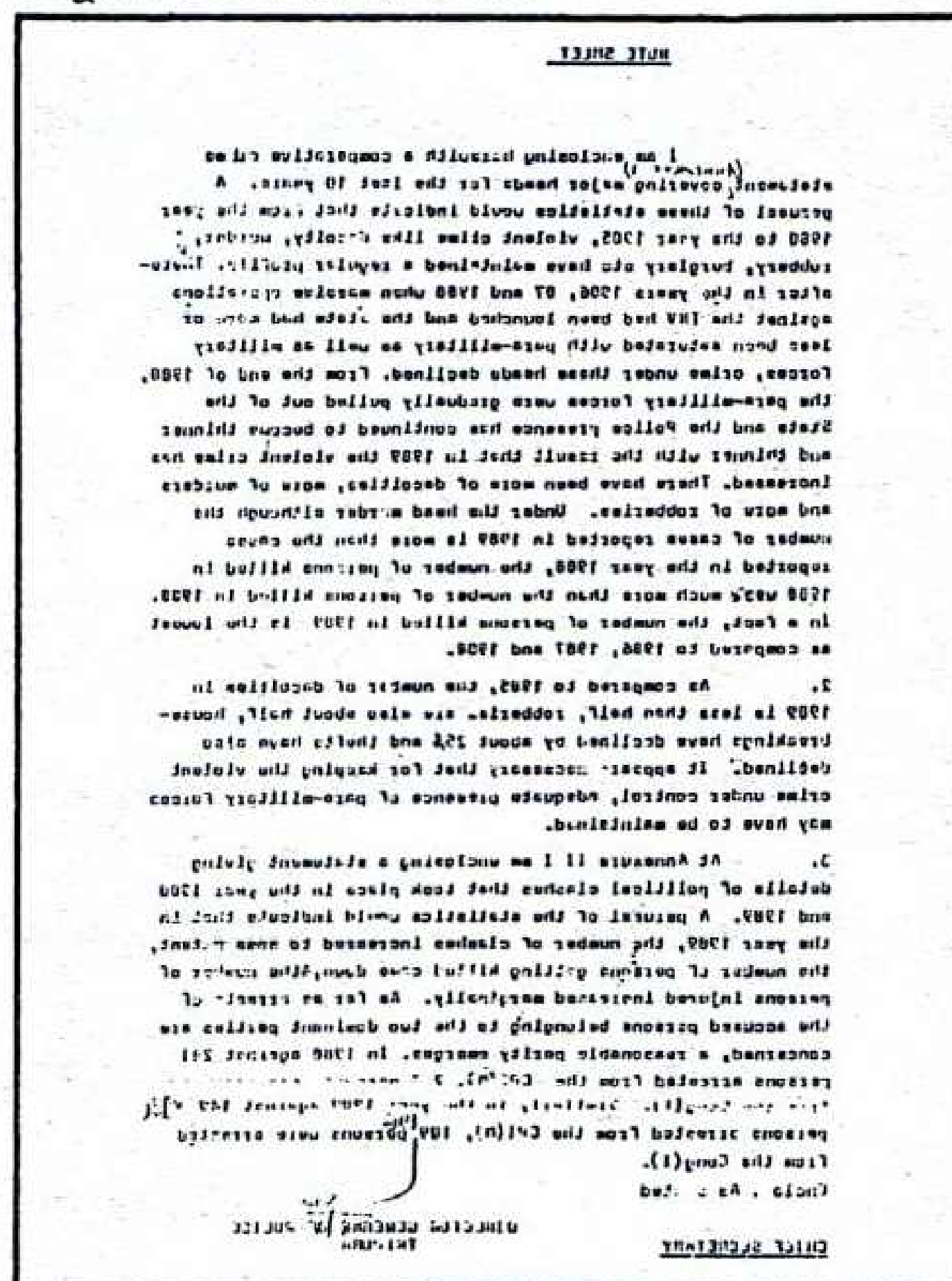
পরিসংখ্যানের খতিয়ান মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। ত্রিপুরায় কংগ্রেস সরকারের শাসনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকারের আমলের আইন শৃঙ্খলার তুল্যমূল্য বিচারের জন্য সাতাত্তর সাল থেকে নব্বুই সাল বেছে নেওয়া যেতে পারে। পরিসংখ্যান তুলে ধরলেই বোঝা যাবে ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলার সার্বিক পরিস্থিতি দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে উঠবে। ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসেন বামফ্রন্ট প্রথম বছর কলকাতাতে খুন হ'ন ৭৯ জন। কলকাতা বাদে অন্যান্য জেলায় খুনের সংখ্যা ৮১৮টি। মোট খুনের সংখ্যা ৮৯৭। কংগ্রেসি আমলের শেষ বছরে মোট খুনের সংখ্যা ৮২৮টি। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭৮ সালে কলকাতাতে খুনের সংখ্যা না পাওয়া গেলেও অন্যান্য খুনের সংখ্যা ৯০৯টি। ১৯৭৯ সালেও কলকাতাতে খুনের সংখ্যার হিসেব মেলেনি। জেলায় খুনের সংখ্যা ১,০৪৬টি। আশি সালে কলকাতা সহ সমস্ত জেলায় খুনের সংখ্যা ১,৪১৭টি। উনিশ'শ একাশি সালের খুনের খতিয়ান দাঁড়িয়েছিল, ১,৪৯৩টি। বিরাশি সালে সেই সংখ্যা ছিল ১,৩৯৯। প্রায় চোদ্দ'শর কাছাকাছি। ১৯৮৩ সালে ১,৩২৭টি, ১৯৮৪ সালে খুনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায়, ১,৪৩৮। ৮৫ সালে ১,৩৯৬টি। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৮৬ সালে, ১,৩০৩টি। হিসেব পাওয়া যায়নি কলকাতায় সংঘটিত খুনগুলির। ১৯৮৭ সালে খুনের সংখ্যা ছিল ১,৪১০টি। ১৯৮৬ ও '৮৭ সালের কলকাতাতে সংঘটিত খুনের খতিয়ান পাওয়া যায়নি। ১৯৮৮-৮৯ সালে খুনের সংখ্যা বিগত ১২ বছরের পরিসংখ্যানকে বিস্ময়করভাবে ছাপিয়ে না গেলেও একই ধারাকে ধরে রেখেছে। আনুমানিক পনের'শর মত খুন হয়েছে এই দুই বছরে। এগুলি সবই নথিভুক্ত ঘটনা। এই রকম বহু খুনই নথিভুক্ত হয়নি রাজনৈতিক চাপে। সব থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, নক্শালি আন্দোলনেও যখন পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি টালমাটাল তখনও খুনের সংখ্যা হাজার পেরয়নি। কিন্তু বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর সে সংখ্যা পনের'শর কাছাকাছি ছুঁয়েছে–পরিসংখ্যান অন্তত তাই বলে। এমন কি খুনের খতিয়ানে ত্রিপুরায় কংগ্রেস আমলের থেকে পশ্চিমবঙ্গের চেহারা অনেক বেশি ভয়াবহ। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যদি ত্রিপুরাকে তুলনা করা যায় তাহলে আয়তনের হিসেবে ত্রিপুরা তার ধারে কাছেই আসে না। ত্রিপুরার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তুলনা কোনভাবেই চলে না বলে রাজনৈতিক আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি যে ক্রমশই অবনতির দিকে এগোচ্ছে, এ কথা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু আকারে ইঙ্গিতে তো স্বীকার করেইছেন, এ বাদে প্রকাশ্যে বলেওছেন––'পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে।'

ত্রিপুরার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলার তুল্যমূল্য বিশ্লেষণে খুন, নারী ধর্ষণ, নারী নির্যাতনে পশ্চিমবঙ্গ অনেক এগিয়ে আছে। সিদ্ধার্থশংকর রায়ের আমলে যেখানে দৈনিক দু'জন করে খুন হতেন, সেখানে বামফ্রন্টের আমলে ৬জন করে দৈনিক খুন হচ্ছেন। সুতরাং তুল্যমূল্য আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি বুঝে নিতে নথিভুক্ত পরিসংখ্যানই যথেষ্ট। রাজনৈতিক শ্লোগানের থেকে নথিভুক্ত ঘটনা যেমন বক্তব্যে সত্যতা বোঝাচ্ছে, তেমনই বিরাটি, বানতলা, তারকেশ্বর থেকে শুরু করে রাজনৈতিক সংঘর্ষ, সন্ত্রাস, ক্যাডাররাজ এর রমরমা জানিয়ে দেয় সত্য কি!

মণিশংকর দেবনাথ

বি·দ্র·: পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, কলকাতা পুলিশ ও ত্রিপুরা পুলিশ প্রদত্ত তথ্য-এর সহায়তায় লিখিত।

ছবি: অশোক বসু

হিমালয় বিজয়িনী বাচেন্দ্রী পালের এভারেস্ট বিজয় কথা

শিখর দেশে

মৃত্যু, বরফ, অতলান্ত খাদ
আর ভয়কে পায়ে পায়ে দলে একজন
ভারতীয় যুবতী উঠে যান পৃথিবীর সর্বোচ্চ
শিখরে––যেখানে অন্য নারীদের ঘরের বাইরে বেরোতেই
সংকোচ। কখনও মাথায় ভেঙে পড়ছে বরফের চাঁই, কখনও
অক্সিজেন না পাওয়ার হিমশিহরণ, অজানা ভয়––এ সমস্তকে
যে নারী তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে শিখর–স্বপ্ন সম্ভব করেছেন,
সেই মহিলা অভিযাত্রী বাচেন্দ্রী পালের এভারেষ্ট
শৃঙ্গ জয়ের কাহিনী। সেইসঙ্গে তাঁর
একটি অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার।

আ · ত্ম · ক · থা

সেদিন ছিল বুদ্ধ পূর্ণিমা। এভারেস্টের তিন নম্বর শিবিরে আমরা কয়েকজন। চারদিক জুড়ে বরফ আর বরফ –ভিন্ন রংয়ে ভিন্ন রূপে। হিমালয় অঙ্গনে এমন নৈসর্গিক বরফের উদ্যানে গোটা কয়েক তাঁবু ফেলা হয়েছে আমাদের রাত কাটাবার জন্যে। এই স্থানটির উচ্চতা ২৪,০০০ ফুট। সারাদিনের পথ চলার ক্লান্তি, সেই সঙ্গে উচ্চতাজনিত শ্বাসকষ্ট। দিনের শেষে ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। সন্ধে হতেই তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে ঢুকে পড়লাম তাঁবুতে। স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে শরীর এলিয়ে দিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকালাম। পূর্ণ চাঁদের আলো কেমন ছড়িয়ে পড়েছে অদূরে পর্বতের গায়ে।

এরপর কখন দুচোখে আমার ঘুম নেমে এসেছে, বলতে পারব না। হঠাৎ এক বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। মুহূর্তে কিছু একটা আমাদের তাঁবুর উপর এসে পড়ল। ক্ষণেকে তাঁবু ভেঙে চেপে বসল আমার উপরে। চিৎকার করে উঠলাম, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর খুব একটা বেরলো না। বাইরে তুষার ঝড়ের শব্দ এসে কানে বাজল। বুঝতে অসুবিধে হল না, একটা বড় বরফের চাঁই পড়েছে তাঁবুর উপরে। অর্থাৎ যে কোন মুহূর্তে আমাকে নিয়ে ওটা তলিয়ে যেতে পারে নিচের দিকে।

বরফের চাঁইয়ে তাঁবু ভেঙে চাপা পড়ে গিয়েছি। লোকে বিপদে পড়লে নাকি ঠাকুর দেবতাকে স্মরণ করে, স্মরণ করে বাবা মাকে। আমি কিন্তু সে সময়-টুকুও পাইনি। আমি অসহায়। আমি নিশ্চিত হয়ে গেছি, আমি মারা যাচ্ছিই।

মুহূর্তে নিজের সমস্ত বোধ বুদ্ধি হারিয়ে গেল। মৃত্যুর মুখোমুখি যেন শুয়ে আছি। বাইরে থেকে ঝড়ের প্রবল শব্দ এসে কানে বাজছে। অপেক্ষা করে আছি, আবার কখন কোন বরফের চাতাল এসে আমাকে গুঁড়িয়ে দেবে।

আমার এও হুশ ছিল না যে আমারই তাঁবুতে আরেকজন অভিযাত্রী রয়েছেন। হঠাৎ ওর গলা শুনতে পেলাম। সৌভাগ্য, ইতিমধ্যে উনি পকেট থেকে ছুরি বের করে তাঁবু কাটতে শুরু করেছেন। তারপর এক সময় বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

ওঁরই অনুকরণে কি না জানি না, মৃত্যুর আগে শেষবার চেষ্টা করলাম। নিজের চেতনা বুঝি ফিরে আসতে শুরু করেছে। কোন রকমে একটা হাত বের করা সম্ভব হল। বাইরে থেকে আমার তাঁবুর সহযাত্রীটি আমার হাত ধরে টানাটানি আরম্ভ করল। কিন্তু পুরো শরীর তখনও বরফে আটকে রয়েছে। একটুখানি সময় নিয়ে শরীরের সমস্ত জোর দিয়ে বরফের চাঁইটিকে সরাতে চাইলাম। অবশেষে সরাতে সক্ষম হলাম। তারপর অনায়াসে বাকি কাজ হয়ে গেল। বাইরে থেকে সাহায্য পেলাম। বেরিয়ে এলাম মরণ–গহবর থেকে।

দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল রাত সাড়ে বারটায়। ঝড়ে কয়েকটি বড় বরফের সিরাক্ ভেঙে উপর থেকে নেমে এসেছিল আমাদের তাঁবুর উপরে। সৌভাগ্য, আমাদের কোন তাঁবুকেই ভেঙে চুরমার করে ফেলেনি, কারো জীবন নাশও হয়নি। কিন্তু জখম হয়েছেন অনেকেই। দুর্ঘটনার পর তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে দেখি, কেউ চিৎকার করছে, কেউ কাঁদছে। চোট লেগেছিল কারো পাঁজরে, কারো বা মাথায়। তবে আমাদের দুজনের, আমার আর লোপসাংয়ের বিশেষ কিছু হয়নি।

রাতেই খবর পাঠানো হল দলনেতার কাছে, উদ্ধার করার জন্য লোক পাঠাতে। এরপর আমরা নিচে নেমে গেলাম। দলনেতা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন–'বাচেন্দ্রী, তুমি কি এরপর আর উপরে যেতে পারবে?' আমি বুঝতে পারছিলাম ওই দুর্ঘ-টনা আমাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। আমার মধ্যে একটা নতুন শক্তি জন্ম নিয়েছে। আমি জানালাম-নিশ্চয়ই, আমি যাব।

অথচ এর আগে পর্যন্ত কেমন একটা অজানা জড়তা সর্বদাই আমার মধ্যে ছিল। ছিল এক অজানা ভয়। পর্বতারোহণের জগতে আমি প্রবেশ করি মাত্র তিন বছর আগে। প্রথম বছরে উত্তর কাশীতে নেহেরু পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রে পহাড়ে ওঠার প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর ভারতীয় পর্বতা-রোহণ সংস্থার কাছ থেকে হঠাৎ একটি চিঠি পাই, পরবর্তী ভারতীয় এভারেস্ট অভিযানের প্রাথমিক পর্বে ওরা আমাকে মনোনীত করেছেন। আমার সম্মতি আছে কি না সত্বর জানিয়ে দিতে হবে। ওদের চিঠি পেয়ে আমি স্তম্ভিত। সেজন্যে চিঠির উত্তর পর্যন্ত দিইনি। পরের বছর ওই শিক্ষাকেন্দ্রেই পর্বতারোহণের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করি। এবারেও আমার শিক্ষালাভ হয়েছে দারুণ চমৎকার। কোর্সে 'ব্ল্যাক পিক' আরোহণে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করি। মূল শিবির থেকে শিখর আরোহণে যেখানে সাধারণত চারদিন সময় লাগে, সেখানে আমার লেগেছিল মাত্র দেড়দিন। ইতিমধ্যে ভারতীয় পর্বতা-রোহণ সংস্থা থেকে আরেকটি চিঠি পাই। কোর্সের প্রশিক্ষকদের ব্যাপারটা জানাতে ওরা কিন্তু আমাকে বোঝালেন, বললেন, আমি নিশ্চয়ই পারব। এমন সুযোগ যেন নষ্ট না করি। এভারেস্ট অভিযানের সহ দলনেতা কর্নেল প্রেমচাঁদ তখন শিক্ষাকেন্দ্রটির উপাধ্যক্ষ। উনি আমাকে ডেকে বললেন, সম্মতি পাঠাবার জন্যে। আমি রাজি হলাম।

এরপর শুরু হল প্রাক এভারেস্ট অভিযান। মনে ভয়, দলে কত বড় বড় পর্বতারোহী রয়েছেন। সকলেই অভিজ্ঞ। ওঁদের সাথেই দিন কাটতে লাগল। অভিযানের প্রাথমিক পর্বে গঙ্গোত্রী এক নং শিখর আরোহণ করলাম। এরপর চূড়ান্ত পর্বে ছিল মানা শিখর আরোহণ। মানা শিখর আরোহণ হয়নি খারাপ আবহাওয়ার জন্যে। তবে ওই শৃঙ্গের সর্বোচ্চ স্থানে যে কজন আরোহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। কর্নেল প্রেমচাঁদও ছিলেন আমাদের সাথে।

বাচেন্দ্রী পাল

যথারীতি এভারেস্ট অভিযানের চূড়ান্ত দলে স্থান পেলাম। মোট ২০ জনের দল। সাত জন মহিলা, তেরজন পুরুষ। মহিলা অভিযাত্রীরা হলেন, আমি ছাড়া চন্দ্রপ্রভা অটোয়াল, হর্ষবন্তি বিস্ট, রিতা গম্বু, সরাওতি প্রভু, রেখা শর্মা এবং ডঃ মীনা আগর-ওয়াল।

একদিকে আনন্দের শিহরণ, অন্যদিকে এক অজানা ভয়–দুয়ে মিলে আমি যেন আমাতে ছিলাম না। ভাবিনি জীবনে কোনদিন এভারেস্টে যাব। ...অতএব আরম্ভ হল কঠোর পরিশ্রম। আমাদের গ্রামের নাম নাকোরি। হরিদ্বার থেকে গঙ্গোত্রীর পথে উত্তরকাশীর কাছে। উত্তরকাশী থেকে দূরত্ব বার কি.মি.। রংবেরংয়ের পাহাড়িদের বাসস্থান পাহাড়ের ঢালে। ছোট্ট সুন্দর আমাদের পাহাড়ি গাঁয়ের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে পাহাড়ি নদী ভাগীরথী। গ্রামের মাথায় রেনুকাদেবীর মন্দির। প্রতিদিন ভোরে উঠে দৌড়তাম ১০ কিমি। রুক্স্যাকে পাথর ভরে নিয়ে উপরে উঠতাম। কখনও জঙ্গলে যেতাম, ফেরার পথে কাঠ কুড়িয়ে আনতাম। বাবাকে কেউ জিজ্ঞেস করলে, বাবা মজা করে বলতেন–'বাচেন্দ্রী ইট, কাঠ, পাথর আনতে গেছে, বাড়ি বানাবে।'

এরপর শুভদিনে যাত্রা করলাম। দিনটি ছিল ৭ই মার্চ ১৯৮৪। পালাম বিমানবন্দর থেকে বিশেষ বিমানে আমরা যাত্রা করলাম নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুর উদ্দেশ্যে।

কাঠমাণ্ডু থেকে জিরি হয়ে পায়ে হেঁটে যাত্রা। মাঝে নামচে বাজার, শেরপাদের বড় লোকালয়। এরপর থিয়াংবোচে। থিয়াংবোচে থেকে একদিন সকালবেলা দেখেছিলাম এভারেস্ট শীর্ষে সাদা পর্বতচূড়ার উপরে তুষারের ঝড় বইছে। দলের একজন বয়স্ক সদস্য এন.ডি. শেরপা জানালেন 'ওটা তুফান। ওই তুফান হামেশাই হয়।' বললাম-ওখানে যাব কি করে? ওখানে পৌঁছবার আগেই তো ওই তুফান আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে। এন.ডি. হাসলেন––'বাচেন্দ্রী, যেদিন তুমি ওখানে যাবে, সেদিন কিন্তু তুফান থাকবে না।'

নেপাল হিমালয়ে এভারেস্টের পাদদেশে শেরপাদের দেশে প্রকৃতির অপরূপ রূপের মাঝে দিনগুলো কেটেছিল দারুণভাবে। আমার সাথে যারা ছিলেন, তাদের অধিকাংশই তো পর্বতারোহণের জগতে বিশাল ব্যক্তিত্ব। আর বলতে দ্বিধা নেই, আমি ছিলাম প্রায় সকলের স্নেহের পাত্রী। একদিকে প্রকৃতির অকৃত্রিম সৌন্দর্য, অপরদিকে আমাদের দলের সকলের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক–দুয়ে মিলে এভারেস্ট অভিযানের দিনগুলো আমার কাছে চির স্মরণীয় হয়ে রইল।

এরপর ফেরিচে। দুই পাহাড়ের ঢালে ছোট্ট অববাহিকা জুড়ে এক পাহাড়ি ঘেরাটোপ। অদূরে দাঁড়িয়ে নেপালি হিমালয়ের পর্বতশিখররাজি। ফেরিচের পর লবুচে। এখানে থেকে শুরু খুম্বু হিমবাহ। আরেকটু এগিয়ে গোরকশেপ। এরপর তুষারের নতুন রাজ্য।

এভারেস্ট বেস ক্যাম্প। স্বভাবতই নতুন শিহরণ। এক অজানা অনুভূতি–ভয় এবং আনন্দ-দুয়েরই সংমিশ্রণ। সেই সঙ্গে রয়েছে দুশ্চিন্তা, শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা এবং অ্যাকলেমেটাইজেশনের ব্যাপার। এরপর রয়েছে এভারেস্ট আরোহণের জন্যে দলনেতার ছাড়পত্র। খুম্বু হিমবাহ সম্বন্ধে কৌতূহল ছিল, বিশেষ করে ওখানকার বরফের ভিন্ন অবয়ব ও প্রকৃতির ব্যাপারে। দারুণ সুন্দর এবং মোহময়ী নাকি ওই বরফের উদ্যানটি। খুম্বুর বরফের রাজ্যে প্রকৃতির রূপসৌন্দর্যে নাকি নাস্তিক লোকেরাও অভিভূত হয়ে যান। এসব শুনে আমার দারুণ ইচ্ছে হল, কত তাড়াতাড়ি ওখানে যাব। বেস ক্যাম্প থেকে একদিন আমি, রিতা এবং ডাঃ মিনু মেহতা গেলাম খুম্বু হিমপ্রপাতে, যেখান থেকে ক্রাম্পন ব্যবহৃত হয়। হিমালয়ের এমন অপরূপ সৃজনের সান্নিধ্যে এসে প্রথম দর্শনেই ওর প্রেমে পড়ে যাই।

বেস ক্যাম্প থেকে এগোতে হয়েছে সম্পূর্ণ নতুনভাবে। নতুন করে দর্শন পেলাম বরফের বিশাল বিশাল ফাটলের। পাশে উঁচু বরফের দেওয়াল, খুব সাবধানে এগোতে হচ্ছিল। নতুনত্বের মধ্যে ছিল কোমরে দড়ি বেঁধে বরফের উপর পথ চলা, মই এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে দুর্গম ও বিপজ্জনক পথ অতিক্রম করা। নতুন অভিজ্ঞতা রোমাঞ্চকর এবং মজার। এক নং ক্যাম্পের কাছাকাছি আমরা কয়েকজন কিছু মালপত্র নিয়ে ওখানে রেখে ফেরৎ এসেছিলাম বেস ক্যাম্পে।

এরপরদিন পুনরায় উপরের দিকে যাত্রা করলাম। আমি আর রিতা মেয়েদের মধ্যে পুরো পথ অতিক্রম করলাম। দারুণ চমৎকারভাবে পৌঁছেছিলাম আমরা দুজনে। এক নম্বর শিবিরে পৌঁছে ওয়াকি টকিতে কথা বলেছিলাম দলনেতার (উনি বেস ক্যাম্পে ছিলেন) সঙ্গে। উনি খুব খুশি হয়েছিলেন। আমাদের অনেকে সেদিন মাঝপথ থেকে নিচে ফেরৎ চলে গিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে ঠিক হল এভারেস্ট আরোহণের জন্যে ছোট ছোট দল করে পরপর এগিয়ে যাবে। আমি স্থান পেলাম তৃতীয়দলে। মালটানার ক্ষমতা, শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়-গুলিতে পারদর্শিতা দেখে দলনেতা 'সামিট পার্টি' তৈরি করেন। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে আমার কিন্তু প্রথম দলে স্থান পাওয়া উচিৎ ছিল। যা হোক, তৃতীয় দলে সুযোগ পাওয়া নিয়ে আমার কোন অভিযোগ ছিল না।

এর পরের ঘটনা। এক নম্বর শিবিরে পৌঁছবার পথে রেখা শর্মা বরফের উপর পা পিছলে পড়ে সামান্য চোট পেলেন। ৯ই মে প্রথম দল থেকে অভিজ্ঞ অভিযাত্রী ফু-দোরজি এভারেস্ট শীর্ষে আরোহণ করেন। রিতা গম্বু এবং ফু দোরজি এভারেস্ট শিখরের কাছাকাছি (২৮,৪২৫ ফুট) পৌঁছবার পর ওদের অক্সিজেন সিলিণ্ডার খারাপ হয়ে যায়। রিতা নেমে যান ওখান থেকে। ফু দোরজি বিনা অক্সিজেন সিলিণ্ডারে একাকী আরোহণ করেন। কর্নেল প্রেমচাঁদ এবং চন্দ্রপ্রভা আটোয়াল ছিলেন চার নং শিবিরে।

এরপর আমাদের পালা। তিন নম্বর ক্যাম্পে মাঝরাতে দুর্ঘটনা ঘটে। আমি এবং লোপসাং অক্ষত অবস্থায় বেঁচে যাই। সাতটি তাঁবুর মধ্যে ছয়টি তাঁবু ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

আমার মধ্যে এক আশ্চর্য পরিবর্তন আসে। নতুন এক উদ্যম, এক অজানা শক্তি এসে আমার উপর ভর করে। ...তিন থেকে চার নং শিবিরে যাবার পথে অবশ্য খানিকটা অসুবিধে হয়েছিল। প্রধান কারণ ছিল উচ্চতা। চার নং ক্যাম্পের উচ্চতা ২৬,২০০ ফুট। অক্সিজেন সিলিণ্ডার ছিল না, শ্বাস-কষ্ট হচ্ছিল। হাঁটার গতিও ছিল মন্থর। ২৫,০০০ ফুট পৌঁছবার পর দেখলাম উপর থেকে কেউ একজন আসছেন। বুঝতে পারছিলাম না কে আসছেন? খানিক পরে দেখলাম, উনি সেই এন.ডি. শেরপা। আমার জন্যে একটা অক্সিজেন সিলিণ্ডার নিয়ে আসছেন। মনে হল, উনি বুঝি জীবন নিয়ে এলেন। এন.ডি.র কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

চার নং ক্যাম্পে পৌঁছে বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে টিন থেকে সেদ্ধ মুরগির মাংস খুলে গরম করতে বসে যাই। কিছুক্ষণ পরে দু–তিন জন সদস্য এসে আমাকে বকাবকি করতে লাগলেন। কারণ হল, কেন বিশ্রাম না নিয়ে রান্না করতে বসেছি।

২৩শে মে, শুভদিন। আমরা পৌঁছলাম ভারতের তেরঙ্গা পতাকা নিয়ে এভারেস্ট শীর্ষে। লাটো দোরজি, সোনম পালজোর, আমি এবং শেরপা আং দোরজি। ঘড়িতে দুপুর একটা বেজে সাত মিনিট। মুহূর্ত কয়েকের জন্যে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। কোন অনুভূতিই বুঝি আমার ছিল না। হারিয়ে গিয়েছিল বুঝি আমার সমস্ত বোধ, সমস্ত চেতনা।

সম্বিত ফিরে আসতে বুঝলাম, স্বপ্ন আর বাস্তব দুয়ে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। অবাক বিস্ময়ে দেখি সংসারের সর্বোচ্চ শিখরের চূড়ায় যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে স্বল্প পরিসর স্থানে চার পাঁচজনের দাঁড়াবার মতই জায়গা রয়েছে। জাতীয় পতাকা মেলে ধরলাম, তারপর ছবি তোলা হল।

এরপর ফেরার পালা। আমার অনুভূতিও আস্তে আস্তে বুঝি ফিরে আসতে শুরু করেছে। অবচেতন মনে চেতনার আবির্ভাব বুঝি টের পেলাম। অনুভব করলাম হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ থেকে বুঝি এবার বিদায় নিতে হবে। সে কারণেই নিচের দিকে পা বাড়াবার আগে শেষবারের মত নতমস্তকে প্রণাম জানালাম সামনের ওই মহারূপকে।

প্রস্তুতি : রসিক পাল

বাচেন্দ্রী পালের সাক্ষাৎকার

প্র: আপনি পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত জয় করেছেন। ওই পর্বত শৃঙ্গের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আপনার কেমন অনুভূতি হয়েছিল?

উ: এভারেস্টের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আমার অনুভূতি? খুব সহজ প্রশ্ন। কিন্তু জবাব দেওয়া খুব কঠিন। সংসারের সবথেকে উঁচু ওই শিখরে –জানি না, কত জনম পরে উঠতে পেরেছি।

পর্বতে আরোহণ শুরু করি দেরিতে, কিন্তু ভাবিনি কোনদিন ওখানে যেতে পারব। তারপর সুযোগ আসতে স্বপ্ন দেখা আমার শুরু হয়। আর এভারেস্টে ওঠার পর মনে হল, আমার স্বপ্ন আর বাস্তব দুয়ে মিলে মিশে বুঝি এক হয়ে গেছে।

প্র : আপনার পর আর কোন মহিলা অভিযাত্রী এভারেস্টে ওঠার সুযোগ পায়নি। এর কারণ কি?

উ : ১৯৮৪–র পর ভারতের মহিলা অভিযাত্রী-দের নিয়ে কোন এভারেস্ট অভিযান হয়নি। তবে আগামী ১৯৯৩ সালে ভারতের মহিলা অভিযাত্রীদের জন্যে এভারেস্ট বুক করা হয়েছে। এ'জন্যে আমরা একটি সংস্থা আলাদাভাবে তৈরি করছি। সংস্থাটির নাম ভারতীয় মহিলা পর্বতা-রোহণ সংস্থা। সংস্থাটিতে প্রাথমিকভাবে সাত-জনের নাম রাখা হয়েছে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যা হিসেবে। এরা হলেন বাচেন্দ্রী পাল, চন্দ্র-প্রভা অটোয়াল, রিতা মারোয়া (গম্বু), সরস্বতী, মালা হোনাটি, অনিতা সরকার এবং মহাসুখ গোয়াদি। সংস্থার কাজকর্ম অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। রেজিস্ট্রি হবার পর প্রধানমন্ত্রীকে অনু-রোধ করা হবে–এর উদ্বোধন করার জন্যে। নতুন দিল্লিতে এর প্রধান কার্যালয় হবে। সংস্থাটির প্রধান কাজ হবে স্বাধীনভাবে মেয়েদের জন্যে পর্বত অভিযান সহ যাবতীয় অ্যাডভেঞ্চার প্রোগ্রাম তৈরি করা এবং বাস্তবে তার রূপায়ণ করা। পশ্চিমবঙ্গ সহ সমস্ত রাজ্যের মেয়েরা এর ফলে উপকৃত হবেন।

প্র : বর্তমান প্রজন্মের ব্যাপারে (পর্বতারোহণের দৃষ্টিভঙ্গিতে) আপনার কি অভিমত?

উ : বর্তমান প্রজন্ম–অনেক বেশি সচেতনতা এসেছে ওদের মধ্যে। আমার মনে হয়, বর্তমানে শিক্ষার মধ্যে অ্যাডভেঞ্চারকে ঢোকানো উচিৎ। পশ্চিমবঙ্গ তো পর্বতারোহণে পথিকৃত। ওখানে প্রচুর মেয়ে অভিযাত্রী রয়েছেন।

প্র : অন্যান্য খেলাধুলোর তুলনায় পর্বতারোহণে ভারতীয় মেয়েদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এর কি কারণ?

উ : পর্বতে যাওয়া মানে তো বিপদের ঝুঁকি নেওয়া। এর জন্যে দরকার সময়, দরকার প্রচুর পয়সা। আমাদের দেশের মেয়েদের একা বেরো-বার আস্থা নেই। অভিভাবকেরাও একলা ছেড়ে দিতে চান না। আমি মনে করি, ওদের একলা বাইরে বেরতে হবে। বাইরের বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। নিজেদের আত্ম-নির্ভরশীল হতে হবে। নিজের কাজ মেয়েদের নিজেকে করতে হবে।

প্র : হিমালয়ে গত কয়েক বছর যাবৎ দুর্ঘটনা ঘটছে। প্রায় প্রতিবছরই কয়েকজন করে অভিযাত্রী মারা যাচ্ছেন, না হয় নিখোঁজ হচ্ছেন। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

উ : পর্বতারোহণ যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি বিপজ্জনক। কিছু নিয়মকানুন মেনে এখানে চলতে হয়। এই নিয়মকানুন সঠিকভাবে না মেনে চললে বিপদ আসতে পারে। পাহাড়ে যাওয়াটা কিছু ক্ষেত্রে একটা শৌখিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ বা নিচ্ছেন প্রতিদ্বন্দ্বীতা হিসেবে। এ সমস্ত খুব ক্ষতিকর। কয়েকটি ক্ষেত্রে অবশ্য দেখা গেছে, প্রকৃতির বিরূপতা–খারাপ আব-হাওয়ার এবং তুষারঝড় ইত্যাদির কারণে দুর্ঘ-টনা হয়েছে। বাকি সব ক্ষেত্রে সদস্যদের অভিজ্ঞতার অভাব, সঠিক পোশাক এবং যন্ত্রপাতির অভাব, যে অঞ্চলে যাচ্ছেন, সেই অঞ্চল সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা–এ সমস্ত ত্রুটিগুলো ছিল।

প্র : পর্বতারোহণের উন্নত মানের পোশাক ও সাজসরঞ্জামের অভাবে আমাদের অভিযান প্রচণ্ড অসুবিধের সম্মুখীন হচ্ছে। এ ব্যাপারে ভারতীয় পর্বতারোহণ সংস্থার ভূমিকাও আশানু-রূপ নয়। আপনার বক্তব্য জানতে চাইছি।

উ : পর্বতারোহণ ধনী লোকেদের জন্যে। ওখানে যাবার এবং আনুষঙ্গিক খরচও প্রচুর। পোশাকআশাকাদির দামও প্রচুর। আমাদের জন্যে পোশাকআশাকাদি সংগ্রহের ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা করার সময় এসেছে। বর্তমানে ভারতবর্ষের কয়েকটি কোম্পানি এগুলো তৈরির কাজে হাত দিয়েছে। কিন্তু দু-একটি উপাদান (রুকস্যাক, রোপ) বাদে বাকিগুলোর মান অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

প্র : পর্বতারোহণে আপনি কিভাবে উৎসাহিত হলেন

উ : আমার বড় ভাই পর্বতারোহণে প্রাথমিক ও উচ্চতর শিক্ষা নিয়েছে। ও বি.এস.এফ.–এ কাজ করে। ওখান থেকে পাহাড়ে ট্রেকিং, এক্স-পেডিশন করেছে। বাড়ি এসে সব গল্প করত। ছোট ভাইকেও পাহাড়ে যাবার জন্যে উৎসাহ দিত। কিন্তু আমাকে কোনদিন বলত না। উত্তর-কাশী আমাদের গ্রাম থেকে ১২ কি.মি. দূরে। ওখানে কলেজের পড়া শেষ করেছি। সেই উত্তর-কাশীতে নেহরু পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হল। সুযোগ বুঝে ওখানে কোর্সে ভর্তি হলাম।

প্র : আপনার পরিবারের লোকজনদের সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইছি।

উ : আমি গরীব পাহাড়ি ঘরের মেয়ে। আমার ছোট্ট গ্রামের নাম নাকোরি। দারুণ সুন্দর গ্রাম। পাহাড়ের ঢালে দারুণ সব বাড়ি। পাহাড়ের মাথায় রেণুকাদেবীর মন্দির। গ্রামের একপাশ দিয়ে ভাগীরথী বয়ে চলেছে। আমরা দু–ভাই তিনবোন। আমি তৃতীয়। আর রয়েছেন আমার বাবা আর মা। বাবা ব্যবসা করতেন তিব্বতিদের সাথে। তিব্বতের পথ বন্ধ হবার পর এখন চাষবাস নিয়েই আছেন। দু–বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বড় ভাই বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে। আর ছোট ভাই এখানে (টাটাতে) আমার সাথে রয়েছে।

প্র : এভারেস্টের আগে এবং পরে আপনি কোন কোন অভিযানে অংশ নিয়েছেন?

উ : এভারেস্টের আগে পর্বত শিখর ব্ল্যাক পিক, রুদুগয়রা আরোহণ করেছি। আর এভারে-স্টের পর প্রথমে কালিন্দি পর্বত, তারপর কেদার-ডোম শীর্ষে উঠেছি। তারপর মঁ ব্লা (ফ্রান্সে) আরোহণ করেছি। ওখান থেকে ফিরে এসে ১৯৮৮ তে শ্রীকৈলাস, ১৯৮৯তে কামেট ও আবি গামিন পর্বত–অভিযানে অংশ নিয়েছি।

প্র : বর্তমানে টাটা স্টীলে অ্যাডভেঞ্চার প্রোগ্রা-মের দায়িত্বে আপনি রয়েছেন। আপনার ভবিষ্যৎ কয়েকটি পরিকল্পনার কথা বলুন!

উ : টাটা কোম্পানিতে অ্যাডভেঞ্চার প্রোগ্রাম আস্তে আস্তে জনপ্রিয় হচ্ছে। নতুন অফিসারদের, (যারা কাজে যোগ দিচ্ছেন) ক্ষেত্রে একটা অ্যাড-ভেঞ্চার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখান-কার কর্মচারী এবং তাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে। ওদের নিয়ে শৈলারোহণ এবং ট্রেকিং করানো হয় কান্দ্রা এবং ডলমা পাহাড়ে। আগামী বছরের গোড়ার দিকে রাজস্থানে মরু অভিযান হচ্ছে। জয়সলমীর থেকে শুরু হবে এই অভিযান। ওয়াটার স্পোর্টস চালু করা হয়েছে। এখানে ডিনহা লেকে। ক্যানরিং এবং রাফ্‌টিং। অবশ্যই স্রোতের বিপরীতে। আরেকটি নতুন স্পোর্ট চালু হচ্ছে। সুইমাথন। পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে–হরিদ্বার থেকে কলকাতা ভাগীরথী দিয়ে সাঁতার কেটে এই সুইমাথন অনুষ্ঠিত হবে।

প্র : আপনার বয়স ৩৫/৩৬। আপনি এখনও অবিবাহিতা? বিয়ের ব্যাপারে কি ভাবছেন?

উ : হঠাৎ এমন একটি প্রশ্ন করলেন? (তারপর একগাল হেসে) ...এত দায়িত্ব নিয়ে বসে আছি। সময়ই নেই। তাছাড়া, আমার মনে হয়, সময় সুযোগ ইত্যাদি সহায় না হলে বিয়ে না করাই উচিৎ। আমার মানসিকতা? ...এ ছাড়া বিয়ে করার পর মানিয়ে চলার ব্যাপারটাও আছে। ...বিয়ে ছাড়াই আমি খুব খুশি। সময় তো কেটে যাচ্ছে। এখন আর ইচ্ছেও নেই।

প্র : আপনার হবি কি? অবসর সময় কি করে কাটান?

উ : এখানে (জামশেদপুরে) ভাইপো, ভাইঝিরা আছে। আছে আরও কয়েকটি বাচ্চা। মোট সাতটি বাচ্চা রয়েছে। এদের মধ্যে দুজন আমার এভারেস্ট অভিযানের সহ আরোহী আং ফু দোরজির সন্তান। এখন এরা সকলে মিলে আমার পরিবার। অবসর সময়ের অধিকাংশটা ওদের সাথেই কেটে যায়।

প্র : আপনি যাদের কাছে ঋণী, তাঁদের কয়েক-জনের নাম বলুন।

উ : প্রথমেই নাম করব কর্নেল প্রেমচাঁদের। তারপর ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং। পাহাড় ছাড়াও প্রাত্যহিক জীবনে চলার পথে এঁরা আমাকে দেখেন। আর শ্রদ্ধা করি, তেনজিং নোরগেকে।

সাক্ষাৎকার : রসিক পাল

প্রবাসে বসবাস : বাঙালি-অবাঙালির সীমানা পেরিয়ে
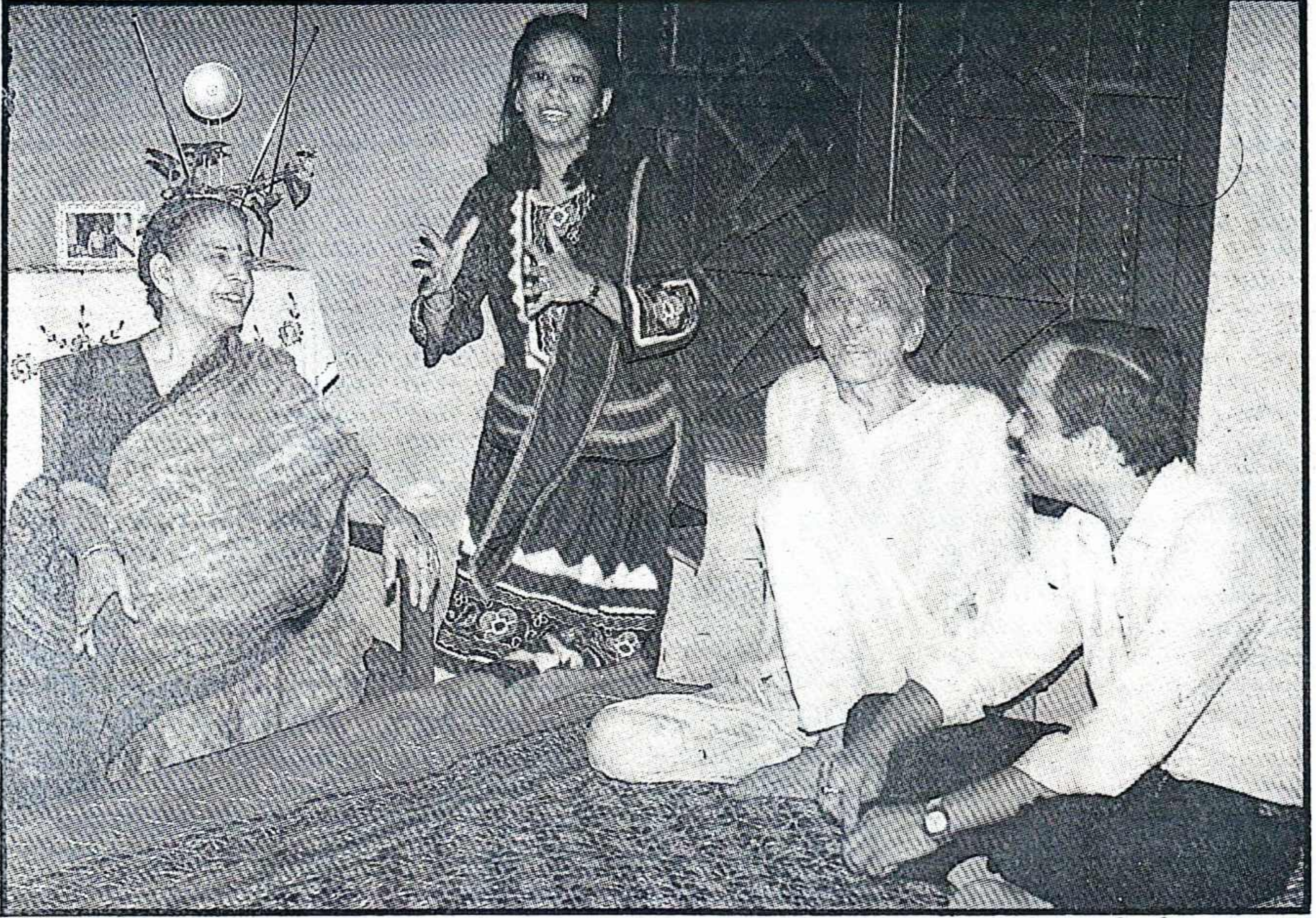
খুরানা পরিবার, অভিবাসিত নতুন প্রজন্ম

বাবা উপেন্দ্র চন্দ্র খুরানা যখন কলকাতায় আসেন ইন্দুর তখন জন্মই হয়নি। সেটা ১৯৪৭ সাল। দেশভাগ হওয়ায় দলে দলে মানুষ যখন ভারতের পথে পাড়ি জমাচ্ছে ইন্দুর বাবা উপেন্দ্র খুরানাও তখন স্বভূমি লাহোর ছেড়ে সপরিবারে চলে আসেন বহুদূরে এই কলকাতায়। সেই থেকে শুরু হয় অন্য ধাতে অন্য সংস্কৃতিতে গড়া মানুষজনের সঙ্গে তাঁর একত্র বসবাস।–– 'প্রথম প্রথম নাকি খুবই অসুবিধে হত, একে ভাষা জানতেন না তার ওপর আবার রিফিউজি, হেলাফেলার চোখেই দেখত সবাই।' বললেন ইন্দু, 'আমার কখনও এ ধরনের অসুবিধে হয় নি। আমি জন্মেছি এখানেই। বাঙালিদের মধ্যেই বড় হয়েছি। আমার বন্ধুরা প্রায় সবাই বাঙালি, বাংলা স্কুলে পড়াশোনা করেছি।' দক্ষিণ কলকাতার সন্তোষপুর এলাকায় ছোট্ট দুরুমের ফ্ল্যাটে মা বাবা ভাইকে নিয়ে ওঁদের সুখের সংসার।

স্বভূমি ছেড়ে দূরে মানুষ যখন ঘর বাঁধে, নতুন মানুষজনের সঙ্গে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে যায়, তখনও কি রয়ে যায় এমন কিছু ধ্যান ধারণা যা তার একান্ত? নতুন প্রজন্মই বা এ ব্যাপারে কি ভাবে?

ইন্দু নিজে একজন টিচার। দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ও নিজেই স্কুল খুলেছে। স্পোকেন ইংলিশ শেখায় সেখানে। আর কলকাতা ছাড়তে হবে ভাবতেই গায়ে জ্বর আসে ওর। '––বিয়েও করব কলকাতার ছেলেকেই। আমার মতে কলকাতা বিশ্বের সেরা সুন্দরী'––বলেন ইন্দু, একেবারে নির্ভেজাল বাংলায়।

কলকাতার তপন লাহিড়ির ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। আজ থেকে বার বছর আগে মাত্র সতের বছর বয়সে তপন একাই হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে

এসে পৌঁছেছিল দিল্লিতে।—--সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল ভাষা।—-'আমি হিন্দি বা পঞ্জাবী কিছুই বলতে পারতাম না। এদিকে এখানে ঘর থেকে বেরোলেই হিন্দি। প্রথম প্রথম ভীষণ দমে গিয়েছিলাম। যে কাজ করব বলে এসেছিলাম তার কিছুই হচ্ছিল না। যদিও বা অতি কষ্টে দু-একটা কথা বলতে চেষ্টা করতাম, কিন্তু উচ্চারণ এতই বিদ্‌ঘুটে ছিল যে কেউ বুঝতেই পারত না।' তপন এখন গারমেন্ট এক্সপোরটার। নিজের বিরাট ব্যবসা। হিন্দি ভাষীদের সঙ্গেই ওঠাবসা। কলকাতায় সিফ্‌টিং এর ব্যাপারটা চিন্তাই করতে পারে না। তপন বলে—-'সবচেয়ে বড় কথা বিজনেস, কলকাতায় এসব সুযোগ পাব না। ওখানে ভীষণ লেবার প্রবলেম, তাছাড়া ওখানকার ক্লাইমেটটা ঠিক সুট করে না।'

ইন্দু বা তপনের মত এরকম অসংখ্য মানুষজন ছড়িয়ে আছে ভারতের সর্বত্র। নিজস্ব ঘর ছেড়ে সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশে অন্য আবহাওয়ায় এমন কি সম্পূর্ণ পৃথক ভাষাভাষীদের মধ্যেও মানিয়ে নিয়েছে নিজেকে।

সবাই বলে, স্বাধীনতার আগে পর্যন্তও ভারতীয়রা নাকি ভারি ঘরকুনো ছিল, গ্রাম ছেড়ে শহরে বৃহত্তর জীবনের দিকে পা বাড়াতে আসাটাও ওঁদের ক্ষেত্রে ছিল বিদেশ যাত্রার সামিল। অবশ্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এমন অনেক কিছুই বদলে যাচ্ছে। পরিবর্তিত হচ্ছে মানুষের চিন্তাধারা। বিশেষত যে সব পুরোনো ভাবধারাকে আঁকড়ে মধ্যবিত্ত সমাজ এতদিন ধরে চলে আসছিল, চিন্তাধারার পরিরর্তনে ক্রমশ সেই মধ্যবিত্ত সমাজই এগিয়ে চলেছে অগ্রগতির পথে। চার দেওয়ালের গণ্ডী আর তাঁদেরকে বেঁধে রাখতে পারছে না, স্বভূমি ছেড়ে ওঁরা বেরিয়ে পড়ছে নতুন জীবনের খোঁজে।

উর্মিল ঠক্করও একদিন এভাবেই নিজের ঘর, সেই সুদূর গুজরাত থেকে নতুন জীবনের খোঁজে পাড়ি জমিয়েছিল কলকাতায়। আশা ছিল নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ফিরে যাবে তাঁর নিজস্ব ঘরটিতে মা বাবা ভাইবোনের কাছে। প্রথমে কলেজ তারপর চাকরির সুবাদে অস্ট্রেলিয়ায়। সেখান থেকে হয়ে আবার সেই কলকাতা। উর্মিল অবশ্য ইচ্ছে করলেই ফিরে যেতে পারত তাঁর নিজস্ব ঘরে—-হোম টাউনে। কিন্তু ফেরেনি। কলকাতাই এখন ওর ঘরবাড়ি। উর্মিলের ধারণা সেই পুরোনো জায়গায় ফিরে গেলে নিজেকে হয়তো আর সেখানে মানাতেই পারবে না!

উর্মিলের এই ধরনের ভাবনা চিন্তা কিন্তু একেবারেই অমূলক নয়। ঘর ছেড়ে বাইরে পা ফেলার সময় প্রায় সবাই মনে করেন কাজ শেষ করেই আবার ঘরে ফিরে আসব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিরে আসা আর হয়ে ওঠে না। কারণ ইতিমধ্যে তার ঘরে ফেরার প্রবণতাটি হ্রাস পায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন শহরের সঙ্গে সে নিজেকে এমনভাবে খাপ খাইয়ে নেয় যে নিজের অজান্তেই তা হয়ে ওঠে তার নিজস্ব।

পূর্ণেন্দু রায় বিহারের পূর্ণিয়া জেলার লোক। জন্ম পড়াশোনা চাকরি সব ওখানেই। এতদিন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি করতেন কিন্তু বেশিদিন আর এই ঘোরাঘুরির কাজ ভাল লাগল না। মাস দুয়েক আগে কলকাতায় এক নামী কোম্পানির অ্যাকাউন্টটেন্টের পদটি খালি হওয়ায় দরখাস্ত করে দিয়েছিলেন পূর্ণেন্দু। হয়েও গেল চাকরিটা। শুধু কলকাতা বলেই মনটা খুঁতখুঁত করছিল। বাসে যা ভিড়, লোডশেডিং, তার ওপর বৃষ্টি হলেই একবুক জল। কিন্তু এমন লোভনীয় চাকরি কি ছেড়ে দেওয়া যায়? তাই অগত্যা পূর্ণেন্দু আপাতত কলকাতায়। থাকেন দক্ষিণ কলকাতার একটি মেসে। কলকাতা ওঁর একেবারেই ভাল লাগছে না।—-'সত্যি নিজেকে একেবারেই মানিয়ে নিতে পারছি না, সুযোগ পেলেই পালাব।' শোনা যাচ্ছে পূর্ণেন্দু নাকি আবার এ্যাপ্লিকেশন করতে শুরু করেছে।

পূর্ণেন্দুর মত এমন অনেকেই আছেন যারা
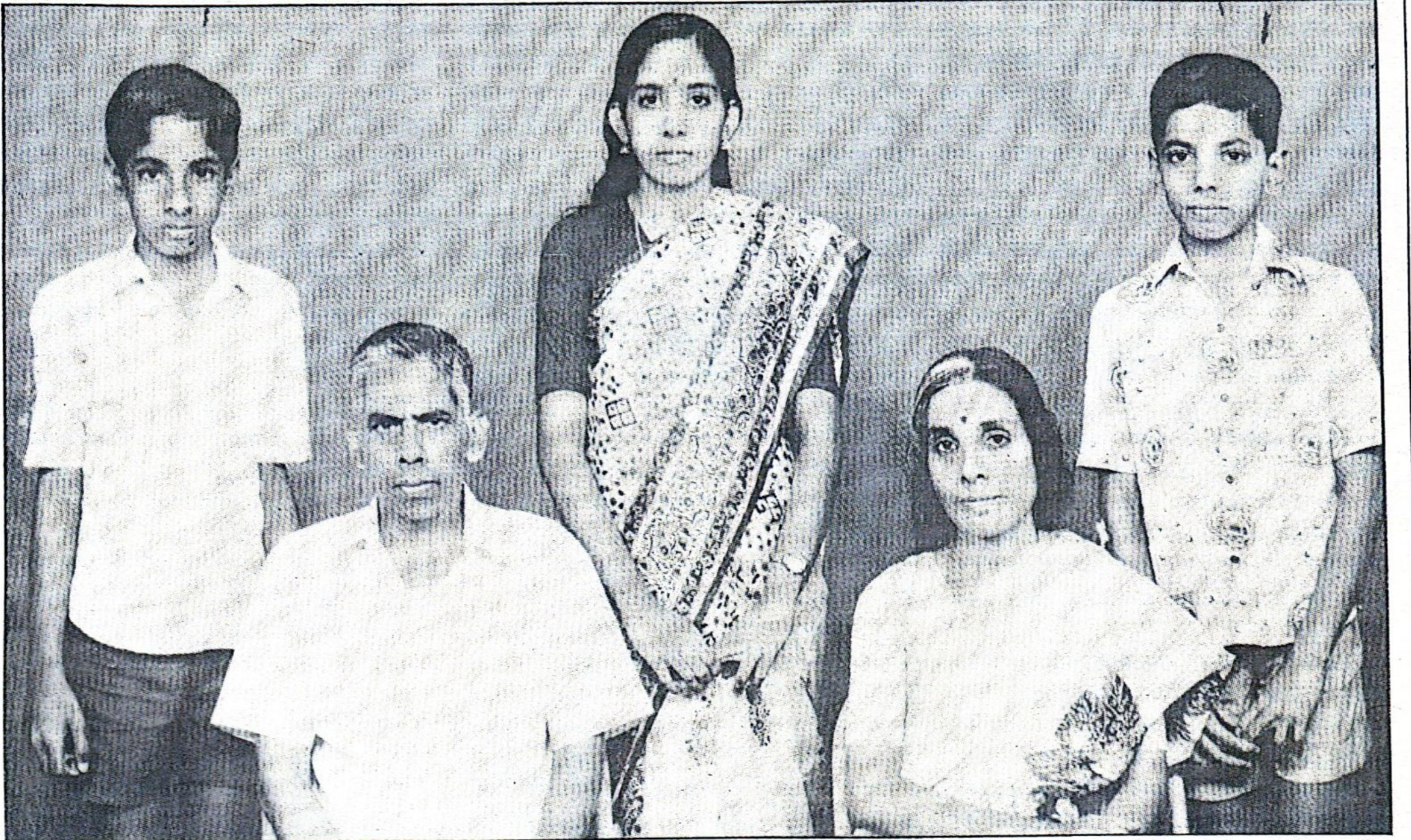
কলকাতার ইতিহাসকার পি থাঙ্কপ্পন নায়ারের পরিবার

সত্যি সত্যি নতুন শহরের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ফিরে যান নিজের ঘরে নিজের শহরে। আবার ইন্দু উর্মিলের মত লোকেরা পরদেশেই নতুন করে গৃহপ্রবেশ করে। মিলেমিশে একাত্ম হয়ে যায় তাদের সঙ্গে। তবে ঘর ছাড়া প্রবাসী মানুষ বোধহয় তাঁর নিজস্ব ধর্মীয় ধারাটিকে অত্যন্ত সচেতনভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে চেষ্টা করে। অন্তত এক পুরুষ আগের মানুষেরা এখনও তাই করে থাকেন। তাই ইন্দুর মা রবীন্দ্র দীর্ঘ তেতাল্লিশ বছর বাঙালি পরিবেশে কাটিয়ে দেবার পরও প্রতিটি করওয়াচৌথ–এ স্বামীর মঙ্গল কামনায় উপবাস করেন। প্রথা অনুযায়ী সেই দিনটিতে রঙিন চুড়ি মেহেন্দি ও অলংকারে নিজেকে সাজিয়ে তোলেন। পরে সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ উঠলে উপবাস ভঙ্গ হয় তাঁর। অবশ্য ইন্দুর এ ধরণের কোন বিশেষ কুসংস্কার নেই। ও বলে, 'হ্যাঁ বিয়ের পর করওয়াচৌথ হয়ত করব, আবার পুজোর দশমীতে মণ্ডপে সিঁদুর খেলাতেও সমানভাবে যোগ দেব।' অর্থাৎ এ ব্যাপারে মায়ের মত ওর কোন প্রেজুডিস নেই।

ইন্দুর যেমন ধর্মীয় ব্যাপারে কোন প্রেজুডিস নেই তেমনি উর্মিলের নেই খাবারদাবার এর ওপর। '—আমি বাঙালি ভাত, মাছ, মাংস খেতে ভালবাসি। আমার রোজকার খাবারের মেনুতে যে কোন একটা আমিষ খাবার থাকবেই। গুজরাতি খাওয়া দাওয়া প্রায় ভুলতেই বসেছি।' কিন্তু তাই বলে উর্মিল যে গুজরাতি সংস্কৃতি থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে তা নয়। ওর বেশির ভাগ বন্ধুরাই গুজরাতি। কলকাতার অনেক গুজরাতি পরিবারের সঙ্গেই ওঁর মেলামেশা। নিজের দেশের গান শুনতে ভালবাসে। মায়ের তৈরি গুজরাতি কাজ করা সালোয়ার কামিজ ওর প্রিয় পোশাক।

বিগত বার বছর দিল্লিতে থেকে নানা দেশের মানুষজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার পরেও স্বজাতির প্রতি অসম্ভব টান অনুভব করেন তপন। 'পথে ঘাটে হোটেল রেস্তোরাঁয়, উৎসবে, অনুষ্ঠানে যেখানেই যাই না কেন বাংলা কথা শুনলে নিজের অজান্তেই মনটা কেমন নেচে ওঠে। তৎক্ষণাৎ যেচে আলাপ করি, বাড়িতে যাবার আমন্ত্রণও জানাই'। তপনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা প্রায় সবাই বাঙালি। কেউ প্রবাসী বাঙালি আবার কেউ বা পশ্চিমবঙ্গের। তপন আর কলকাতায় ফিরে যেতে চান না বা সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে চান না ঠিকই তবে, 'ঘর ছেড়ে দূরে এসে ঘরের মানুষ-জনের প্রতি আগের চেয়ে এখন যেন অনেক বেশি টান অনুভব করি।'

কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অনেক ভাবনা চিন্তার ধারাই পাল্টে যায়। অন্তত সঞ্জীব আনন্দের মতে তাই। তা না হলে এতদিন কলকাতাবাসের পর যখন এঁরা প্রায় কলকাতার–ই একজন হয়ে উঠেছেন তখন সঞ্জীবের মা, সেই সুদূর পাঞ্জাবে নিজের গ্রামে ফিরে যাবার জন্য এত ব্যাকুল হবেন কেন। সঞ্জীব যখন বছর দুয়েকের তখন ওঁর বাবা সপরিবারে কলকাতা চলে আসেন। সে প্রায় পঁচিশ বছরের কথা। দক্ষিণ কলকাতায় ওঁদের নিজেদের ফ্ল্যাট। বাবা অবশ্য মারা গেছেন আজ দু'বছর। কিন্তু এতদিন পর হঠাৎ সঞ্জীবের মা তাঁর গ্রামে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন।—'জানিনা গ্রামে ফিরে সবার সাথে মানিয়ে চলতে পারব কি না, তবে এই শহরে আমার আর ভাল লাগছে না। এখানে সবই আছে, এখানকার সবার সাথে একাত্ম হয়ে গেছি সে কথাও সত্যি তবু মনে হচ্ছে নিজের ঘর থেকে আজ আমি বিচ্ছিন্ন, আপনজনেদের থেকে দূরে।' ছেলে সঞ্জীব এখানেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই যেতে হলে তাঁকে একাই যেতে হবে। তবুও পিছপা নন বৃদ্ধা। জীবনের শেষ সময়টা তাঁর পুরনো ঘরে স্বভূমিতে কাটিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর তিনি।

অবশ্য সঞ্জীবের মায়ের মত স্থায়ীভাবে ঘরে ফিরে না গেলেও ঘর ছাড়া মানুষজনেরা কিন্তু ঘরের সঙ্গে প্রতিনিয়তই তার যোগাযোগটি অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করে। যেমন, যত কাজই থাকুক না কেন তপন প্রতিবছরেই একমাস কলকাতায় তাঁর আত্মীয়স্বজন পুরানো বন্ধুবান্ধবদের মাঝে কাটায়। অনেক কষ্ট করেও উর্মিল বছরে দুবার তাঁর নিজের জায়গা থেকে ঘুরে আসে। এই কিছুদিন আগেও ইন্দুর বাবা প্রায় নিয়মিত (বছরে ১ বার) চণ্ডীগড় যেতেন। নিজের আত্মীয়স্বজনের মাঝে কাটিয়ে আসতেন বেশ কয়েকদিন। অথচ ইন্দু সে ধরনের কোন টানই অনুভব করে না। আগে মাঝে মধ্যে বাবামায়ের সঙ্গে গেছে ঠিকই। '—কিন্তু এখন কেমন যেন নিজেকে ওদের মাঝখানেও বিচ্ছিন্ন লাগে। একেবারে মিশতে পারি না। মনে হয় ওরা যেন অন্য কোন গ্রহের বাসিন্দা।'

'ধীরে ধীরে আত্মীয় স্বজন থেকে আমার ছেলেমেয়েরা ভারি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।' বললেন ইন্দুর বাবা উপেন্দ্র খুরানা।

'এর কারণটা খুবই পরিষ্কার। আমরা মানুষ হয়েছি সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশে, অন্য পরিবেশের মানুষের সঙ্গে বড় হয়েছি, একমাত্র কিছু কিছু নিজস্বতা ছাড়া আমরা, বিশেষ করে আমরা ভাইবোনেরা পুরোপুরি বাঙালি হয়ে গেছি। তাই যেটা আমাদের নিজস্ব পরিবেশ অর্থাৎ পঞ্জাবী সংস্কৃতি বা আচার আচরণের সঙ্গে একাত্ম হতে পারি না।' জানালেন ইন্দু। সঞ্জীব আনন্দের ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। পঞ্জাবী পরিবেশে আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে অসুবিধে হয় না ঠিকই তবে কোন বয়স্ক আত্মীয়ের সঙ্গে কথা বলার সময়ই ওঁর আসল সমস্যা। নিজের গ্রাম জ্ঞাতি সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না ও, আর তার চেয়েও বড় কথা অমৃতসর থেকে আসা এইসব বয়স্ক মানুষের ভাষাই বুঝতে পারে না সঞ্জীব। বাড়িতে বাংলা বা হিন্দিতেই কথা বলা অভ্যাস। ঠেঁট পঞ্জাবী ওর আসে না একেবারেই। এই ধরনেরই সমস্যায় ভোগেন কলকাতার অল্প কালের বাসিন্দা পূর্ণেন্দু। বন্ধুবান্ধব বা এখানকার আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে নেমন্তন্ন করলে ভীষণ মুশকিলে পড়ে সে। বিহারে মানুষ হওয়ায় ভাল করে কাঁটা বেছে মাছ পর্যন্ত খেতে পারে না পূর্ণেন্দু। 'আমাদের বাড়িতে বাঙালি খাওয়া দাওয়া প্রায় নেই বললেই চলে। রুটি, সব্জি, এসব খেতে ভালবাসি, মাছ মাংসের সঙ্গে সদ্ভাব অত্যন্ত কম'।

তবে এসব ব্যাপারে যতই পরিবর্তন হোক না কেন খতিয়ে দেখা গেছে স্বদেশে বা প্রবাসে মানুষের দর্শন বা চিন্তাধারার অদলবদল ঘটলেও একটি ব্যাপারে কিন্তু শতকরা ৯০ জন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়নি। সেই অপরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিটি হল বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন। এখনও অনেকেই চান তাঁর সন্তান সন্ততিদের বিবাহ নিজস্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে হোক। এবং সম্ভব হলে স্বজাতিই শ্রেয়। এ ব্যাপারে ইন্দুর বাবা উপেন্দ্র খুরানা একমত, কারণ তিনি বিশ্বাস করেন এতে পরিবারের ধারাটি বজায় থাকে।

নতুন প্রজন্ম অবশ্য এতে বিশ্বাসী নয়। ইন্দু, সঞ্জীব বা ওঁর বয়সী ছেলে মেয়েরা মনে করে ওরা এই ধরনের সেতু পেরিয়ে এসেছে। নিজের স্বল্প গণ্ডীর বাইরে বৃহত্তর পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে ওদের পরিচয়। সেখানে এই ধরনের ক্ষুদ্রতার কোন স্থান নেই। ওদের দেশ তাই স্বজাতি সম্প্রদায় ও ভাষাভাষী ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত প্রান্তে।

আলপনা ঘোষ

ছবি: কাজি আবদুল মোহিত, দরবার স্টুডিও

পূর্ণেন্দু

বন্ধুবান্ধব বা এখানকার আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে নেমন্তন্ন করলে ভীষণ মুশকিলে পড়ে সে। বিহারে মানুষ হওয়ায় ভাল করে কাঁটা বেছে মাছ পর্যন্ত খেতে পারে না পূর্ণেন্দু।

কলকাতার মন্দির মসজিদ

বাঙালি জীবনের ধর্মীয় দলিল

কালীঘাটে'র মাতৃমন্দির

ছবি : বিকাশ চক্রবর্তী
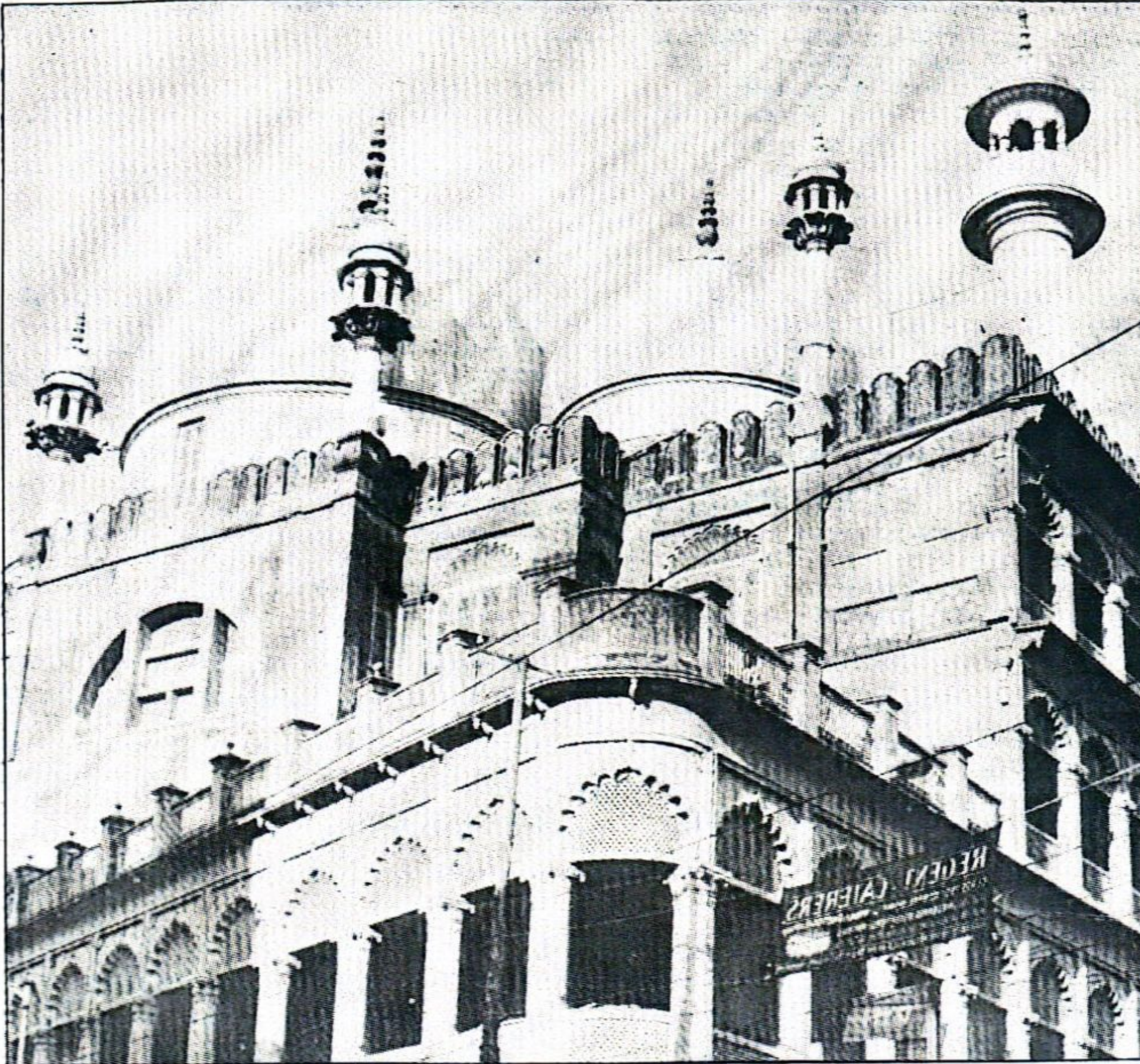
কলকাতার বৃহত্তম মসজিদ, নাখোদা মসজিদ

ছবি : বিকাশ চক্রবর্তী

বাবরি মসজিদ–রামমন্দির দখলের কাজিয়া যখন সারা ভারতকে উত্তাল করে তুলছে, তখন কলকাতার মন্দির-মসজিদ সংক্রান্ত বিরোধ–বিতর্কগুলি কোন ভবিষ্যতকে ইংগিত করায় ?

৮৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞাননির্ভর সময়ে ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মত এখনও মহারাজা, মহারানী, রাজকুমার, রাজকুমারীরা অতিলৌকিক অশ-রীরি জিনদের ঝামেলায় পড়ছেন?
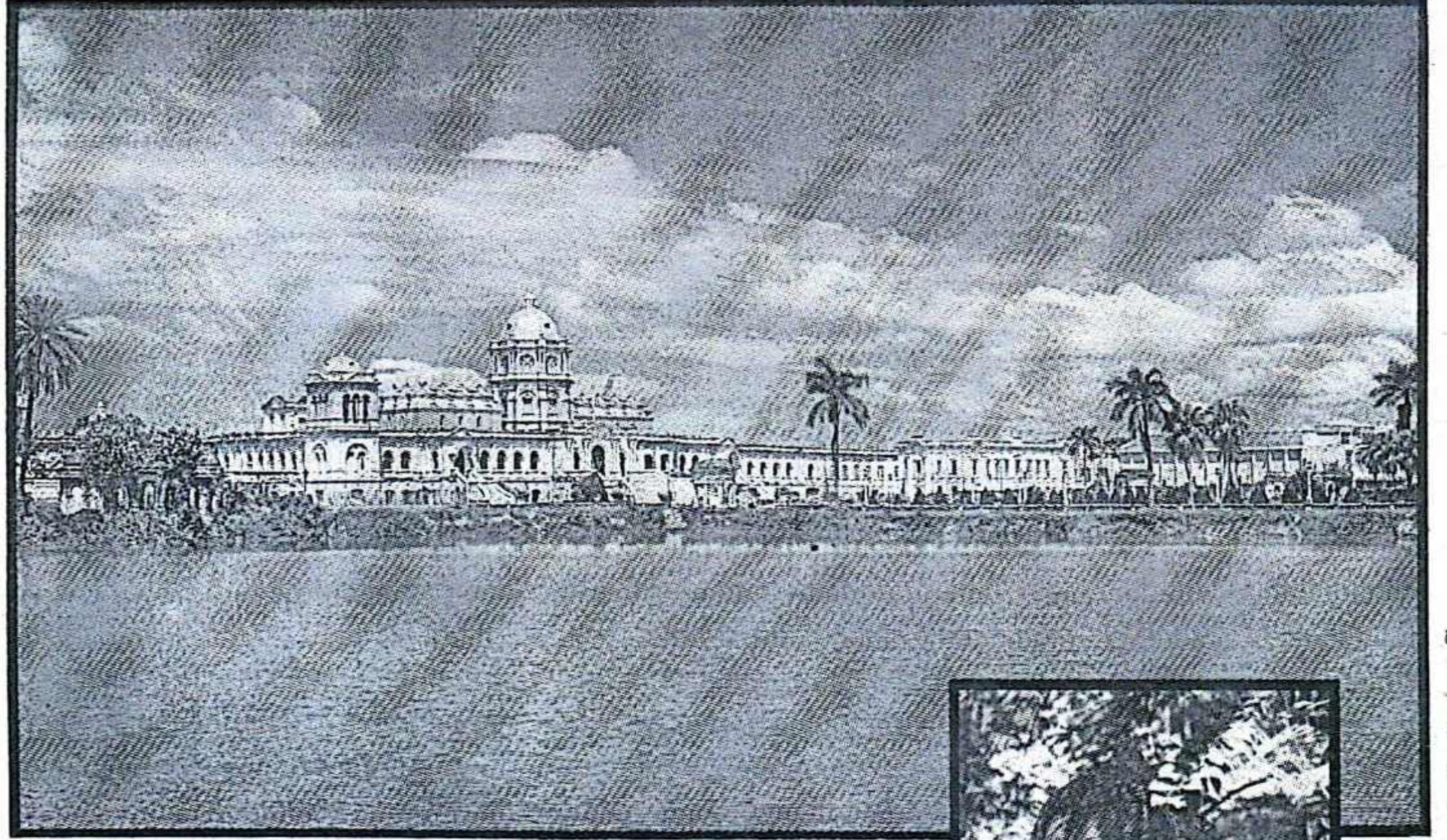
ছবি : বিকাশ চক্রবর্তী

উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ

আগরতলার রাজপ্রাসাদে অতিলৌকিক জিনদের আনাগোনা

রাজ কুমার সহদেব বিক্রম

আজ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগের ঘটনা। মহারাজ বীরচিক্রম কিশোর মাণিক্য তখন ত্রিপুরার মহারাজা। দুই শতাধিক দাসদাসী, পাইক পেয়াদা, সেপাই সান্ত্রী নিয়ে ঐতিহ্যবাহী বিশাল উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের অন্দর মহল তখন গমগম করছে। এরই মাঝে সহসা এক সন্ধ্যায় রাজ অন্দরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল। মুক্তাবলী নামে এক হিন্দুস্থানী পরিচারিকা আচমকা কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে কেমন সব অদ্ভুত আচরণ করছে। পচিশোর্ধ সুঠামদেহী এই দাসীটির শরীরের বেশবাস কেমন এলোমেলো। উস্কোখুস্কো চুল। ক্রুদ্ধ চাউনি। দুটি চোখ থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে। সবাই লক্ষ্য করল, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে মুক্তাবলী হাত–পা ছুঁড়ছে আর বিকট চিৎকার করে আবোল তাবোল বকছে। এক সময় সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। মুক্তাবলীর এই অদ্ভুত আচরণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই রাজ অন্দর মহলে রীতিমত হুলুস্থুল কাণ্ড শুরু হয়। নানা জল্পনা–কল্পনা চলতে থাকে। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে চিকিৎসকরা ছুটে এলেন, ওঝা–বদ্যিরাও হাজির। সবাই পরীক্ষা–নিরীক্ষা করলেন। কেউ বললেন–হিস্টিরিয়া, কেউ বললেন, জিনে ভর করেছে। চিকিৎসকরা ওষুধপত্র দিলেন, ওঝারা ঝাড়ফুঁক করলেন। কিছুক্ষণ পরে মুক্তাবলীর জ্ঞান ফিরে এল বটে কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে আবার আবোল তাবোল বকতে শুরু করল। এভাবে সারা রাত্রি কেটে যায়। মুক্তাবলীর কোন পরিবর্তন ঘটল না। এক সময় সে পাঁঠার মাংস খাওয়ার জন্য বায়না ধরে। তাকে প্রচুর পরিমাণ মাংস এনে দেওয়া হয়। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সে রাক্ষসের মত গোগ্রাসে সব মাংস সাবাড় করে ফেলে।

পরদিন সকালবেলা খবর পেয়েই ছুটে এলেন ফকির সাহেব। ভাল নাম আবুল খায়ের হলেও ফকির সাহেব নামেই তিনি সর্বত্র পরিচিত। রোগ-শোক ইত্যাদির জন্য বিশিষ্ট চিকিৎসকরা যেমন রাজ পরিবারের বেতনভুক্ত কর্মচারী ছিলেন তেমনি শত্রুর চক্রান্ত, ভূত–প্রেত জিন ও বিভিন্ন অমঙ্গলাদির প্রতিকারার্থে পাহাড়ি ওঝাদের পাশাপাশি বাঘা বাঘা তান্ত্রিক এবং মুসলিম ফকিররাও ছিলেন ধর্মভীরু মহারাজার বিশেষ অনুগ্রহপুষ্ট। এইসব ফকির তান্ত্রিকদের সাহায্যে মহারাজা দুঃসাধ্য কাজও সফল করতেন বলে জানা যায়।

ফকির সাহেব যথার্থই এলেমদার ব্যক্তি। অকুস্থলে পৌঁছেই তিনি যথাবিহিত কাজকর্ম শুরু করলেন। ––মাথায় গোলটুপি, লম্বা চুল দাড়ি, গায়ে বিশাল আলখাল্লা। ফর্সা, দীর্ঘদেহী ফকির সাহেব তার গলার বর্ণোজ্জ্বল পাথরের সুদৃশ্য মালাটি হাতে নিয়ে বিচিত্র সুরে বিড়বিড় করে আরবী ভাষায় বেশ কিছুক্ষণ 'সুরা' ইত্যাদি পাঠ করলেন। তারপর একটি ধাতুর পাত্রে রাখা জল 'অসুস্থ' মুক্তাবলীর চোখেমুখে আর সারা শরীরে ছিটিয়ে দিলেন, বিড়বিড় করতে করতে হাতের মালাটি শরীরে স্পর্শ করালেন। কিছুক্ষণ পরে দাসীটি আড়ামোড়া ভেঙে বিস্ফারিত চোখে তাকাল। ফকির সাহেব তাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। অত্যন্ত বিরক্ত, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে কিছু বলে, আবার চুপ করে থাকে। ফকির সাহেবের এবার জিদ চেপে যায়। এবার তিনি মুক্তাবলীর হাতের কনিষ্ঠ আঙুলের নখের গোড়ায় কি সব 'ওষধি' চেপে ধরতেই সে চিৎকার করে ওঠে। এবং বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে থাকে।

এভাবে পরপর তিন দিনের প্রক্রিয়ায় মুক্তাবলী জিনের কবল মুক্ত হল। কিন্তু অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় তার মুখ থেকে যে জবানবন্দী পওয়া যায়, ত একককথায় রোমাঞ্চকর। বিশাল রাজপ্রাসাদের

রাজগুরু নীলমণি প্রভু এবং মহারাজ কিরীট বিক্রম
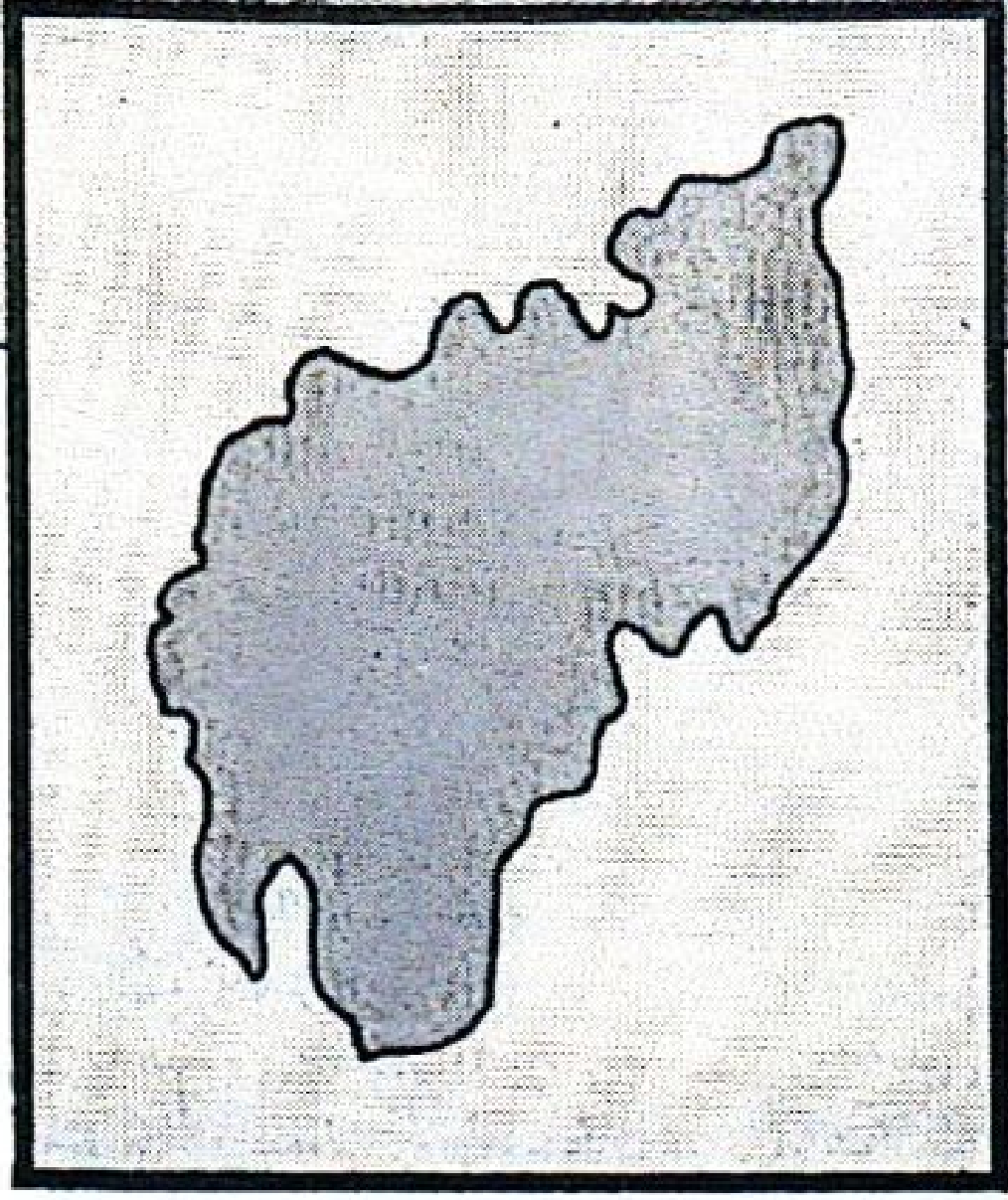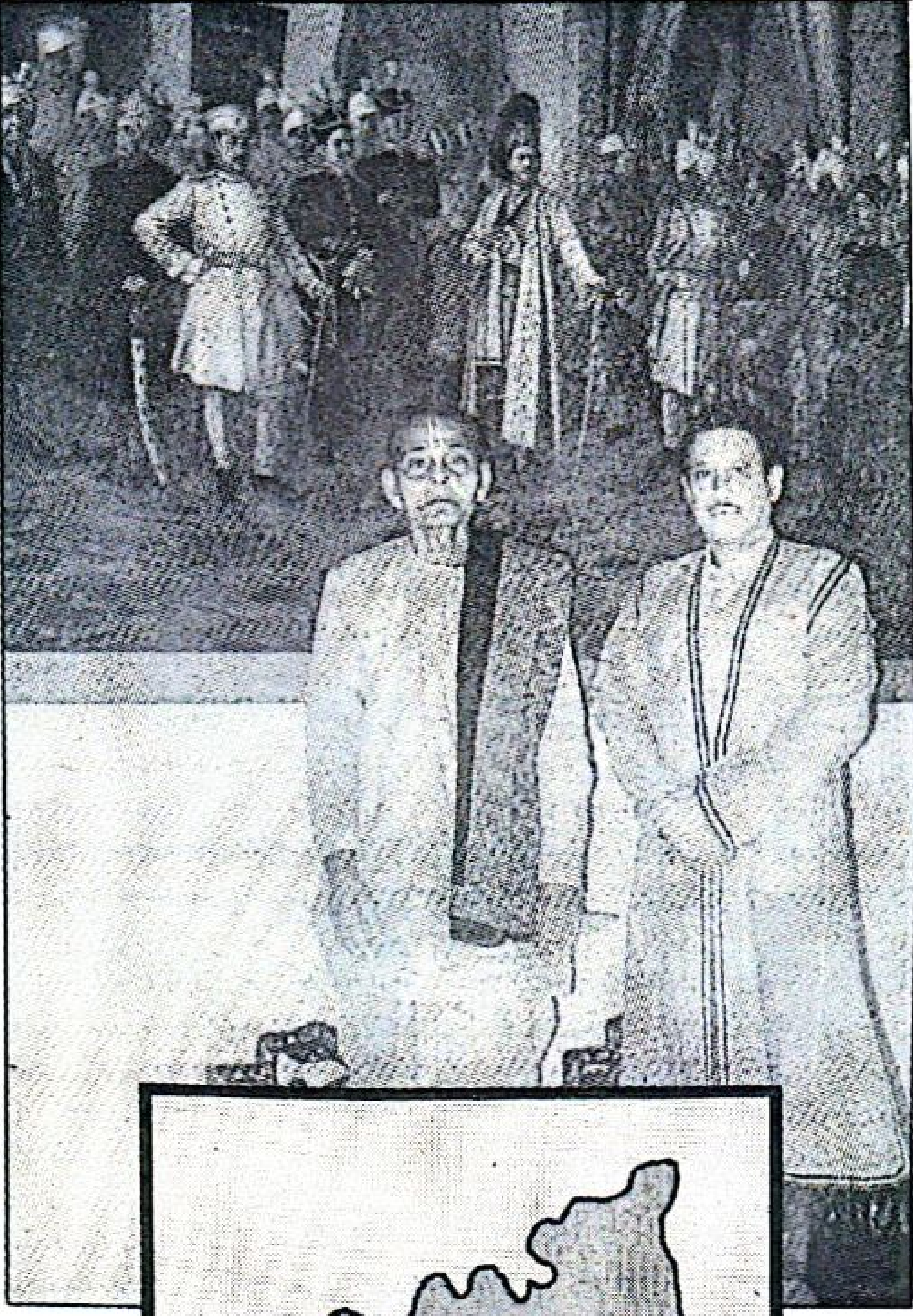
ত্রিপুরা

অন্দর মহলের উঠোনে অবস্থিত সুউচ্চ মিনারটির কাছে শনিবারের ভর সন্ধ্যায় এই দাসীটি নাকি এলো চুলে অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল। আর তখনই 'জিন' তার উপর ভর করে। এমন সুযোগেরই নাকি অপেক্ষায় থাকে এরা।

কিন্তু রাজপ্রাসাদের মিনারে জিন এল কোত্থেকে? তারও জবাব দেয় মুক্তাবলী। আসলে রাজপ্রাসাদের নিরাপত্তা তথা সুরক্ষার লক্ষ্যে নির্মিত হয়েছিল বিশাল মিনারটি। ৬০ থেকে ৭০ জন নিরাপত্তাকর্মী মিনারটির মধ্যে থেকে চারপাশে দিনরাত সুতীক্ষ্ণ নজর রাখত। সু–উচ্চ মিনারটি তৈরির শেষ পর্যায়ে একজন মুসলিম রাজমিস্ত্রি আচমকা উপর থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। লম্বা দাড়ি গোঁফওয়ালা ওই রাজমিস্ত্রীটি সবসময়ই মাথায় একটি পাগড়ি ব্যবহার করত। এজন্য সবাই তাকে 'পাগড়ি' বলে ডাকত। সেই মুসলিম রাজমিস্ত্রীর অতৃপ্ত আত্মাই নাকি মিনার-টিতে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সুযোগ পেয়ে মুক্তাবলীর শরীরে ভর করে। এই ঘটনা জানাজানি হতেই সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং তার কিছুকাল পরেই 'অভিশপ্ত' মিনারটি ভেঙে ফেলে সেখানে একটি চাঁপা ফুলগাছ পুঁতে দেওয়া হয়। সেই ফুল-গাছটি এখনও বিদ্যমান।

অলৌকিক জিন বা ভূতপ্রেতের অস্তিত্ব আছে কি না সেই প্রশ্নে না গিয়েও, ভারতের অন্যতম সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ত্রিপুরা রাজপরিবারের বিশাল 'উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ'কে ঘিরে অতীতে এবং সাম্প্রতিক কালে অশরীরি জিনেদের আনাগোনা সংক্রান্ত কিছু রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীর দিকে আলোকপাত করা যাক। এইসব ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে রাজকুল গুরু নীলমণি প্রভু মহারাজ, কুমার সহদেব বিক্রম, কিশোর দেববর্মা, প্রয়াত মহারাজা বীর-বিক্রমের অন্তরঙ্গ বন্ধু স্থানীয় মুকুন্দ ঠাকুর, রাণা বিলাজ্জং বাহাদুর সহ আরও অনেকেই বর্তমান। তাদের মুখ থেকে শোনা অভিজ্ঞতার বর্ণনা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদনের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। যে অলৌকিকতার সঙ্গে ঘটনা-ক্রমে বাংলার কৃতিসন্তান প্রয়াত ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, ডাঃ নীলরতন সরকার, যামিনী কবিরাজ এবং ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত সহ আরও অনেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছেন।

মহারাজকুমার সহদেব বিক্রম কিশোর একাধারে যেমন শিল্পী, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, অন্যদিকে তন্ত্রমন্ত্র ও পরলোক বিষয়েও গভীর আগ্রহী। মহেশ যোগী, সাঁইবাবা, মৌনী বাবার কনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসা ছাড়াও তিনি উত্তরভারতের বহু বিশিষ্ট তান্ত্রিকযোগীর সংস্পর্শে এসেছেন। এ প্রসঙ্গে মহামুনীন্দ্র গোরখনাথ বাবাজীর নাম উল্লেখ্য, যিনি 'ফক্কর বাবা' নামেই সর্বাধিক পরিচিত। পঞ্চাশোর্ধ, চিরকুমার এই মহারাজ কুমার নিজে তন্ত্র সাধনায় যুক্ত, জিনের আসরেও তাঁর রয়েছে যাতায়াত। সহদেব বিক্রম এই প্রতিবেদককে বলেন, প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে রাজপ্রাসাদে দাসী মুক্তাবলীকে জিনে ভর করা এবং তার অদ্ভুত আচ-রণ তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তখন তিনি কিশোর হলেও সব বুঝতে পারতেন। প্রাসাদের সেই 'অভিশপ্ত' মিনারটির ব্যাপারেও অনেক কিছুই তিনি শুনেছেন গুরুজনদের মুখে। অমাবস্যা রাতে কিংবা শনি–মঙ্গলবারের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে এই মিনার থেকে নাকি করুণ আর্তনাদ ঝরে পড়ত। কখনো দেখা যেত সেই মুসলিম রাজমিস্ত্রী 'পাগড়ি'র বিকট দর্শন ছিন্ন মুণ্ড মিনারের উপর থেকে আর্তনাদ করতে করতে গড়িয়ে পড়ছে। একসময় গোটা রাজপরিবারের কাছে মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে দাঁড়ায় এই মিনার। এসব নানা কারণে পরবর্তী সময়ে এটি ভেঙে ফেলা হয়।

প্রয়াত মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের আমলে একদা ঘন জঙ্গলাকীর্ণ বর্তমান আগরতলায় নগর নির্মাণ করে পুরাতন আগরতলা থেকে রাজপাট সরিয়ে এনে নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করা হয়। কৃষ্ণ মাণিক্যের রাজত্বকাল ছিল ১৮০০—৪৯ খ্রীঃ। তার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে রাজপ্রাসাদটি দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেটা ১৮৯৭ সালে ১২ জুন। ত্রিপুরার মহারাজা তখন মহর্ষি রাধাকিশোর মাণিক্য। বিধ্বস্ত প্রাসাদটি মেরামত না করিয়ে শিল্পরসিক মহারাজা অপূর্ব কারুকার্য-মণ্ডিত এক নতুন রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত মার্টিন অ্যাণ্ড বার্ণ কোম্পানি কর্তৃক ইটালিয়ান মার্বেল পাথরে নির্মিত সেই রাজপ্রাসাদটিই আজকের 'উজ্জয়ন্ত প্যালেস।' ত্রিপুরার বিধানসভা ভবন।

কিন্তু এই প্রাসাদটির নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার অব্যবহিত পর থেকেই না কি নানান অঘটন ঘটতে থাকে। সারাদিন রাজমিস্ত্রীরা যেটুকু কাজ করে গেলেন, রাত পোহাতেই দেখা গেল কোন এক অদৃশ্য শক্তি সব কিছু কেমন লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে! নির্মাণ কাজে নিযুক্ত রাজমিস্ত্রীদের অনেকেই ছিল তদানীন্তন পূববাংলা (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে আগত। রাত্তিরে তাদের অনেকেই নাকি নানা দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকে এবং রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কারও কারও অকাল মৃত্যু ঘটে। এসব ঘটনায় গভীর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মাহারাজ রাধা কিশোর মাণিক্যও এসব ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। উপজাতি ওঝা, তান্ত্রিকদের দিয়ে শান্তি স্বস্তয়ন করা হয়। এত সবের পরেও কোন সুফল না পাওয়ায় পূর্ব বাংলা থেকে বেশ ক'জন মুসলিম ফকিরকে আনা হয়। তারা এসে সব কিছু দেখে শুনে মহারাজ-কে জানান, প্যালেসটি যেখানে নির্মিত হচ্ছে, তার একাংশে কবরখানা ছিল। সেটি অশরীরি জিনদের পবিত্রস্থান। আর এজন্যই অশান্তি হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ওই মুসলিম ফকিরগণ ইসলামি মতে বিভিন্ন 'করণ কারণ' করার পরে নাকি অশরীরি আত্মার তাণ্ডব কমে!

রাজকুলগুরু নীলমণি প্রভু এবং মহারাজ কুমার সহদেব বিক্রম এই প্রতিবেদককে জানান, মুসলিম ফকিরদের নির্দেশেই উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সম্মুখ প্রাঙ্গণের পূর্বভাগে লক্ষ্মী নারায়ণ দীঘির উত্তর তীরে অবস্থিত গম্বুজাকৃতি মসজিদটি নির্মিত হয়। মুসলিম ফকিরগণ এখানেই নাকি জিনেদের বন্দী করে রেখেছেন। এখনও অনেকেই এটা বিশ্বাস করেন। সেই মসজিদ মত দালানটি এখনও পরি-ত্যক্ত অবস্থায় চারপাশে আগাছার জঙ্গলে শোভিত হয়ে অস্তিত্ব জাহির করছে!

সেই থেকে ত্রিপুরা রাজপরিবারে পণ্ডিত শিল্পী তান্ত্রিকদের পাশাপাশি মুসলিম ফকিরদেরও কদর বেড়ে যায়। মহারাজ কুমার সহদেব বিক্রম বললেন, প্রত্যেক শনি ও মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ফকির সাহেব আসতেন। লম্বা দাড়ি, হাঁটু পর্যন্ত আলখাল্লা পরিহিত ফকির সাহেব রাজ অন্দরে প্রবেশ করেই পশ্চিম-দিকে মুখ করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে গলার বর্ণোজ্জ্বল মালাটি হাতে নিয়ে বিচিত্র স্বরে অনর্গল সুরাকলমা পাঠ করতেন। পরে সমস্ত রাজকুমারদের চোখে মুখে শরীরে মন্ত্রপূতঃ জল ছিটিয়ে দিতেন এবং মালাটি স্পর্শ করাতেন।

প্রত্যেক বছর একটা নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ব বাংলা

থেকে বিচিত্র বেশ ধারী ছ সাত জন ফকির আসতেন এবং তারা বিভিন্ন প্রক্রিয়া শেষে সার বেঁধে রাজ-বাড়ির চারপাশ পরিক্রমা শেষে প্রাসাদের চার সীমানার নির্দিষ্ট স্থানে মাটির সরায় আরবী হরফে সুরা লিখে লাল নিশান সহ ঝুলিয়ে দিতেন। জিন ও অশুভ শক্তির উপদ্রব থেকে রাজপ্রাসাদকে রক্ষা কল্পেই প্রতিবছর এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হত। জানা যায়, মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর যখন রাজ-দরবারে যেতেন, তার প্রাক্কালে ফকির সাহেবের আশীর্বাদ নিতেন।

ফকির সাহেব ছিলেন প্রচণ্ড এলেমদার ব্যক্তি। একবার মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরের প্রথমা পত্নী মহারানী প্রভাবতী দেবীর দুশো ভরি সোনার একটি পান বাটা উধাও হয়ে গেলে প্রচণ্ড হৈ-চৈ শুরু হয়ে যায়। ফকির সাহেব এই খবর শুনে বললেন, চিন্তার কারণ নেই, পানবাটা পাওয়া যাবেই। অতঃপর ফকির সাহেব প্রাসাদের একটি বিশেষস্থানে একটি তাবিজ ঝুলিয়ে দিলেন। আশ্চর্য! ঠিক দুদিনের মাথায় সোনার পানবাটা পাওয়া গেল। অলৌকিক ক্ষমতাধর ফকির সাহেব সব সময় দুটি জিনকে নিজের আজ্ঞাবহ, দাস করে রেখেছিলেন এবং তাদের সাহায্যেই অনেক অসাধ্য সাধন করতেন বলে জানা যায়। রাজগুরু নীলমণি প্রভু জানালেন, রাতের বেলা জিন চক্র বসিয়ে ফকির সাহেব জিন নিয়ে আসতেন। গা ছমছম করা এমন দুতিনটি জিন চক্রে রাজপ্রভু এবং আরো অনেক বিশিষ্টজনেই অশরীরি জিনের কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করেছেন।

মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর একবার ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সেটা ১৯২০-২২ সালের কথা। অবস্থা এমনই দাঁড়াল যে কলকাতা থেকে জরুরি তলব করে ডাঃ বিধান রায়, ডাঃ নীলরতন সরকার, যামিনী কবিরাজ প্রমুখদের রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসা হল। তাদের তত্ত্বাবধানে রইলেন তদানীন্তন ত্রিপুরার চীফ মেডিকেল অফিসার ডাঃ মণিময় মজুমদার। মহারাজার অসুস্থতা গুরুতর হওয়ায় চিকিৎসকগণ বর্তমান 'দুর্গাবাড়ি'দালানে শিবির করেন। সেটা ছিল পৌষ মাস। পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরায় প্রচণ্ড ঠান্ডা। তখন রাত প্রায় দুটো। ডাঃ বিধান রায়, ডাঃ মজুমদার সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ কে এসে তাদের ডাকছে, 'ডাক্তারবাবুরা, জাগুন, জাগুন, মহারাজ ভীষণ অসুস্থ। আপনাদের তলব করেছেন।' এই ডাক শুনে ঘুম থেকে সবাই ধড়মড় করে উঠে বসলেন। ডাঃ বিধান রায়, ডাঃ নীলরতন সরকার সহ ডাঃ মণিময় মজুমদার গভীর রাতে এই হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে রাজ-প্রাসাদে ছুটে গেলেন। কিন্তু এ কি! সবাই তো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। অনেক ডাকাডাকির পর মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর জাগলেন। বিস্মিত কণ্ঠে মহারাজ জানতে চাইলেন সে কি! এত রাতে আপনারা? আমি তো এখন অনেকটা সুস্থই আছি। তিন
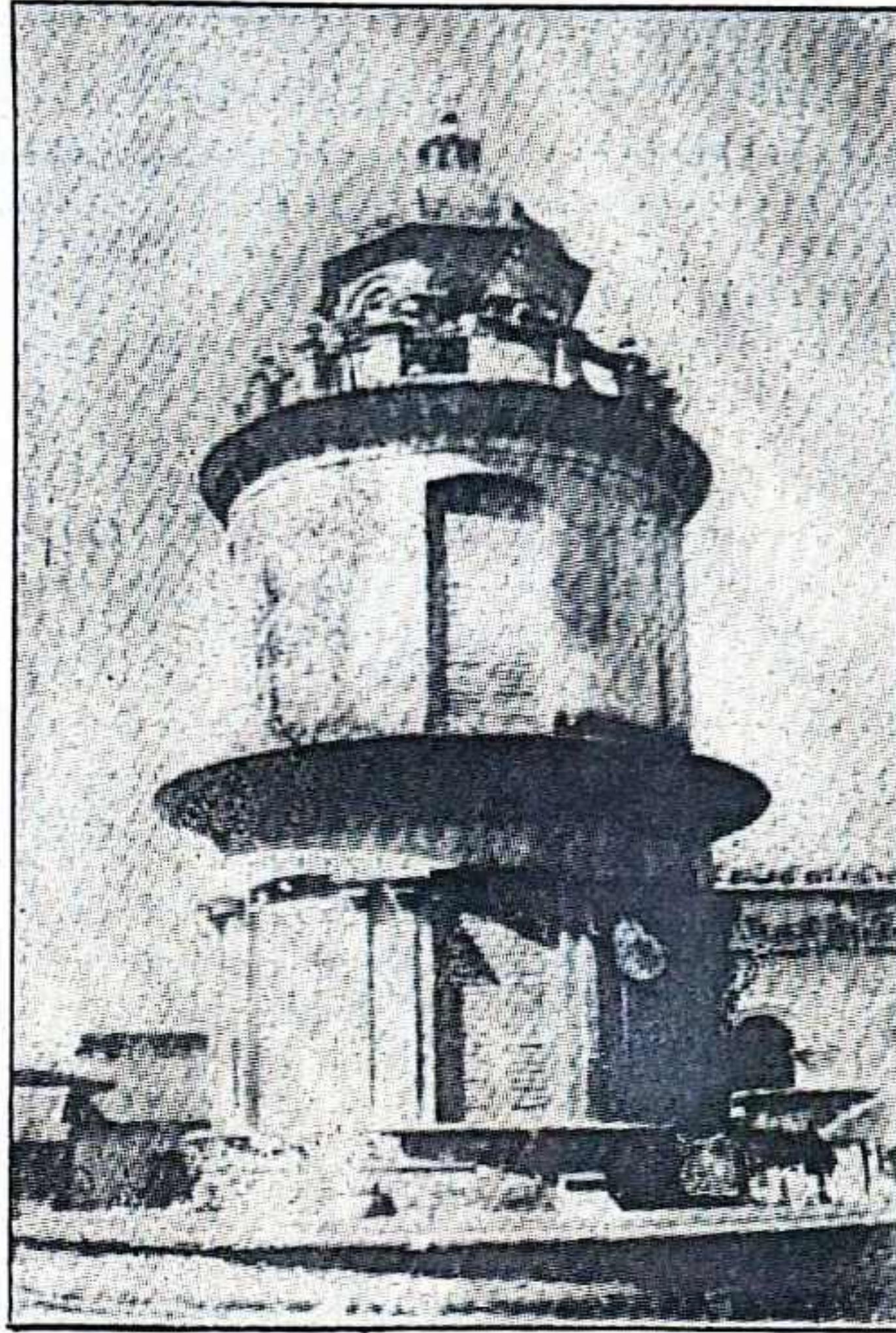
সেই অভিশপ্ত মিনার

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তখন বোকা বনে যাওয়ার অবস্থা। পরে সব শুনে মহারাজ বললেন, হুঁ বুঝতে পেরেছি। এখানে একটা অশরীরি আত্মা মাঝে মাঝেই বড় উৎপাত করে। আপনারা বোধহয় তারই খপ্পরে পড়েছিলেন। অত রত্তিরে অপনাদের এই কষ্টের জন্য আমি দুঃখিত। সত্তরোর্দ্ধ বৃদ্ধ রাজগুরু নীলমণি গোস্বামী এই প্রতিবেদককে জানালেন, উজ্জয়ন্ত প্যালেসে অশরীরি জিনেদের এরকম অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনা তিনি শুনেছেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে চাক্ষুস দেখেছেন।

১৯৭২ সালে ত্রিপুরার কংগ্রেস সরকার মাত্র তেইশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে উজ্জয়ন্ত প্যালেসটি কিনে নেন। মুখ্যমন্ত্রী তখন সুখময় সেনগুপ্ত। প্যালেসটি দেখার সময় হঠাৎই সুখময়বাবুর নজরে পড়ল, সম্মুখ প্রাঙ্গণের পূর্বভাগে লক্ষ্মীনারায়ণ দীঘির উত্তরতীরে গম্বুজাকৃতি ছোট মসজিদের মত দালানটি। আগাছায় জঙ্গল হয়ে রয়েছে। সুখময়-বাবুর মনে হল, এটি বিশাল প্যালেসের সৌন্দর্যকেই বরং বিঘ্নিত করছে। সুতরাং ভেঙে ফেলতে হবে। সেইমত মুখ্যমন্ত্রী সুখময়বাবু পূর্ত বিভাগের ইঞ্জি-নীয়ারকে ডেকে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিলেন। জনাকয় শ্রমিক অকুস্থলে ছুটে গিয়ে মসজিদটির একাংশ ভেঙে ফেলেছিল। কিন্তু সেই রাতেই সুখ-ময়বাবু অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রচণ্ড জ্বরে ভীষণ কষ্ট পেলেন। তাঁর নাকি ধারণা হয় যে, কিংবদন্তীর ওই মসজিদটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ জারি করার ফলশ্রুতিতেই তিনি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। এবং আশ্চর্য, পরদিনই মুখ্যমন্ত্রীর মতটি বদলে গেল। মসজিদের ভগ্ন অংশ পুনরায় সংস্কার করার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং সেইমত মেরামতি হল। মসজিদটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়ার সঙ্গে মুখমন্ত্রীর জ্বরাক্রান্ত হওয়ার সত্যি কোন যোগসূত্র আছে কি না সেই বিতর্কে না-ই গেলাম। কিন্তু এটা তো বাস্তব যে, সেই মুখ্যমন্ত্রীই মাত্র দুদিনের মধ্যে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে মসজিদটি মেরামতের ব্যবস্থা করেন। এই ঘটনা সুখময়বাবুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও অনেকেই জানেন। এ প্রসঙ্গে সুখময়বাবুর অভিমত জানার জন্য এই প্রতিবেদক বনমালীপুরে তাঁর বাসভবনে ছুটে যান। কিন্তু ডায়াবেটিস ও অন্যান্য রোগে সত্তরোর্দ্ধ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এতই অসুস্থ যে কোন আলোচনা করা সম্ভব হয়নি।

বছর আটেক আগের ঘটনা। মহারাজ কুমার সহদেব বিক্রম তার বাসভবনের পেছনের উঠোনে চাঁপা ফুল গাছের তলায় একটি রিং ওয়েল বসানোর পরিকল্পনা নেন। সেই মোতাবেক তাহের মিঞা নামে এক মুসলিমকে কূপ খননের জন্য ঠিকায় নিযুক্ত করা হয়। চুক্তি মত তাহের মিঞা খনন কার্য শুরু করল। কিন্তু আশ্চর্য, প্রায় কুড়ি ফুট গভীরে খনন করার পরেও জলের দেখা নেই। অথচ কয়েক গজ দূরেই পার্শ্ববর্তী বাড়ির একটি কূপে জল উঠেছে ১২/১৩ ফুট খননের সঙ্গে সঙ্গেই। সহদেব বিক্রমের কেমন সন্দেহ হল। এদিকে তাহের মিঞাও আসছে না। তারপর দিন পাঁচেক পর তাহের মিঞা এসে শঙ্কিত মনে জানায়, মহারাজ, আমি আর কূপটি খনন করতে পারব না। গতকাল রাতে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। দুটি শিশু সন্তান আমায় বলছে, তুমি আর ওখানে মাটি খুঁড়বে না। আমরা ভীষণ আঘাত পাচ্ছি। আমরা এখানে অনেকদিন রয়েছি। এখান থেকে তাড়িয়ে দিলে আমরা কোথায় আশ্রয় নেব? এই স্বপ্ন দেখার পরে তাহের মিঞা ভীষণ ঘাবড়ে যায়। মহারাজ কুমার সহদেব বিক্রমও আশ্চর্য হলেন। কিন্তু তিনিও নাছোড়বান্দা। অনেক চিন্তাভাবনা শেষে সিদ্ধান্ত নিলেন, সেখানে তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পজো দেবেন। সেই মত তিথি নক্ষত্র দেখে কূপটির কাছে এক ভর দুপুরে পুজোয় বসেন মহারাজ কুমার। পুজো যখন প্রায় সমাপ্তির পথে, তখন আচমকা এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে যায়। সহসা প্রচণ্ড বেগে তুফানের ঝাপটা এসে মহারাজ কুমারের শরীরে লাগতেই তিনি ভার সামলাতে না পেরে অদূরে মাটিতে ছিটকে পড়েন। তাঁর সারা দেহমনে এক অদ্ভুত অনুভূতির ঢেউ খেলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, চাঁপা ফুল গাছটি থেকে দুটি পাখি ডানা ঝাপটানোর শব্দ করতে করতে দূরে আকাশের পানে উড়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার, ওই ঘটনার অব্যবহিত পরেই সহসা শুকনো কূপটিতে জল উঠতে থাকে। এই ঘটনা জানাজানি হওয়ার পরে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই আশ্চর্য ঘটনাটি প্রসঙ্গে সহদেব বিক্রমের অভিমত, কোন এক সময় হয়তো কেউ বা কারা যে কোন পরিস্থিতিতেই হোক, দুটি শিশুকে মেরে

মাটি খুঁড়ে পুঁতে রেখেছিল। ওই দুটি শিশুর অতৃপ্ত আত্মা সম্ভবত এখানেই আশ্রয় নিয়েছিল।

হিন্দু শাস্ত্র মতে অশরীরি আত্মার অস্তিত্ব যেমন স্বীকৃত, তেমনি ইসলাম ধর্মানুসারে অদৃশ্য জিনেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। প্রচলিত ধ্যান ধারণা মোতাবেক হিন্দুদের প্রেতেরা যেমন অদৃশ্য থেকে মানুষের মঙ্গল বা অমঙ্গল সাধন করে থাকে, তেমনি জিনেরা অদৃশ্য থেকে মানুষের উপকার বা অপকার করে থাকে। ধর্মীয় ব্যাখ্যার দিক থেকে প্রেততত্ত্ব ও জিনতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও, কাযক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে কিন্তু যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে ভূত-প্রেত-জিনের অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই বটে। কিন্তু এটাও তো সত্য যে আমাদের চারপাশে মাঝেমধ্যে এমন সব অস্বাভাবিক বা অলৌকিক ঘটনা ঘটে যায়, আমাদের বাস্তব বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদকে কেন্দ্র করে সংগঠিত ঘটনাবলীকে তারই নজির হিসেবে ধরে নেওয়া যায় বৈকি।

উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনার সঙ্গে যে ফকির সাহেবের নাম কিংবদন্তীর মত জড়িয়ে আছে, সেই ফকির সাহেবের খোঁজে সেদিন ছুটে গিয়েছিলাম রাজধানী আগরতলার শিবনগর-স্থিত বিখ্যাত গেঁদু মিঞা'র মসজিদে। সেখানকার ইমাম আবুল ফজল খুদরি দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে এই মসজিদে রয়েছেন। ষাটোর্দ্ধ ইমামের কাছে ফকির সাহেবের কথা পাড়তেই জানালেন, বেশ কিছু বছর আগেই বৃদ্ধ ফকির সাহেব এই শহর ছেড়ে সীমান্তের ওপারে চলে গেছেন। তবে ফকির সাহেব যে যথার্থই এলেমদার ব্যক্তি ছিলেন এবং অনেক অসাধ্যই সাধন করতে পারতেন, এ সম্বন্ধে অনেক কিছুই তিনি শুনেছেন এবং দেখেছেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে জিনতত্ত্ব সংক্রান্ত প্রশ্ন করতেই এই বৃদ্ধ ইমাম পবিত্র কোরাণ শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, আল্লা তাঁর উপাসনার জন্য জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পার্থিব দৃষ্টিতে জিনকে দেখা যায় না। কিন্তু জিনদের অস্তিত্ব রয়েছে। কোরাণের ভাষ্য অনুসারে, আল্লা মানুষকে যেমন মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন তেমনি জিনকে আগুন থেকে। এদের ভালমন্দ রয়েছে। জিনেরা বিড়াল, কুকুর, ও বিভিন্ন জন্তুর রূপ ধারণ করতে পারে।

বিশিষ্ট মুসলিম চিন্তাবিদ্ হাজী ডাঃ মহম্মদ সফি লায়েক জিনের অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে: 'সব থেকে ছোট প্রাণী ভাইরাস। কিছুদিন আগেও ভাইরাস সম্বন্ধে আমরা অবহিত ছিলাম না। এমন কি ব্যাকটেরিয়াও ছিল আমাদের জানার বাইরে। হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে এই ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াকে স্বীকার করা হয় না। আমরাও চোখে দেখি না বলে ওগুলি যেন বিশ্বাস করতে পারি না। কিন্তু এদের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধভাবে সত্য। তেমনই জিন বা প্রেতাত্মা বলে কোন কিছু নেই, তা মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, আমরা এখনও অনেক কিছুই আবিষ্কার করতে পারিনি। আমরা আলো বা আগুনের কেমিক্যাল বা ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার জানি না। জানি না বলেই আগুন বা আলোর অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারি। কিন্তু অদশ্য হলেও জিনের অস্তিত্ব রয়েছে।'

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রয়াত স্বামী অভেদানন্দ তান্ত্রিক গুরু নিগমানন্দ সহ আরও অনেক বিশিষ্ট ধর্মগুরু এবং পরলোক তাত্ত্বিকগণ তথ্য প্রমাণ সহ গ্রন্থ বদ্ধ করেছেন প্রেতাত্মা বিষয়ক অনেক কিছু। এমন কি সাম্প্রতিক কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই প্রেতাত্মা বিষয়ে চলছে বিজ্ঞানভিত্তিক নিরলস গবেষণা। এমন কি অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রেতাত্মার প্রমাণ-নির্ভর ছবিও তোলা সম্ভব হচ্ছে ইদানিং। সুতরাং যা দৃশ্যমান নয় তা মিথ্যে নয়। আর, এজন্যই ত্রিপুরার উজ্জয়ন্ত প্রাসাদকে ঘিরে সংগঠিত অলৌকিক ঘটনাবলী আমাদের অচিন রহস্যের সন্ধানে আলোড়িত করে বৈকি!

আগরতলা থেকে সত্যেন্দ্র চক্রবর্তী

যুক্তরাজ্যের এশিয়ান সমকামীরা আত্মপ্রকাশে উন্মুখ

ব্রিটিশ–এশিয়ান সমকামী নারী পুরুষদের সমস্যা গভীর ও জটিল। পরিবার ও সমাজ থেকে ওরা বিচ্ছিন্ন, পরিত্যক্ত। ওরা প্রতিকূল একটা জগতের বাসিন্দা। নিজেদের এই কলঙ্কমোচনের উদ্দেশ্যে, একটু সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে বাঁচবার জন্য তাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'শক্তি'। এক অন্তরঙ্গ প্রতিবেদন।

লণ্ডনের চেরিং–ক্রস স্টেশনে থাকতে থাকতে টের পেলাম, একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। দু'জন তিনজন করে আস্তে আস্তে অনেক লাক ঐ অঞ্চলে জড়ো হতে শুরু করছিল। গুঞ্জন ও কোলাহলে পূর্ণ হয়ে উঠছিল পরিপার্শ্ব। অনেক প্ল্যাকার্ড দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল, অর্থাৎ এক্ষুনি শুরু হবে পদযাত্রা। জনৈক অল্পবয়েসী ছেলেকে দেখলাম পরনে তার কালো মিনি স্কার্ট, সাদা ব্লাউজ, স্টকিং। তার মুখে মেক–আপ, চোখে লাগানো 'ফলস আইল্যাশ'। তার পোশাক–আশাক এমনই বিচিত্র যে আলাদা করে চোখে পড়ার মতো। বেশিরভাগ লোকের পরনে টি–শার্ট আর জিনস। সময়টা ছিল এক শনিবারের বিকেল। তারিখ ৩০ জুন ১৯৯০।

সেদিন যুক্তরাজ্যে 'দ্য লেসবিঅ্যান অ্যাণ্ড গ্যে প্রাইড উইক' উদযাপন উপলক্ষে ঐ জমায়েতে সামিল হয়েছিল প্রায় ৩৪,০০০ লোক। ইওরোপে নাকি এই জাতীয় সমাবেশ এত বিশাল আকারে ঘটল এই প্রথম। পদযাত্রাটি ট্রাফালগার স্কোয়ার থেকে কেনসিংটন পার্ক অবধি প্রায় দু'মাইল পথ অতিক্রম করে। মিছিলটা ছিল সুসংগঠিত শান্তিপূর্ণ এবং তাতে ছিল বেশ উৎসবের মেজাজ। মিছিলের জনসমুদ্রের ওপর দেখা যাচ্ছিল নানারকম প্ল্যাকার্ড, কোনোটায় লেখা 'দ্য ব্ল্যাক লেসবিঅ্যান অ্যাণ্ড গ্যে সোসইটি' কোনোটায়, 'গ্যে প্রাইড উইক ১৯৯০' ইত্যাদি। একটা ব্যানার ছিল চোখে পড়ার মতো। ইংরেজী, উর্দু, হিন্দি ও গুজরাটিতে লেখা সেই ব্যানারটিতে উজ্জ্বল লাল রঙের ওপর রূপালী রঙে লেখা ছিল 'শক্তি'।

'শক্তি'র দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান

'শক্তি' ব্যানারটিকে ঘিরে যাচ্ছিল জনাকুড়ি শক্ত-সমর্থ লোক, ওদের সবার পরনে কুর্তা পায়জামা। একজনকে দেখলাম সালোয়ার কামিজ পরা। একজোড়া ছেলে আবার হাত ধরাধরি করে যেতে যেতে বেশ নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে মাঝে মাঝে পরস্পরকে চুমু খাচ্ছিল। জনৈক ক্যানাডিয়ান-এশিয়ান রিপোর্টার ওদেরকে অনুসরণ করছিল, ঐ দলটি সমবেতভাবে তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছিল, লক্ষ্য করলাম। 'শক্তি' নামক গোষ্ঠীটির অস্তিত্ব এই প্রথম প্রকাশিত হলো।

গোষ্ঠীটি লণ্ডনে বসে কাজ চালালেও সারা পৃথিবীর লোকের জন্য এর সদস্যপদ উন্মুক্ত। এটি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, দক্ষিণ এশিয়ান পুরুষ ও মহিলা সমকামীদের একটা ইউনিয়নের মত কতকটা। ওদের ভাষায় 'সাউথ এশিয়ান লেসবিঅ্যান অ্যাণ্ড গ্যে নেটওয়ার্ক,'। উদ্যোক্তাদের দাবী, যুক্তরাজ্যে ওদের সদস্যসংখ্যা ৬০০ আর ভারতে একশোরও বেশি। সদস্য হতে গেলে শর্ত হচ্ছে, পুরুষ বা মহিলা সকলকে সমকামী বা উৎকামী হতে হবে এবং জন্মসূত্রে ভারত, পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে কোনও ভাবে সম্পর্ক থাকতে হবে।

'শক্তি'র প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন শিবানন্দ খান, বন্ধু ও সঙ্গীরা ওঁকে 'শিবা' বলেই ডাকেন। ৪২ বছর বয়স, চমৎকার চেহারা। এশিয়ান এবং সমকামী বলে গর্ববোধ করেন। তিনি প্রথমদিকে 'শক্তি' কে এশিয়ান সমকামী পুরুষদের সামাজিকভাবে মেলামেশার একটা ফোরাম হিসেবেই গড়ে তুলেছিলেন। বর্তমানে সংস্থাটির উদ্দেশ্য ও কর্মপরিধি আরো ব্যাপক হয়েছে।

শিবা বলছিলেন আমাকে, 'এশিয়ান সম্প্রদায়দের ভেতর সমকামী পুরুষ ও মহিলাদের অস্তিত্ব বোঝাই যায় না। ওরা যতটা সম্ভব নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে চায়। মানসিক দিক থেকে কেউ কেউ শেষপর্যন্ত এমন বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে, ভাবে, এই 'রোগটা' বুঝি তার একারই। অনেকে আত্মহত্যা করে বসে। বার্মিংহামে ১৮ বছরের একটি পাকিস্তানী মুসলমান যুবক কিছুদিন আগে আত্মহত্যা করেছে একারণেই।'

শিবার বক্তব্য, যেসব 'লেসবিঅ্যান অ্যাণ্ড গ্যে সেন্টার'গুলি ইংল্যাণ্ডে বর্তমানে রয়েছে, প্রয়োজনের তুলনায় সেগুলি কম। মিশ্র বিবাহের ফলে এবং পাশ্চাত্য ধরনে বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েদের খুঁজে বের করতে হবে নিজেদের ভারতীয় পরিচয়। সমকামিতা কেবল পাশ্চাত্য কোনো ব্যাপার নয়, ভারতীয় সংস্কৃতিতে সমকামিতার একটা ইতিহাসগত পরম্পরা রয়েছে।

শিবার অজস্র ভক্ত ও সমর্থক রয়েছে, সেইসঙ্গে রয়েছে অনেক শত্রুও। প্রকাশ্যে বক্তব্য রাখার পর তিনি এপর্যন্ত পাঁচ পাঁচটা খুনের হুমকি পেয়েছেন। 'ব্রিটিশ এশিয়ানরা ভারতে বসবাসকারী ভারতীয়দের চেয়ে ২০ বছর পিছিয়ে আছে। বহু উদার এশিয়ান আছে, যারা পাশ্চাত্য সমকামী মনোভাবের শিকার, যা আবার একধরনের মোড়ল-মানসিকতার সঙ্গে যুক্ত, সেখানে পুরুষদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ অনুমোদিত নয়' শিবা বললেন আমায়।

শিবা নিজে মাত্র ন'বছর বয়সে নিজের যৌনতা সম্পর্কে সচেতন হন, ১৯ বছর বয়সে মাকে তিনি সব খুলে বলেন। ওর মা বৃদ্ধাশ্রমে নার্সের কাজ করতেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। জিগ্যেস করলাম, 'শিবা যখন আপনাকে সব জানাল, আপনি কী বললেন?'

সংগঠনের সদস্যরা, অন্তরঙ্গতায়

তিনি জবাব দিলেন, 'শিবা যা বলেছিল, তাতে আমি অবাক হইনি, মানসিক আঘাতও পাইনি। আসল কথা হচ্ছে, ও আমার ছেলে, আমার পরিবারেরই একটা অংশ। সে যে লুকোবার চেষ্টা না করে আমাকে সব খুলে বলেছিল, আমি তাতেই খুশি হয়েছিলাম।'

সবার ক্ষেত্রেই এরকম ঘটেনা। সব পরিবারেই তো এরকম সহমর্মীতা সহজলভ্য নয়। পরিহাসের পাত্র হয়ে ওঠার ভয়ে, সমাজে মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে বলে সেই ভয়ে অনেকে নিজেদের কথা প্রকাশই করে না। 'গ্যে বিরিভমেন্ট প্রোজেকট'—এর জনৈক সদস্য ডাডলি কেভ জানালেন, 'ব্রিটিশ এশিয়ান 'লেসবিঅ্যান' ও 'গ্যে'—রা সাধারণত দ্বৈত ভূমিকা পালন করে থাকে জীবনে। বিয়ে থা করে। গোপন রাখে নিজেদের চরিত্রকে। আমি বহু সমকামীদের জানি যারা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিকতার ভিত্তিতে সংসার করছে, তবে এখন পর্যন্ত কোনও এশিয়ানকে এতটা খোলাখুলি জীবনযাপন করতে দেখিনি।'

রোহনা দ্য সিলভা'র বয়স ২৬। নিজের সমকামী চরিত্রের কথা এখনো গোপন রাখতে চায়। ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধু ও বান্ধবীর কাছেই কেবল বলেছে এখনো পর্যন্ত। আপাতত রোহনা পশ্চিম লণ্ডনে মা ও ছোট ভাইয়ের সঙ্গেই থাকে। নিজের পরিবারের কাছে ব্যাপারটা প্রকাশ করার আগে সে নিজের একটা ফল্যাট নিয়ে আলাদা হতে চায়। বর্তমানে সে 'শক্তি'র 'এইচ আই ডি এইডস' শাখায় স্বেচ্ছাসেবী কো—চেয়ারপার্সন।

এদিকে, বেশ কিছু এশিয়ান ধীরে ধীরে জাতপাত, যৌনতা, সমকামী মনোভাব এসবের বন্ধন ছিন্ন করে একধরনের বেপরোয়া জীবনযাপনের দিকে এগিয়ে চলেছে। পৌলোমী দেশাই নামের মেয়েটির জন্ম যুক্তরাজ্যেই। সে আমাকে বলল, 'আমি নিজেকে লেসবিঅ্যান না বলে বরং বলব 'বাইসেক্সুয়াল'। আমি এখনো কুমারী। আমার জন্ম পাঙ্কদের যুগে, বাইসেক্সুয়াল হবার একটা ঝোঁক তো থাকবেই। যৌনতা সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে, আপনি যা করতে চান সেটাই স্বাভাবিক।'

পৌলোমী মনে করে, ব্রিটিশরা যে প্রাচ্য সম্পর্কে আগ্রহ বা দুর্বলতা দেখায় সেটা ওদের একধরনের সাম্প্রদায়িক মনোভাবেরই পরিচায়ক। 'শক্তি'র সঙ্গে যুক্ত থাকলেও পৌলোমী ব্যক্তিগতভাবে এধরনের সংস্থার প্রয়োজন বোধ করে না। তবে, এজাতীয় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বেশকিছু লোক উপকৃত হয়ে থাকেন। 'শক্তি'র সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ক্রমশ আত্মবিশ্বাস অর্জন করছেন, পারস্পরিক ভাব বিনিময়ে অভ্যস্ত হচ্ছেন, পৌলোমী জানালো।

'শক্তি'র সমর্থকরন্দ সম্প্রতি সংস্থার দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করলেন। ইংল্যাণ্ডের প্রতিটি প্রধান শহরে সংস্থার শাখা স্থাপন করে নিজেদের কাজকর্ম ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে কাজ শুরু হয়ে গেছে। এভাবে, সংস্থাটি ধীরে ধীরে একটি আন্তর্জাতিক চেহারার দিকে পা বাড়াতে চায়। ইতিমধ্যেই 'ট্রাইকন' এবং 'খুশ' নামের দুটি সমধর্মী মার্কিনী গোষ্ঠীর সঙ্গে এদের যোগাযোগ গড়ে উঠেছে। 'শক্তি—খবর' নাম দিয়ে একটি দ্বিমাসিক সংবাদপত্রিকাও বের করছেন এরা। জুন—জুলাই ১৯৯০ সংখ্যাটি আমার হাতে এল। খুব সুন্দর ছাপা—টাপা।
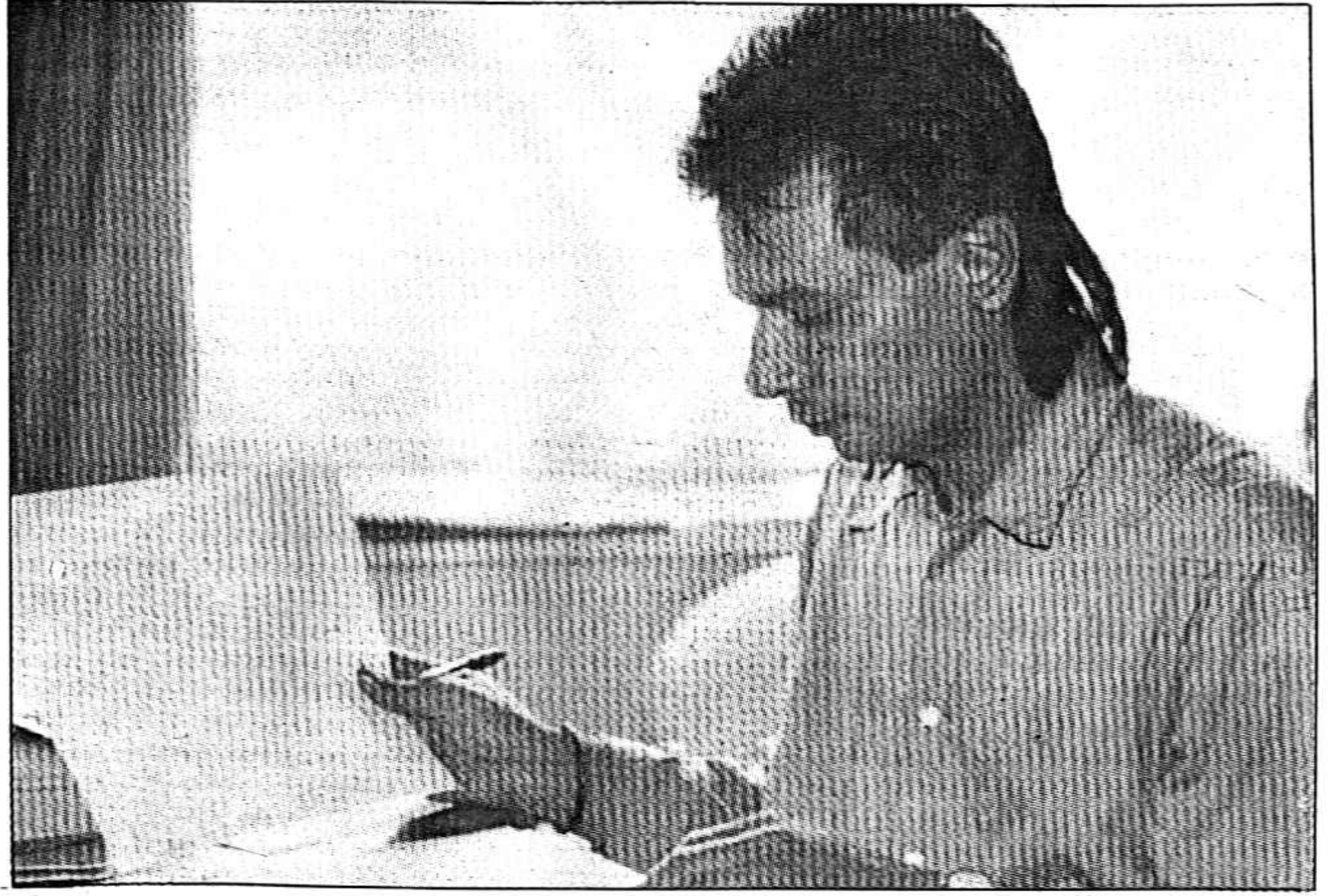
'শক্তি'র মুখ্য সংগঠক শিবানন্দ খান

পৌলোমী দেশাই নামের মেয়েটির জন্ম যুক্তরাজ্যেই। সে আমাকে বলল, 'আমি নিজেকে লেসবিঅ্যান না বলে বরং বলব 'বাইসেক্সুয়াল'। আমি এখনো কুমারী। আমার জন্ম পাঙ্কদের যুগে, বাইসেক্সুয়াল হবার একটা ঝোঁক তো থাকবেই।...'

ওতে রয়েছে নেটওয়ার্কের কার্যকলাপ বিষয়ে নানা খবর, পাঁচটি নিবন্ধ জাতীয় রচনা, সেগুলি ওঁদের নিজেদের সমস্যা ও অভিজ্ঞতার বিষয়েই লিখিত। ভারত থেকে 'অনিল' নামে জনৈক লেখকের লেখা নিবন্ধটির নাম, 'গ্যে লাইফ ইন ইণ্ডিয়া', 'শিবেন্দ্র' নামে আরেকজনও ভারত থেকে লিখেছেন, 'হোমোসেক্সসুয়ালিটি অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান ভিউ'। শিবেন্দ্র তাঁর লেখায় একস্থানে বলেছেন, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে সমকামীতার কথা স্বীকার করা হয়েছে। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' গ্রন্থে সমকামী ক্রিয়াকলাপের ওপর একটা গোটা অধ্যায়ই রয়েছে।

যাই হোক, এসব প্রচেষ্টার সবে শুরু। বিপরীত—যৌনকামী ব্রিটিশ সমাজ এবং এশিয়ান পরিবারগুলির কাঠামোয় ছন্নছাড়া ও সমকামী নারী পুরুষদের এখনো সমাজের কলঙ্ক হিসেবেই গণ্য করা হয়ে থাকে। 'শক্তি'র প্রতিষ্ঠার ফলে বোঝা গেল, সমকামী নারী পুরুষরা এবার প্রকাশ্যে আসতে চান, সমাজে স্বীকৃত হতে চান। তাঁরা নানাবিধ জটিল সমস্যা মেটাতেও পদক্ষেপ নিয়েছেন। যেমন, এশিয়ান নারী ও পুরুষ সমকামীদের মধ্যে 'বিয়ের' ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

৩০ জুনের জাতীয় পদযাত্রার দিনকয়েক আগে নিজেদের সংবাদ পত্রিকায় এঁরা একটি আবেদন প্রচার করেছিলেন, 'শক্তি' এই পদযাত্রার মাধ্যমে নিজেদের উপস্থিতি ও অস্তিত্বের পরিচয় দিতে চায়। তাই 'শক্তি'র ব্যানারের নিচে চিরাচরিত পোশাকে সজ্জিত হয়ে আসুন, সামিল হোন। আমাদের দেখাতে হবে যে এশিয়ান হিসেবে, পুরুষ বা নারী সমকামী হিসেবে আমরা গর্ববোধ করি।'

পায়েল খুরানা

ছবি : রাজ খুরানা

পু · ন · র্জ · ন্ম

যমজ দু'ভাইয়ের জন্মান্তর

আগের জন্মের ভীষ্ম

পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরের এখনো সাধারণ ঘটনাগুলি মানুষ ও পরামনোবিজ্ঞানীদের কাছে গভীর আগ্রহের বিষয়। বিস্ময়কর কিছু ঘটনা আজও ঘটে। তেমনই একটি বিচিত্র ঘটনার বর্ণনা।

এ জন্মের রাজু
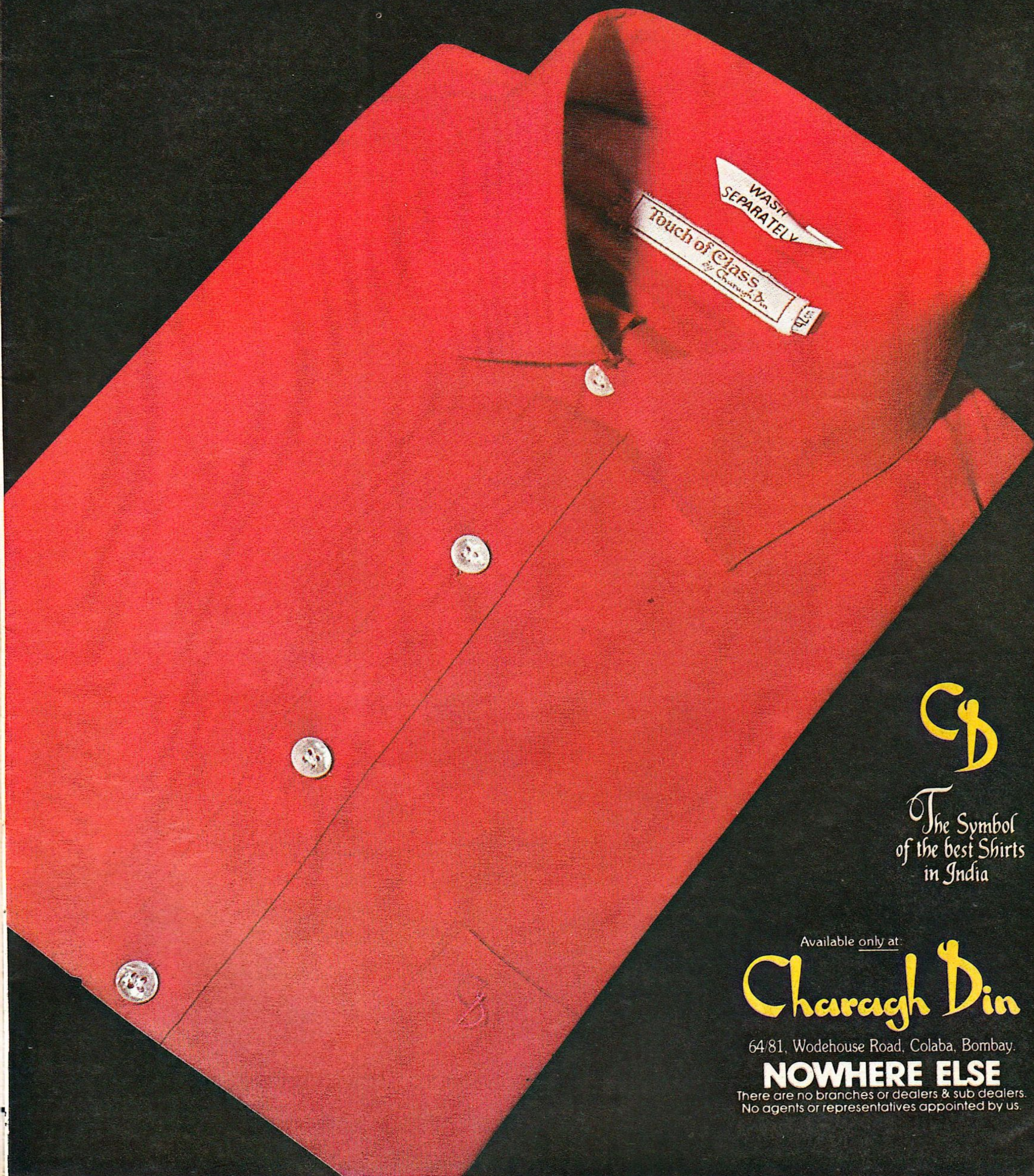
উত্তরপ্রদেশের কনৌজ থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে উত্তরপূর্ব রেলের শাখালাইনের একটি ছোট স্টেশন জশৌদা। এই স্টেশনের এক কিলোমিটার উত্তরে ছোট্ট গ্রাম শ্যামনগলা। এই গ্রামেই ১৯৬৪ সালের ৫ আগস্ট শ্রীমতী কপুরীদেবীর গর্ভে দুই যমজ পুত্রের জন্ম হয়। কপুরীদেবীর স্বামীর নাম পণ্ডিত রামস্বরূপ বর্মা। দুই ভাইকে সবাই রামু ও রাজু বলে ডাকতে থাকে। দুটি ছেলেরই কিছু অদ্ভুত জন্মচিহ্ন ছিল শরীরে। রামুর পেটে নাভির একটু উপর থেকে বুক পর্যন্ত পাঁচটা দাগ ছিল, আর রাজুর পেটে ছিল ওরকম দুটো দাগ।

ওদের যখন তিনবছর বয়স, ওরা বড়রাস্তার দিকে গিয়ে পড়েছিল। যে জিগ্যেস করছিল, তাকেই ওরা বলছিল, বাড়ি যাচ্ছি। কিন্তু কোন বাড়ি, সেটা তারা বলতে পারছিল না। কয়েকদিন পর গ্রামে একটা লোককে দেখে দুভাই তাকে প্রণাম করতে লাগল। কী ব্যাপার? দু'ভাই জানাল, তারা আসলে উচালাভপুর গ্রামের ভীম ও ভীষ্ম, এই লোকটা সেই গ্রামেরই একজন বয়স্ক ব্যক্তি। জশৌদা স্টেশন থেকে ১১ কিলোমিটার পশ্চিমে গুরসহায় গঞ্জ স্টেশন, সেখান থেকে উক্ত গ্রাম আরো তিন কিলোমিটার। জানা গেল, গতজন্মেও রামু ও রাজু যমজ দুভাই ছিল, ওদেরকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করা হয়েছিল।

আশ্চর্যের বিষয়, ভীম ভীষ্ম এবং রামু রাজুর জন্মতারিখও এক। খোঁজ নিয়ে দেখা গিয়েছে, উভয় জন্মেই ওদের আচার আচরণ ও অভ্যাসে অদ্ভুত সব মিল রয়েছে। একদিনের ঘটনা। বসন্ত পঞ্চমীর দিন শ্যামনগলা গ্রামের কাছে গঙ্গার কুসুমখোর ঘাটে চান করছেন উচালাভপুর গ্রামের চন্দ্রসেন তিওয়ারি। ডাঙায় উঠে আসতেই তিনি দেখলেন, দুটি ছোট ছোট বালক তাকে প্রণাম করল। তিনি জিগ্যেস করলেন, কে বাবা তোমরা?

ছেলে দুটি বলল, আমাদের চিনতে পারছেন না? আমি ভীষ্ম, আর এহল ভীম। আপনি তো চন্দ্রসেন?

ওরা আরো নানা কথা বলল। চন্দ্রসেন অবাক হয়ে গেলেন, এওকি সম্ভব? তার সেই দুই ভাই এরা! ছ'বছর হয়ে গেল ওরা তো মারা গেছে। ওদের কি পুনর্জন্ম হয়েছে তাহলে?

চন্দ্রসেনের বাবা ছিলেন কালীশংকর তিওয়ারি। ছয় সন্তান ছিল তাঁর। সবচেয়ে বড়টি মেয়ে, যমুনা। তারপর চন্দ্রসেন, চন্দ্রসেনের চেয়ে তিনবছরের ছোট দুটি যমজ ভাই ভীম ও ভীষ্ম, তারপর দুই মেয়ে রাণী ও উর্মিলা। ভীম ও ভীষ্মের মধ্যে খুব ভাব ছিল, ওদের স্বভাব চরিত্র, আচার আচরণও প্রায় একরকম ছিল।

বড় হওয়ার পর দেখা গেল ভীম বেশ হৃস্টপুস্ট হয়ে উঠছে, আর ভীষ্ম একটু রোগা পাতলা। মা বলতেন, ভীম বেশি বুদ্ধিমান। দাদা চন্দ্রসেনের মতে, না ভীষ্মরই বুদ্ধি বেশি। চন্দ্রসেন শান্ত প্রকৃতির ছিলেন, তুলনায় ভীম ও ভীষ্ম ছিল একটু উগ্র প্রকৃতির। সমস্ত অঞ্চলে দু'ভাইকে ভয় পেত সবাই। পুলিশ অনেকবার ধরেছে ওদের, কিন্তু স্বাক্ষী না পাওয়ায় ওদের বিরুদ্ধে কেস দাঁড়াতই না। দুভাই মারকুটে ছিল ঠিকই কিন্তু অপরাধী ছিল না।

১৯৫৫ সালে বাবা মারা যাবার পর পৈতৃক সম্পত্তি তিনভাগে ভাগ করে নিল তিন ভাই। এরপর ভীম ও ভীষ্মের বিয়েও হল। কালক্রমে ভীমের তিনটি ছেলে হয়, রামকিশোর, রাজকিশোর ও নেত্রকিশোর। ভীষ্মেরও একটি ছেলে জন্মায়, তার নাম রাখা হয় দ্রোণাচার্য। এসময় জমিজমা নিয়ে প্রতিবেশি রাজারামের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে ভীম ও ভীষ্ম। কিন্তু দাদা চন্দ্রসেনের অনুরোধে তারা মারপিট করা থেকে বিরত থাকে। রাজারাম অবশ্য সুযোগ খুঁজতে থাকে, প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা তার দৃঢ় হতে থাকে।

হঠাৎ একদিন একটি গরিব লোক ভীম ভীষ্মের কাছে এসে জানাল, পাশ্ববর্তী কুড়িয়াপুর গ্রামের এক ব্যক্তি তাকে কাজ করিয়ে নিয়ে দু'মাসের টাকা দিচ্ছে না। উল্টে গালিগালাজ দিচ্ছে। কুড়িয়াপুরেই ছিল রাজারামের বাড়ি। ভীম সঙ্গে সঙ্গে লোকটির সঙ্গে গেল সেই গ্রামে। অভিযুক্ত ব্যক্তিটি পরিষ্কার জানিয়ে দিল, সে কারো পরোয়া করে না। ভীমের হাতে ছিল বন্দুক। সে সোজা গুলি চালিয়ে দিল এবং লোকটার মৃতদেহ বস্তায় বেঁধে কুয়োয় ফেলে ফিরে এল বাড়িতে।

পুলিশ জানল সবই। কিন্তু ভীম বা ভীষ্মের বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দেবে কে? ওদের কিছুই হল না। মৃত ব্যক্তির ছেলে কিন্তু প্রতিজ্ঞা করল, পিতার হত্যার বদলা সে নেবেই। রাজারাম ছাড়াও আরেকজন শত্রু হল দু'ভাইয়ের। রাজারামের সঙ্গে ঝগড়ার ঘটনাটা তো ঐ অঞ্চলের সবাই জেনে গিয়েছিল। ছিবরামউ–এর প্রাক্তন এম এল এ গোপাল চতুর্বেদী ছিলেন আত্মীয়। গোপালবাবু দু'ভাইকে ডেকে বললেন, তোমরা আইন নিজের হাতে নিও না। দু'ভাই তাঁর কথা মেনে নিল।

ওদিকে ভীমের বন্দুকের গুলিতে মৃত ব্যক্তির ছেলে দুলারে তাদের গ্রাম প্রধানের কাছে গিয়ে আবেদন জানাল, আপনি ভীম ভীষ্মকে ডেকে পাঠান, আমি ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে নিতে চাই।

গ্রামপ্রধান সুবেদার সিংহও ভীমদের আত্মীয়।

তিনি গিয়ে ভীমদের বোঝালেন, এরকম ব্যাপার। চলো, মিটমাট করে নাও। ভীম ও ভীষ্ম অন্তরে কিন্তু ছিল সরল প্রকৃতির। ছলনা, কপটতা ওদের মধ্যে ছিল না। ওরা নিষ্পাপচিত্তে কথাটা স্বীকার করে নিল। ১৯৬৪ সালের ২৮ এপ্রিল তারিখে দুলারে ওদের বাড়িতে দু'ভাইকে রাত্রে নেমন্তন্ন করল। ভীম ভীষ্ম দু'জনেই প্রথমটায় যেতে চায়নি, কিন্তু দুলারে যখন লোক পাঠিয়ে ওদের ডেকে পাঠাল, ওরা দু'ভাই গেল শেষপর্যন্ত।

সেখানে লুকিয়ে ছিল রাজারাম, তার ছেলে জগন্নাথ, দুলারে এবং তার অন্য সঙ্গীসাথীরা। তারা নিরস্ত্র দু'ভাইকে কব্জায় পেয়ে ঘরের মধ্যে নির্মমভাবে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে, ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন করে ফেলল। এপর্যন্ত ঘটনাটা রামু ও রাজু চন্দ্রসেনকে গঙ্গার ঘাটে বসে বসে শোনাল। চন্দ্রসেনের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল, এরাই গতজন্মের ভীম ও ভীষ্ম। পরে কী হয়েছিল, চন্দ্রসেন ছেলেদুটিকে শোনালেন।

অনেকরাত অবধি ভীমেরা ফিরছে না দেখে দাদা চন্দ্রসেনের চিন্তা হল। তিনি কুড়িয়াপুর গ্রামে গিয়ে দুলারের বাড়িতে খোঁজ নিলেন। দুলারে জানাল, ওরা চলে গেছে। পঞ্চমদিন চন্দ্রসেন গুরসহায়গঞ্জ থানায় রির্পোট করলেন। ইতিমধ্যে একজন লোক খবর দিল গৌরীপুর জঙ্গলে একটি কুয়োর মধ্যে দুটো লাশ পড়ে আছে। সবাই দেখতে গেল। ও দুটো ভীম আর ভীষ্মেরই ছিল।

রামু ও রাজু গঙ্গার ঘাট থেকে চন্দ্রসেনকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের বাড়িতে গেল। ওদের বাবা রামস্বরূপ সব শুনলেন। তিনি চন্দ্রসেনকে রাতটা থেকে যেতে অনুরোধ করলেন। তারপর সকলে মিলে শ্যামনগলা গ্রামে এলেন। বোন উর্মিলাও খবর পেয়ে উপস্থিত। প্রায় সকলকেই চিনতে পারল ছেলেদুটি। ভীম ও ভীষ্মের ছেলেরাও এল তাদের জন্মান্তরিত বাবাদের দেখতে। সবাই এমন কিছু প্রশ্ন রামু ও রাজুকে করছিল যাতে প্রমাণিত হয় যে তারাই গতজন্মের ভীম ও ভীষ্ম। মোটামুটিভাবে সব প্রশ্নেরই ঠিকঠাক উত্তর তারা দিয়ে যাচ্ছিল।

ঘটনাটার কথা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। শতশত লোক দেখতে আসছিল ছেলেদুটিকে। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, ওদের পূর্বজন্মের হত্যাকারীরাও একদিন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল। সমবেত লোকদের প্রতিরোধে তারা পালিয়ে যায়। চন্দ্রসেনের মাথায় কিন্তু অন্য পরিকল্পনা ছিল। সাক্ষীর অভাবে ভীম ও ভীষ্মের হত্যাকারীরা ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল। চন্দ্রসেন চাইছিলেন, রামু রাজুর সাহায্যে কেসটা আবার শুরু করতে। কিন্তু ওদের বাবা রামস্বরূপ অন্যের বিবাদে জড়াতে চাইছিলেন না।

এই জন্মান্তরের ঘটনাটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁদের মধ্যে আমেরিকার ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরামনোবিজ্ঞানী ডঃ ইয়ান স্টিভেনসন অন্যতম। তিনি এই বিচিত্র ঘটনাটি সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে এলাহাবাদের আরেক গবেষক ডঃ মেহরোত্রাকে ঘটনাস্থলে পাঠান। ডঃ মেহরোত্রা দীর্ঘ অনুসন্ধান চালিয়ে জন্মান্তরের এই ঘটনাটি সম্পর্কে নিজের সদর্থক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

আলোকপাতের প্রতিবেদক কিছুদিন আগে রামু রাজুর খবর নিতে শ্যামনগলা গ্রামে গিয়েছিলেন। রামুর ভালো নাম রামনারায়ণ দ্বিবেদী, রাজুর শেষনারায়ণ। রাজু বর্তমানে বেনারসের চেতনগঞ্জ থানায় পুলিশের চাকরি করছেন আর রামু বি এ পাশ করে চাকরি খুঁজছেন।

প্রতিবেদকের আগ্রহে রামু তাঁকে সঙ্গে নিয়ে উচালাভপুর গ্রামে গেলেন। অবাক বিস্ময়ে প্রতিবেদক লক্ষ্য করলেন, পূর্বজন্মের মা ওকে জড়িয়ে ধরছেন, পূর্বজন্মের ছেলে দ্রোণাচার্য প্রণাম করছে। চন্দ্রসেন ক্ষেত থেকে ছুটে এলেন। ভীমের বিধবা স্ত্রী সুশীলা পর্দার আড়াল থেকে স্বামীর এজন্মের রূপ দেখার চেষ্টা করছে। এ কি মায়া!

রামু ও রাজুর বুকের দাগগুলিও আশ্চর্যের। ডঃ স্টিভেনসনের কাছে অন্তত ২০০টি এরকম কেস আছে যেসব ক্ষেত্রে গতজন্মের ক্ষতস্থানের দাগ পরবর্তী জন্মেও থেকে যায়। এদের জন্মচিহ্নগুলি সম্ভবত লাঠি ও ছুরির গভীর দাগগুলিকে স্মরণ করায়। ওদের জন্ম তারিখ এক হওয়াটাও বিস্ময়ের।

তবে জন্মান্তরের ব্যাপারে আজও নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব হয়নি। কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ, গ্রহণযোগ্য তথ্য বা নিশ্ছিদ্র যুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়নি। কোনো ক্ষেত্রেই। কিছু কিছু ঘটনা বাস্তবিকই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। পরামনো-বিজ্ঞানীরা এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

আর্যভূষণ ও ঋষি চৌহান

ছবি: রাজেন্দ্র কুমার
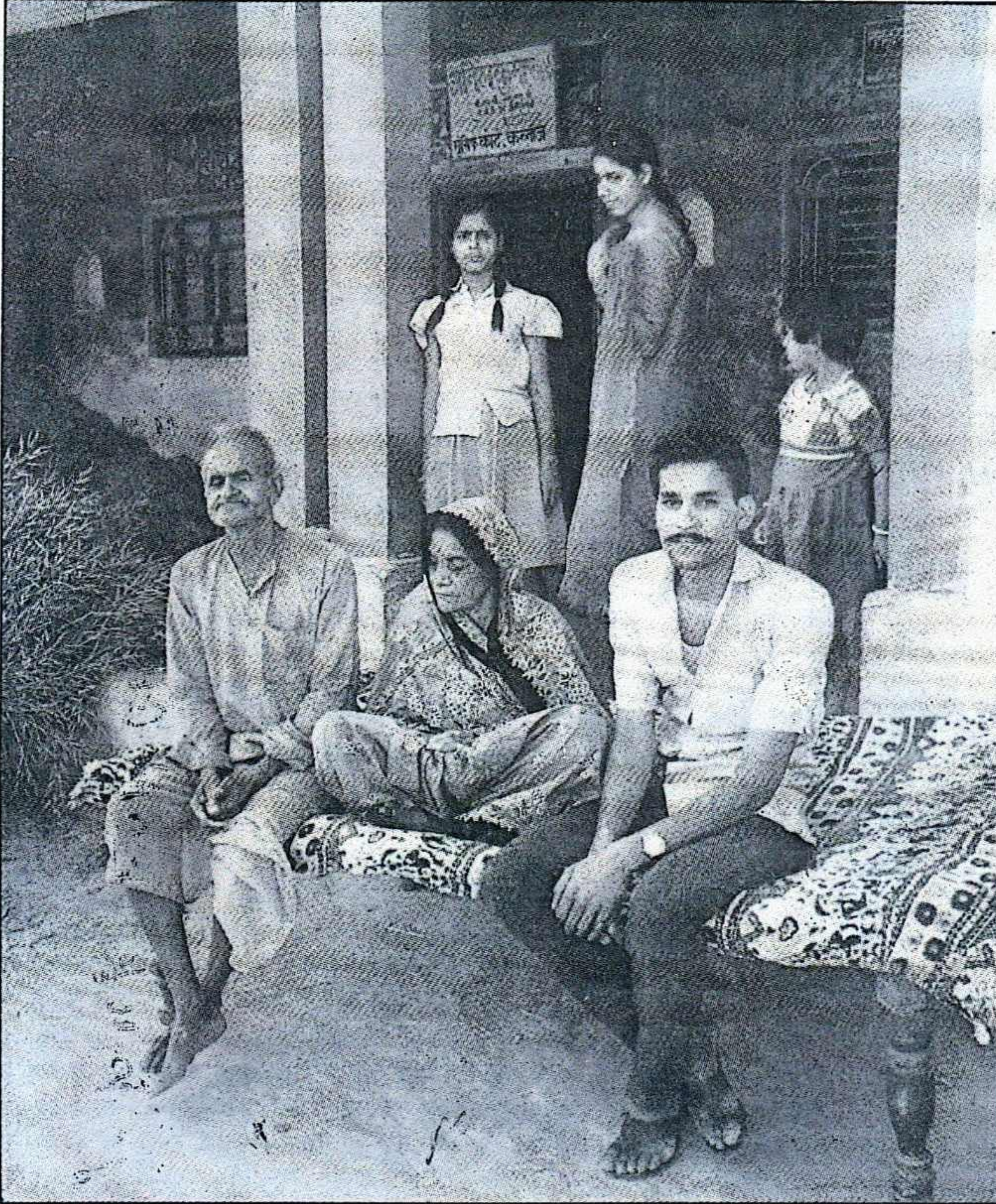
মা বাবার সঙ্গে রামনারায়ণ ওরফে রামু

বিয়ের আসরে: বীথিকা, সুবীর

বীথিকা চৌধুরীর মৃত্যু দুর্গাপুর হলদিয়ায় ঝড় তুলেছে

হলদিয়া ফার্টিলাইজারের কর্মী সুবীর চৌধুরীর স্ত্রী বীথিকাদেবীর অস্বাভাবিক মৃত্যু এবং কোক ওভেন থানার পুলিশি তৎপরতা দুর্গাপুর এবং হলদিয়া এই দুই শিল্পশহরে সন্দেহের ঝড় তুলেছে। এই প্রতিবেদন, সেই রহস্যময় মৃত্যুর প্রেক্ষাপটকে ঘিরে এক সত্যানুসন্ধানী তদন্ত রিপোর্ট।

গোটা ব্যাপারটার জন্য কেউই তেমন প্রস্তুত ছিল না। আগস্টের প্রথম সপ্তাহ। শিল্পনগরী দুর্গাপুরের সর্বত্রই মেঘ রৌদ্রের খেলা। মাঝে মাঝে ঝমঝমে বৃষ্টি, আবার মেঘ কেটে গিয়ে নীল আকাশ। রোদের আলোয় ভেসে যাচ্ছিল দুর্গাপুর।

ছবির মত সাজানো এই দুর্গাপুর শহর খুবই ঝকঝকে, পরিষ্কার। সব কিছুই প্ল্যান মাফিক। স্টীল প্ল্যান্ট থেকে শহর বেশ দূরে। প্রায় ন'মাইলের মত দূরত্ব। শহরের পাশে নোটিফায়েড এলাকা। নোটিফায়েড এলাকারই অঞ্চল গোপীনাথপুর। পাশে সগড়ডাঙা।

আগস্টের ন'তারিখে গোপীনাথপুর এলাকার চৌধুরী বাড়ির গৃহবধূ বীথিকা রায়চৌধুরীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে তামাম অঞ্চলে হঠাৎ রীতিমত সাড়া পড়ে গেল।

ন'তারিখের বেলা একটা। বীথিকার বাপের বাড়ি তখনও জানত না তাদের মেয়ে পৃথিবীতে আর নেই। বেলা একটা নাগাদ বীথিকার ননদ এসে দরজায় কড়া নাড়তে বীথিকার ছোট বোন মিতা এসে দরজা খুলে দিল। এই অবেলায় বীথিকার বিবাহিতা ননদ নমিতাকে দেখে একটু ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল বীথিকার বোন। নমিতা ঘরে ঢুকেই বলে ওঠে, তোমার দিদি বাথরুম থেকে পড়ে গিয়েছে। ওর খুবই সিরিয়াস কন্ডিশন। বলতে বলতেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে নমিতা। দূরে দাঁড় করানো ট্যাক্সিতে চেপে বেরিয়ে যায় নমিতা। বীথিকার বাড়িতে বোন ছাড়া ছিলেন বৃদ্ধা মা, দাদা কল্লোল। ছোট মেয়ের মুখে বীথিকার কথা শুনে কি রকম দিশেহারা হয়ে পড়েন মা। তড়িঘড়ি করে বৃদ্ধা মাকে নিয়ে বীথিকার ছোট বোন বেরিয়ে পড়ল বাইরে। গোপীনাথপুরে বীথিকার শ্বশুরবাড়ি যখন পৌঁছল তখন বেলা চড়ে গেছে। শ্বশুরবাড়িতে ঢোকার আগেই অদ্ভুত এক আশংকায় ভরে উঠল মন। এমন তো কোনদিন হয় নি।

চৌধুরী বাড়ি থমথমে। বীথিকা তখনও বাথরুমে পড়ে আছে। ঝড়ের গতিতে বাথরুমে ঢুকে আর্তনাদ করে উঠল ছোট বোন মিতা। দেখল, বাথরুমে দিদির নিষ্প্রাণ দেহ পড়ে আছে। তারপর আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল মিতা। মাকে জড়িয়ে বলতে লাগল, মা গো···এ কি হল––

বিকাল সাড়ে তিনটে নাগাদ স্থানীয় কোক ওভেন থানা থেকে পুলিশ এসে মৃতদেহ পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠায়। কল্লোল ঘোষ বোনের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত চেয়ে থানায় এফ আই আর করেন (নং ৮৫ ৯০ তারিখ ৯·৮·৯০)। পুলিশ বীথিকার শ্বশুর কমলাপদ চৌধুরী, শাশুড়ি অনিমা চৌধুরী এবং পরে রাত্রি আটটায় দুর্গাপুর স্টেশন থেকে দেওর সিদ্ধার্থ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে। স্বামী সুবীর চৌধুরী কর্মক্ষেত্রে থাকায় তাকে গ্রেপ্তার করা যায় নি। পরে সুবীর চৌধুরী কলকাতা হাইকোর্ট থেকে জামিন (অগ্রিম) নিয়ে নেওয়ায় পুলিশ তাকে আজও গ্রেপ্তার করতে পারে নি। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ এ ৩০৪ বি ধারা অনুযায়ী একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

একজন নিরীহ গৃহবধূ বীথিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুকে নিয়ে গোপীনাথপুরে রীতিমত চাঞ্চল্য পড়ে গেল। মৃত্যুর আগের দিনও বীথিকার কিংবা চৌধুরী পরিবারের কাউকে দেখে আঁচ করা যায়নি যে এ ধরনের ঘটনা ঘটে যেতে পারে। বাপের বাড়ি অরবিন্দ এভিন্যুয়ে কিংবা শ্বশুরবাড়ি গোপীনাথপুরে নম্র শান্ত মেয়ে হিসেবে বীথিকার সর্বজন পরিচিতি ছিল। যাদের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল তারা বীথিকাকে ভালই বাসতেন। কিন্তু সেই বীথিকাকে শেষপর্যন্ত এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হল একেবারে আচম্বিতে। যা ছিল সকলেরই অপ্রত্যাশিত।

১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারি ৪৭ অরবিন্দ এভিন্যু–এর (এ জোন) বাসিন্দা শ্রী কল্লোল ঘোষের মেজ বোন বীথিকা ঘোষের (বিয়ের পর চৌধুরী) সাথে গোপীনাথপুর নিবাসী কমলাপদ চৌধুরীর বড় ছেলে সুবীরচন্দ্র চৌধুরীর সামাজিক রীতি অনুযায়ী বিয়ে হয়। বিয়েতে যৌতুক হিসাবে মেয়েপক্ষ থেকে সাধ্যমত (ছেলে পক্ষের দাবী অনুযায়ী) দেওয়া হয়েছিল। দশ ভরি সোনা, দশ হাজার টাকা নগদ সহ অন্যান্য সামগ্রী দেওয়ায় সে

সময় পাত্র পক্ষেরও আর কোন দাবীদাওয়া ছিল না। বীথিকাও শ্বশুরবাড়িতে এসে ঘর সংসার করতে শুরু করে।

কিন্তু দু বছর ছ'মাস অতিক্রম করতেই বীথিকার জীবনে নেমে এল চরম বিপর্যয়। পঁচিশ বছরের বীথিকা চৌধুরীকে জীবনের মায়া ত্যাগ করতে হল। প্রশ্ন এখানেই—কি এমন ঘটল যার জন্য বীথিকাকে জীবনের মায়া ত্যাগ করতে হল? আর জীবনের মায়া ত্যাগ করতে হল, না ত্যাগ করতে তাকে বাধ্য করা হল? বীথিকা-বাপের বাড়ির মতানুযায়ী বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই শাশুড়ি ননদেরা বিয়েতে দেওয়া যৌতুক সামগ্রী নিয়ে খোঁটা দিত। অত্যন্ত শান্ত ও চাপা স্বভাবের বীথিকা কোনদিনই তা বাপের বাড়িতে মুখ ফুটে বলত না। পাছে মা-দাদা বোনেরা শুনে কষ্ট পান সেইজন্য সমস্ত রকম মানসিক নির্যাতন ও অত্যাচার নীরবে সহ্য করত। কিন্তু বীথিকা মুখ ফুটে না বললেও তাঁর মা-দাদা বোনেদের কিছুই অজানা ছিল না।

বিয়ের কয়েকমাস পরে স্বামী সুবীর চৌধুরী বীথিকাকে তাঁর কর্মস্থল হলদিয়ায় নিয়ে যান। সুবীরবাবু হলদিয়া ফার্টিলাইজারের কর্মী। তিনি স্ত্রী বীথিকাকে তাঁর কোম্পানির টাউনশিপ-এর কোয়ার্টারে (কোয়ার্টার নাম্বার ২৮৬; সেক্টর–১৩ এইচ এফ সি টাউনশিপ; হলদিয়া ৭২১৬০৭)

চৌধুরী পরিবারের সকলেই সমস্ত জায়গায় এ মৃত্যুকে নিছক আত্মহত্যা বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন কিন্তু তাদের এই বক্তব্য সংশ্লিষ্ট কেউই মন প্রাণ দিয়ে মেনে নিতে পারছেন না।

থানায় কল্লোল ঘোষের অভিযোগপত্র

পুলিশের প্রথম অনুসন্ধান-রিপোর্ট

কিছুদিন রাখেন। এই হলদিয়া যাওয়াকে কেন্দ্র করে বাড়িতে একপ্রস্থ অশান্তির ঝড় বয়ে যায়। এই চরম অশান্তিতে স্বামী মা-ভাইয়ের পক্ষ নিলে অসহায় বীথিকা প্রথমে গোপীনাথপুর এবং কয়েকদিন পরে বাপের বাড়িতে চলে যায়। কিছুদিন পরে মা-দাদা অনেক বুঝিয়ে পুনরায় তাঁকে শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দেন।

১৯৮৯ সালের শেষার্ধে সন্তান সম্ভবা বীথিকার প্রতি কোনরকম মায়া-দয়া না দেখিয়ে শ্বশুর শাশুড়ি দেওর ননদেরা নির্মম ভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতে থাকেন। গত জানুয়ারি মাসে বীথিকা একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়। মৃত্যুর মাত্র ৮ দিন আগে ১ আগস্ট সেই শিশু কন্যাটির অন্নপ্রাশনকে কেন্দ্র করে বাড়িতে কিছুটা অশান্তি হয় মামার বাড়ি থেকে (শিশু কন্যার) জিনিসপত্র না আসায়। পরে অবশ্য সমস্ত জিনিসই এসেছে ৪৭ অরবিন্দ এভিন্যু থেকে এবং সেদিনের মত ঝামেলা মিটে যায়।

বীথিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুর পরেই চৌধুরী বাড়ি প্রচার করতে থাকে সে আত্মহত্যা করেছে। তবে এর কোন যথাযথ কারণ তারা দর্শাতে পারেন নি। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ বীথিকা চৌধুরীর মৃত্যু অস্বাভাবিক। হয়ত বা তাকে সুপরিকল্পিত ভাবে খুন করা হয়েছে। যদিও কেউই এ ব্যাপারে বিশদভাবে মুখ খুলতে চাইছেন না। কারণ স্থানীয় রাজনৈতিক দাদাদের প্রকোপ, মৃতা বীথিকা চৌধুরীর দেওর এলাকার প্রভাবশালী সিদ্ধার্থ চৌধুরীর বিরাগভাজন হওয়া। সর্বোপরি রয়েছে পুলিশের ভয়।

চৌধুরী পরিবারের সকলেই সমস্ত জায়গায় এ মৃত্যুকে নিছক আত্মহত্যা বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন কিন্তু তাদের এই বক্তব্য সংশ্লিষ্ট কেউই মন প্রাণ দিয়ে মেনে নিতে পারছেন না। তাদের প্রশ্ন, মাত্র ক'বছরের জীবনে কি এমন ঘটেছিল যার ফলে শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী বীথিকাকে আত্মহত্যা করতে হল! তাছাড়া আত্মহত্যা করলে শিক্ষিতা বীথিকা নিশ্চয় কোন সুইসাইডাল নোট রেখে যেত। (যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে বা দেখা যায়)। বাস্তবে সে রকম কোন নোট পাওয়া যায় নি। প্রশ্ন উঠেছে, কাউকে দোষী করে সুইসাইডাল নোট রেখে যাওয়ায় শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই তা সরিয়ে ফেলেছেন? দাদা কল্লোল ঘোষের করা এফ আই আর–এর বয়ান অনুযায়ী শ্বশুরবাড়ির লোকজন-দের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে (দৈহিক ও মানসিক) বীথিকা আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু সত্যিই আত্মহত্যা করেছে? স্থানীয় জনসাধারণের মতে বীথিকাকে সু-পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অনেক কথা বললেও এই প্রতিবেদকের পরিচয় পেয়ে মুখে একেবারে কুলুপ এঁটে দেন। তাঁরা বলেন কাগজে বের হলেই থানা–পুলিশ। কোর্টে তাঁদেরকে নিয়ে টানা হেঁচড়া শুরু হবে; আর শুধু শত্রু বাড়বে। তবে তাঁদের
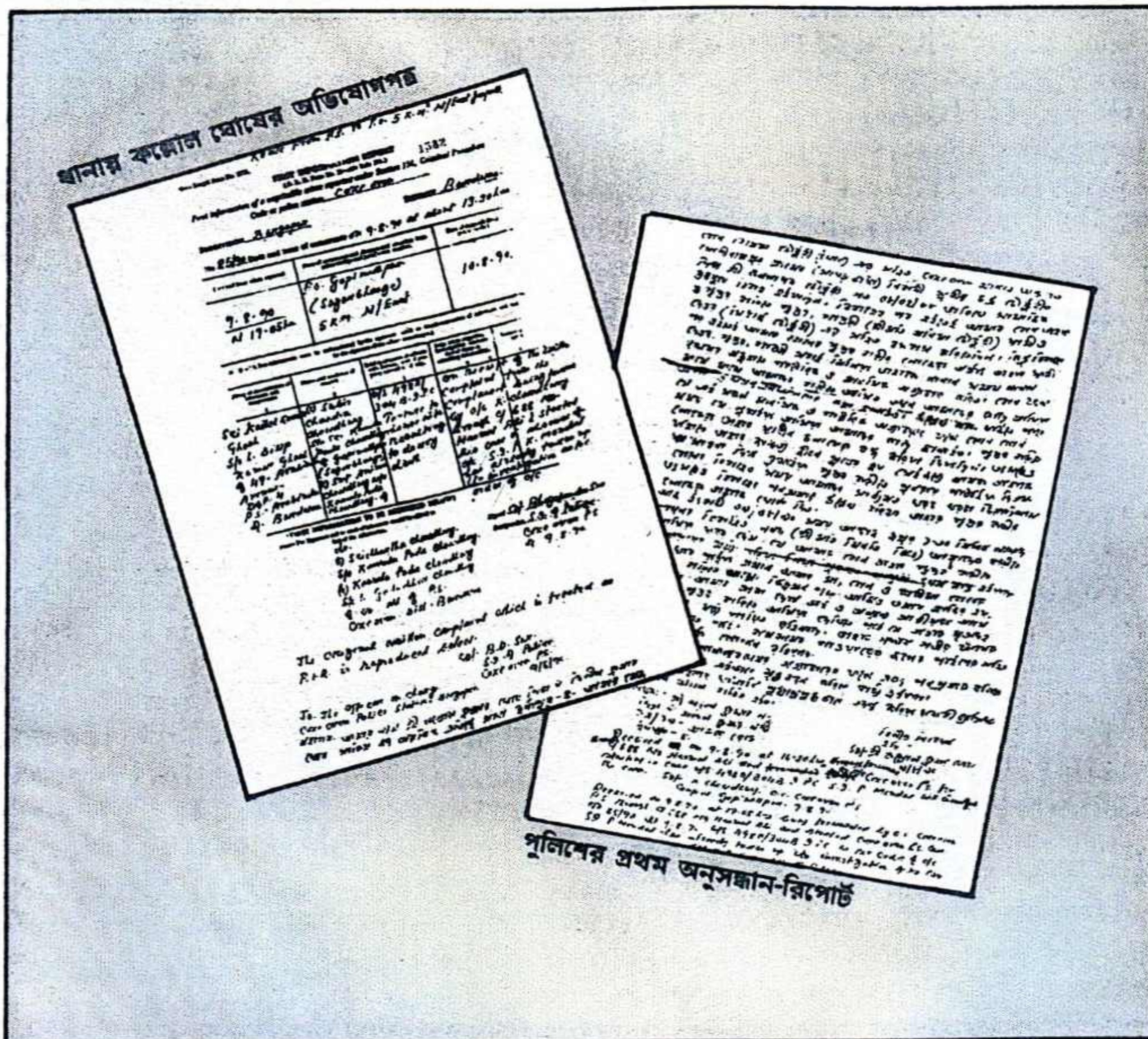
মতে––বীথিকার মত শান্ত–নম্র বউ পাড়ায় একটিও নেই। তাঁদের অনেকের–ই প্রশ্ন বীথিকা বেলা দশটা থেকে বাথরুমে ঢুকলেও (স্নানের জন্য, বাড়ির লোকের মতানুযায়ী) সাড়ে এগারটা পর্যন্ত কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে দরজা ভেঙে ঢোকেন শাশুড়ি, ননদ, ঝি তুলসী ও পাশের এক ভদ্রমহিলা এবং তাঁরা ঢুকে দেখতে পান সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় বীথিকা শাওয়ারের পাইপে গামছা ঝুলিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ঝি-তুলসীর মতানুযায়ী তখন বীথিকার একটি পা-ভাঁজ করা (মোড়া) অবস্থায় ছিল! মা (শাশুড়ি) ও ননদের মতানুযায়ী––তখনও বেঁচে আছে ভেবে গামছা কেটে তাঁরা বীথিকার দেহটি নামান। (ঝি-য়ের মতে নগ্ন থাকার দরুন–ই নামানো হয় ও দেহে কাপড় জড়িয়ে দেওয়া হয়)। সন্দিহান হওয়ার প্রশ্ন এখানেই–শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যখন দেখলেন, তাঁদের বৌমা আত্মহত্যা করেছে তখন গামছা কেটে নামালেন কেন? তাঁদের মতানুযায়ী যদি দেহে প্রাণের স্পন্দন থাকার সম্ভাবনার কথা ভেবেই দেহ নামানো হয়ে থাকে––তবে বীথিকার দেহ বাথরুমেই ফেলে রাখা হল কেন? এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা বা নিকটস্থ কোন ডাক্তারকে ডেকে আনার ব্যবস্থাই বা করা হল না কেন?

এছাড়া এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আরও অনেক প্রশ্নই দেখা দিয়েছে। যেমন––

(১) বীথিকা যদি আত্মহত্যা–ই করে থাকে, তবে কেন ননদ নমিতা মিত্র, বীথিকার বাপের বাড়িতে গিয়ে বলে আসে যে–বীথিকা বাথরুমে পড়ে গিয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে!

(২) যদি অসুস্থ হওয়ার খবর–ই দিতে যেতে হয়, তবে কেন বাড়ি থেকে দূরে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে পায়ে হেঁটে খবর দেয় মিনতি মিত্র?

(৩) কোন যুবতী নারী (সুস্থ মস্তিষ্কে) কোনদিন কি নগ্ন হয়ে আত্মহত্যা করতে পারে? বিশেষত যেখানে সে গৃহবধূ।

(৪) ছ'মাসের শিশুকন্যাকে রেখে কোন মায়ের পক্ষে কোনদিন আত্মহত্যা করা কি সম্ভব? অত্যাচারিতা হয়ে সেই মা আত্মজ শিশুকে নিয়ে ঘর ছাড়তে পারে, কিন্তু আত্মহত্যা অসম্ভব!

(৫) দরজা ভেঙে বাথরুমে ঢুকে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যখন দেখল তাদের বৌমা গলায় গামছা দিয়ে ঝুলছে, তখন পুলিশকে সর্বাগ্রে খবর না দিয়ে নিজেরা নামাতে গেল কেন?

(৬) মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের মতানুযায়ী কোন বিবাহিতা হিন্দু নারী (যুবতী) আত্মহত্যা করার পূর্বে হিন্দু নারীর চিরন্তন দুর্বলতা হেতু আলতা––সিন্দুরে নিজেকে সজ্জিত করে। কিন্তু বীথিকার ক্ষেত্রে সেরকম কিছুই দেখা যায় নি!

(৭) ঝি-তুলসীর বক্তব্য অনুসারে মৃত্যুর আগের দিন ইতুর (বীথিকার ডাকনাম) পরনে ছিল একটি ছাপা শাড়ি। কিন্তু বাথরুমে স্নান করতে গেলে সেই ছাপা শাড়িটিই বাথরুমে থাকার কথা এবং দরজা ভেঙে নগ্নঅবস্থায় দেখে সামনে পাওয়া সেই কাপড়টি-ই ইতুদেবীর দেহে জড়িয়ে দেওয়ার বাস্তবতা প্রবল। কিন্তু বীথিকার দেহে জড়ানো ছিল কাল পাড়ের লালাভ-গোলাপী রংয়ের একটি ভিজে শাড়ি? অন্য ঘর থেকে ওই শাড়িটি আনা হলেও তা শুকনো থাকার কথা। কিন্তু তা ছিল না; শাড়িটি ছিল ভিজে!

(৮) ঘটনা যদি আত্মহত্যারই হয়ে থাকে, তবে বীথিকার পিঠে, কাঁধে ও শরীরের অন্যান্য জায়গায় গভীর আঘাতের চিহ্নগুলি কিসের?

(৯) ঝি-তুলসীর বক্তব্য অনুসারে দরজা ভেঙে দেখা যায় বীথিকা গলায় গামছা দিয়ে নগ্ন অবস্থায় ঝুলছে এবং তার একটি পা ভাঁজ করা অবস্থায়। প্রশ্ন––একটি পা ভাঁজ করা অবস্থায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা কি সম্ভব?

(১০) এ সমস্ত গোঁজামিলে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা হয় নি তো?

(১১) স্থানীয় এলাকার 'হুইসপারিং' যে ঘটনার দিন বেলা পৌনে দশটা নাগাদ বীথিকার ননদ নমিতা মিত্রের স্বামী দিলীপ মিত্রকে ওই বাড়ি থেকে বের হতে দেখা গেছে। এটা যদি সত্যি তবে ঘটনা যে জটিল তা এক নিঃশ্বাসে বলা যায়। (তদন্তে জানা গেছে দিলীপ মিত্রের চরিত্র জটিল ও নানা দোষে ভরা।)

(১২) আত্মহত্যা করলে বাথরুমে কেন? আরও তো ফাঁকা ঘর ছিল এবং বাড়িতে যখন মানুষের সংখ্যাও নিতান্ত কম! তাছাড়া বাথরুমের শাওয়ারের পাইপে আত্মহত্যা (গলায় গামছা ঝুলিয়ে) করা কি সম্ভব?

(১৩) বাথরুমের দরজা ভাঙার কথা বললেও (বাড়ির লোকেরা) পুলিশের মতানুযায়ী দরজা ভাঙার কোন চিহ্ন নেই, শুধুমাত্র ভিতরের দিকের ছিট্‌কানিটি কিছুটা বাঁকানো। সেটা প্ল্যানমাফিক আগে ভাগে করে রাখাটাও কোন অস্বাভাবিক নয়, বলে মনে হয় না কি?

(১৪) মৃত্যুর তিনদিন আগে স্বামী বাড়ি থেকে কর্মক্ষেত্রে চলে যান নির্বিবাদে। এরপরেই এই মৃত্যু। স্বামী সুবীর চৌধুরী কি কিছুই জানতেন না? নাকি বড়ছেলেকে বিপদমুক্ত করার জন্য আগেভাগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল?

(১৫) যুক্তিবাদী মানুষের প্রশ্ন––মৃত্যু কি আগে ঘটিয়ে পরে বাথরুমে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল? (ফরেনসিক্ রিপোর্ট তার উত্তর দেবে নিশ্চয়ই)।

আত্মহত্যা বা সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা যাইহোক না কেন––ঘটনার পঁচিশ দিন পরেও পুলিশের হাতে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট ও ফরেনসিক বা ভিসেরা রিপোর্ট এসে পৌঁছোয় নি! পুলিশ দিলীপ মিত্র ও ঝি তুলসীকে জেরা করে ছেড়ে দিলেও কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ–ই ওই দুজনের দিক হতে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারে না। কারণ ঝি সকাল-দুপুর ও বিকালে কাজ করতে এলেও (দীর্ঘ চার বছর ধরে ওই নিয়মেই করে আসছে) ঘটনার দিন বেলা ন'টা থেকে সারাদিনই ছিল––কেন? এই প্রতিবেদক পুলিশের কাছে তিনবার গেলেও পুলিশ নানা ব্যস্ততার অছিলায় এই প্রতিবেদক-কে ফিরিয়ে দিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও বীথিকাদেবীর বাপের বাড়ির লোকের সন্দেহ হচ্ছে যে রাজনৈতিক–দাদা ও বাঁ-হাতের ধুন্ধুমার খেলায় এসব চাপা দেওয়ার কোন কারসাজি চলছে না তো? তবে স্থানীয় অধিবাসী ও ঘোষ পরিবারের অভিযোগ পুলিশ স্বেচ্ছায় গাফিলতি করছে; তাঁদের ইচ্ছা পুলিশকে দিয়ে নয়––সি আই ডি-কে দিয়ে ঘটনার তদন্ত করালেই বীথিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটিত হবে।

সুব্রতরঞ্জন সাঁই

'তাই বলি শনিবারে
মদ গৃহ গড়পারে
দেন যদি পদধূলি
ক্লাবটারে ঠেলে তুলি।'

বুধসন্ধ্যা
শহর কলকাতায় উজ্জ্বল সন্ধ্যাগুলি

'বুধসন্ধ্যা'র সম্মেলনে শিল্পীসাহিত্যিকেরা

কবি ও সাহিত্যিক সুকুমার রায় প্রমুখদের সময়ে তাঁরা নিজের হাতে গড়েছিলেন একটি ক্লাব। কবি শিল্পী লেখকদের এই আড্ডায় কেউ আমন্ত্রণ পেলে সেই কার্ডে লেখা থাকত ওই কবিতাটি। এই রকম দু'তিনটি মর্যাদাময় আড্ডা কলকাতায় বিভিন্ন সময়েই ছিল। কিন্তু কবি লেখকদের আড্ডা দেওয়ার সেই রেওয়াজটা পঞ্চাশের দশকের শেষের দিক থেকে ধীরে ধীরে চলেই গেল। আগেকার দিনে কোন জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় তারই দালান বাড়িতে বা কোন পত্র পত্রিকার অফিসে এই আড্ডার চল ছিল। বাবু কলকাতায় বিশিষ্ট সব বাবুদের কারো কারো বাড়িতে সংস্কৃতি চর্চার নামে কখনো কখনো বসত বৈঠকি সাহিত্য-দরবার। ইতিহাসে তারও উদাহরণ বুঝি খুব বেশি নেই। কিন্তু কালে কালে সে সবই চলে গেল। ৮০'র দশকে পৌঁছে কলকাতার সাংস্কৃতিক দুনিয়া অনুভব করল লেখক শিল্পীরা যে মনের মত আড্ডায় বসবেন, তেমন কোন সুব্যবস্থা নেই। অথচ আমেরিকা বা আরো অনেক দেশে আছে 'পোয়েট্রি সোসাইটি' এবং তা খুবই বিখ্যাত। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রত্যেকটাতেই আছে রাইটার্স ইউনিয়ন। এমন কি আমাদের রাজধানী দিল্লিতেও আছে 'অথরস্ গিল্ড'। কিন্তু কলকাতায় কিছু নেই। শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সকলেই বুঝি এর একটা অভাব অনুভব করছিলেন।

১৯৮১ সালের কথা। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশনের যে রেস্তোরাঁ কাম বারটি আছে সেখানে লেখক–কবিরা আসতেন। কিছু আড্ডা হত। আসতেন সাগরময় ঘোষ, সমরেশ বসু, সুবিনয় রায়, বুদ্ধদেব গুহ, দিব্যেন্দু পালিত প্রমুখ। বেশ বড় ধরনের সাংস্কৃতিক আড্ডা বসত সেখানে। তিন চার খানা টেবিল জুড়ে প্রায় ১৫/১৬ জনের নিয়মিত আড্ডা। একদিন কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী শ্রীমতী স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায় বললেন,–'এইখানে রোজ এভাবে আড্ডা না দিয়ে যদি কোন একটা জায়গায় ক্লাব মত করা যায় তাহলে সেখানে আড্ডাও হবে, গান বাজনা নাটকও করা যাবে। আবার কিছু কিছু সমাজ-সেবামূলক কাজও করা যেতে পারে। যেমন কোন অনুষ্ঠান করে তার থেকে যে টাকা আসবে তা কোন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করা যেতে পারে।' যেহেতু প্রথম প্রস্তাবটি উঠেছিল বুধবারে অতএব 'বুধসন্ধ্যার' সূত্রপাত ঘটল।

'বুধসন্ধ্যা'র সূত্রপাত ঘটেছিল আকস্মিক ভাবেই। প্রস্তাব ছিল প্রত্যেকদিন নিছক আড্ডা না দিয়ে তৈরি হোক নতুন ঘরাণার কালচারাল ক্লাব। সেখানে নাটকের মহড়া হবে, হবে গান বাজনা, কবিতা পাঠ। সর্বজনপ্রিয়, সুররসিক, বিদগ্ধ, ব্যবসায়ী ও আড্ডাপ্রিয় কল্যাণ চৌধুরী থিয়েটার রোডের অ্যাম্বেসি বিল্ডিংয়ের সুপরিসর ফ্ল্যাটের কিছুটা জায়গা বিনে পয়সায় ব্যবহার করতে দিলেন।

শুরু হল 'বুধসন্ধ্যা'র আড্ডা। হাইকোর্টের জজ থেকে শুরু করে বিখ্যাত সাহিত্যিক, খুব ব্যস্ত ডাক্তার, অতি তরুণ কবি বা সঙ্গীত শিল্পীও সদস্য। বুধসন্ধ্যায় প্রথম সভাপতি হলেন শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ। সহ সভাপতি ছিলেন সমরেশ বসু ও সুবিনয় রায়। সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সহ সম্পাদক রঞ্জিত কুমার গুহ আর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন বিখ্যাত প্যাথোলজিস্ট ধ্রুবজ্যোতি গুহ। তিনি কবিতাও লিখতেন, ছিলেন বিমান বিশেষজ্ঞ।

বুধসন্ধ্যায় সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জানালেন, 'প্রথম অনুষ্ঠানই ছিল আড্ডা। লেখক শিল্পীরা সবাই যখন একপ্রকার বিচ্ছিন্ন, যোগাযোগছিন্ন তখন সবাইকে মেলাবার একটা চেষ্টা করেছিল বুধসন্ধ্যা। আড্ডাটাই প্রধান–তাছাড়া মাঝে মাঝে গল্প বা গল্প পাঠ।' গান, তর্কবিতর্ক, আর নাটকের অভিনয়, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এরা প্রত্যেকেই গল্প বা কবিতা পাঠ করেছেন। আর সলিল চৌধুরী, শ্যামল মিত্র, অজয় চক্রবর্তী, শান্তিদেব ঘোষ প্রমুখ সঙ্গীত শিল্পীরা শুনিয়েছেন গান। সুবিনয় রায় তো আছেনই–এছাড়াও আরো অনেক সদস্য গানের চর্চা করেন। সাহিত্যিক, বুদ্ধদেব গুহ খুব ভাল টপ্পা গাইতে পারেন। কিন্তু অনেকেই বোধহয় জানেন না যে সমরেশ বসুও ভাল গাইতেন। তিনিও অনেকবার গেয়েছেন বুধসন্ধ্যায়। সাগরময় ঘোষ এককালে বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। রেডিওতে পর্যন্ত গাইতেন। এখন কিছুতেই মুখ খুলতে চান না। কিন্তু 'বুধসন্ধ্যায়' তিনিও কখনও কখনও গান গেয়েছেন।

'বুধসন্ধ্যা'র প্রকাশ্য অনুষ্ঠানটি বেশ হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল। রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথেরই নাটক 'মুক্তধারা'। এই নাটকের মহড়া চলেছিল প্রায় আট মাস ধরে। অনেক সময় মনে হয় আসল অভিনয়ের চেয়ে মহড়ার দিনগুলিই বেশি উপভোগ্য ছিল। অংশ গ্রহণে যারা ছিলেন তারা কেউই পেশাদার অভিনেতা অভিনেত্রী নন। কিন্তু বহু বিখ্যাত নারী পুরুষ এই অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন। নাটকটির পরিচালনা করেছিলেন তরুণ কবি ও নাট্য সমালোচক সুরজিৎ ঘোষ। সাগরময় ঘোষ, সমরেশ বসু, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মত প্রবীণ ব্যক্তিরাও এই তরুণ পরিচালকের সব নির্দেশ মেনে নিতেন। স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায় ব্যস্ত থাকতেন একটা হাজিরা খাতা নিয়ে। মহড়ার দিনে কেউ দেরি করে এলে রীতিমত বকুনি দেওয়া হত। আবার এরই মধ্যে চলত

দৃ · শ্য · প · ট

কিছু কিছু ঝগড়া বা মান অভিমানের পালা।

রবীন্দ্রসদনে পর পর দুটি শনিবার এই নাটক অভিনীত হয়েছিল। সেই উপলক্ষ্যে যেসব ঘটনা ঘটেছিল তা ইতিহাসে স্থান পেতে পারে। নাটকটি অভিনয়ের আগেই তার মহড়ার ছবি ছাপা হয়ে গিয়েছিল কয়েকটি সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায়। টিকিট কাউন্টারে এত লম্বা লাইন পড়েছিল যে তা সামলাবার জন্য ডাকতে হয়েছিল পুলিশ। তবু বহু লোক টিকিট না পেয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে মারামারি বাধাবার চেষ্টা করেছিল। এরকমই এক গণ্ডগোলের মধ্য থেকে অতিকষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে সম্পাদক পালিয়ে যান। কারণ রাইটার্স বিল্ডিংয়ের কয়েকজন মন্ত্রী ও সচিব টিকিটের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। শোনা যায় স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর নাকি তার বাড়ির লোকজনদের জন্য যে টিকিট বরাদ্দ রাখা হয়েছিল তা তাঁকে দেওয়া যায়নি। বোধহয় অভিজ্ঞতার কারণেই কিছু টিকিট সরিয়ে রাখা হয়নি। ফলে সবটাই একসঙ্গে বিক্রি হয়ে যায়। বলাবাহুল্য অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি একসঙ্গে এই নাটকে অংশ গ্রহণ করেছিল বলেই দর্শকদের এত আগ্রহ জন্মেছিল।

‘মুক্তধারা’ নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় শিল্পসাহিত্যের দিকপালেরা

সবাই জানেন ‘মুক্তধারা’ রবীন্দ্রনাথের একটি শক্ত নাটক। এর অভিনয়ও তেমন হয় না–যদিওবা হয়েছে কোন দলই এই নাটক ঠিক বুঝতে পারেননি। ‘বুধসন্ধ্যা’ আয়োজিত ‘মুক্তধারা’ অভিনয়ের দিক থেকে কতটা উৎকৃষ্ট হয়েছিল তা ঠিক বলা না গেলেও দারুণ উপভোগ্য হয়েছিল নিঃসন্দেহে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে–একজন বিদেশি পথিক ভৈরব মন্দিরে পুজো দিতে চলেছে, তার চোখে চশমা-পায়ে চপ্পল। যন্ত্রযুগের প্রারম্ভে চশমা কোথা থেকে এল প্রশ্ন করেন নি কেউ। ফুলওয়ালির একটা ছোট রোল ছিল মুক্তধারায় যে ঠাকুরের জন্য আনা ফুল অভিজিতের উদ্দেশ্যে দান করে যাবে। যারা ফুল বেচে তারা সচরাচর যে খুব সুন্দরী হয় এমন না। কিন্তু ‘বুধসন্ধ্যা’য় ফুলওয়ালিকে তো সাধারণ মালিনী হলে চলবে না। তাকে ফুলের সঙ্গে তুলনীয় হতে হবে। তাই ওই ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য একজন পরমা সুন্দরী মহিলাকে নির্বাচন করা হয়েছিল। রাজার ভূমিকায় খ্যাতনামা সার্জন–কাম–সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ, মন্ত্রীর ভূমিকায় খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক, ইঞ্জিনিয়ার বিভূতির ভূমিকায় নামী কবি–কাম–ঔপন্যাসিক এবং ধনঞ্জয় কেরানির ভূমিকায় খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক-কাম–গায়ক। যাকে বলে চাঁদের হাট। ‘বধুসন্ধ্যা’র নাটকের আর একটি ব্যাপারেও বৈশিষ্ট্য ছিল। তা অন্য কোন নাটকের দলের পক্ষে বজায় রাখা অসম্ভব ছিল। তা হল অভিনেতাদের দৈহিক ওজন আয়তন। দর্শককুল শুধু মাঝে মাঝে চেহারা দেখেই বলে উঠছিলেন–সাধু! সাধু!

অন্যান্য প্রকাশ্য অনুষ্ঠানও হয়েছে বুধসন্ধ্যায়। যেমন গল্প পাঠ কিংবা কবি সম্মেলন। বিখ্যাত সঙ্গীতসন্ধ্যা। এগুলি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। একবার শিশির মঞ্চে বিতর্ক সভার আয়োজন করেছিল বুধসন্ধ্যা। বিষয় ছিল : ‘বেঁচে থাকার অধিকার’। পরবর্তী কালে ‘বুধসন্ধ্যা’র উদ্যানে আরো দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। সে দুটি হল––‘প্রাণের প্রহরী’ ও ‘রাজারানী’। দুটিই লিখেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। এছাড়া শ্রুতিনাট্য হয়েছে সমরেশ বসু ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্প নিয়ে। সাগরময় ঘোষ ও দিব্যেন্দু পালিতের সম্বর্ধনা দিয়েছে ‘বুধসন্ধ্যা’। সুবিনয় রায়ের সম্বর্ধনা ও একক সঙ্গীতের একটি অনুষ্ঠান হয়েছে ‘বুধসন্ধ্যা’র উদ্যোগে। অনুষ্ঠিত হয়েছে কয়েকটি সাংস্কৃতিকসন্ধ্যা।

সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আরো জানালেন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, টিকিট বিক্রি করে যেসব টাকা উঠেছে তা দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার, রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতাল এবং ‘পথের পাঁচালী’ সেবা প্রতিষ্ঠানের জন্য। ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টারে লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের জন্য একটি ফ্রি বেড স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে ‘বুধসন্ধ্যা’। বেশ কয়েকবার অনুষ্ঠানের টপ্পা তুলে সেই বেডটি এখন স্থাপন করা হয়ে গেছে। এইরকম যে কোন উপার্জনই কোন না কোন প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়।

‘বুধসন্ধ্যা’র একটা নীতি হল মৌলিক নাটক ছাড়া কোন বিদেশি নাটকের অনুবাদ অভিনয় করা যাবে না। হয় সংস্থারই কোন লেখক নাটক রচনা করবেন অথবা পুরোনো বাংলা নাটকের নতুন রূপায়নের চেষ্টা করা হবে। যেমন রবীন্দ্রনাথের ‘মুক্তধারা’ মঞ্চস্থ হয়েছে তেমনি এবার বুধসন্ধ্যা প্রস্তুতি নিচ্ছে ডি এল রায়ের ‘শাজাহান’ মঞ্চস্থ করার জন্য।

বিভিন্ন সময়ে যারা এগিয়ে এসেছেন ‘বুধসন্ধ্যা’র বিভিন্ন অংশে তারা হলেন সর্বশ্রী সাগরময় ঘোষ, সমরেশ বসু, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দিব্যেন্দু পালিত, বুদ্ধদেব গুহ, শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, বিজয়া মুখোপাধ্যায়। ডাক্তারদের মধ্যে জয়ন্ত সেন, ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশিষ্ট সাহিত্য অনুরাগী শীতাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ দাশগুপ্ত, কমল দে সিকদার, শিশির গুহ, শিলাজিৎ ঘোষ। শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরোজ চৌধুরী। কৃতি মেয়েদের মধ্যে স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়, মীনা চৌধুরী, রানু মিত্র, ব্রততী মুখোপাধ্যায়, উত্তরা বসু, মৌসুমী ঘোষ, সীতা রুদ্র প্রমুখ। এছাড়াও নানাভাবে সাহায্য করেছেন সুবিনয় রায়, তাপস সেন, জয় সেন, বরুণ বক্সি, পবিত্র সরকার প্রমুখ। এছাড়াও সদস্যগণ এমন অনেকে অনেকবার অংশ গ্রহণ করেছেন বলে জানালেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। এখানকার চাঁদা বছরে ১০০ টাকা।

মজার কথা আরও একটি আছে মাঝে মাঝেই বুধসন্ধ্যার আয়োজনে ভাল ভাল খাওয়া দাওয়ার আড্ডা হয়। কখনও ইলিশ সন্ধ্যা। কখনো চিংড়ি দুপুর, বা কই দুপুর। আর লক্ষ্য করার বিষয় অন্যান্য দিন যেসব সদস্যরা একেবারেই আসতে পারেন না এইসব খাওয়া দাওয়ার দিনে তারা সবার আগে এসে উপস্থিত হন। হাজিরা খাতায় এ দিন কোন অনুপস্থিতি থাকে না।

রাধাপ্রসাদ ঘোষাল

ছবি : সুবীর চ্যাটার্জি, দীপঙ্কর সান্যাল

প্রতাপ মঞ্চ, সুজাতা সদনে যে যৌনআবেদন মূলক নাটক চলছে তাকে অশ্লীলতার নাট্যদূর্গ ছাড়া কিইবা বলা যায়? অশ্লীল নাটক, সুড়সুড়ি দেওয়া সিনেমা, অর্দ্ধনগ্ন নৃত্য, তাস–পাশা চাবির রিংএ যৌনতার ছড়ানো গন্ধ কিভাবে যুবমানসকে আক্রান্ত করছে? নেতা–মন্ত্রী–অফিসাররা এব্যাপারে কি বলেন? –একটি সমাজসচেতন প্রতিবেদন।

১৯ জুলাই, বৃহস্পতিবার। সন্ধে সওয়া ছ'টা। বিকেল থেকেই আকাশ মেঘলা হয়ে রয়েছে। উত্তর কলকাতার রাজা–বাজার সন্নিহিত আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রোডে অবস্থিত 'প্রতাপ মঞ্চে' কুমার গোপী পরিচালিত 'অভিশপ্ত রাত' নাটকটি শুরু হতে আর মাত্র মিনিট পনেরো বাকি। হলের সামনে নানা শ্রেণীর নানা বয়েসি মানুষের ভিড়। কাউন্টারের সামনে ছোটখাটো লাইন। অনেকেই ধোপ দুরস্ত পোশাক আশাক পরে এসেছেন। প্রত্যেকেই অপেক্ষা করছেন ফাইনাল বেলের জন্য। বেল বাজলেই যে যার আসনে গিয়ে বসে পড়বেন। নানা বয়েসি নারী পুরুষকে সেদিন দেখা গেল উদ্বেগে অধীর হয়ে ফাইনাল বেল বাজার মুহূর্তে আস্তে আস্তে হলের ভেতর ঢুকতে। দর্শক আসনের আলো নিভে যাবার পরই পর্দা সরতে শুরু হলো। এখনই শুরু হবে শহরের সব থেকে রগরগে উত্তেজনাপূর্ণ বাণিজ্যিক ছবি, যা দেখার জন্য বিকেল থেকেই লাইন পড়ে যায় কাউন্টারের সামনে।

তিন ঘন্টার এই বাণিজ্যিক ছবিটির কাহিনী একেবারেই চড়া দাগের। বড়লোকের বেহিসাবি ছেলের মদ্যপান, মারদাঙ্গা আর রগরগে যৌনতা এই নাটকের মূল উপাদান। কাহিনী যাই থাক না কেন, কয়েকটি অশ্লীল নাচের দৃশ্য আর বেড সিন দিয়েই নাটকটিকে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। যাতে তিন ঘন্টায় দর্শকেরা মশগুল হয়ে থাকেন নাটকের মধ্যে। নাটকটির মূল আকর্ষণ যৌন আবেদন মূলক নাচ। ফলে টিকিট কাউন্টারের সামনে দর্শকদের ভিড় বাড়তে থাকে। হু হু করে উচ্চ মূল্যের টিকিট বিক্রি হয়ে যায়। পুঁজি বাড়তে শুরু করে হলের মালিক আর পরিচালকের। সব মিলিয়ে সে এক রমরমা ব্যাপার

উত্তর কলকাতার 'প্রতাপ মঞ্চ' বারে বারেই এই ধরনের রগরগে চড়া দাগের নাটক প্রদর্শনের জন্য বিতর্ক সৃষ্টি করে আসছে। এর আগে পার্থ সারথি দাস পরিচালিত 'নেশা' নাটকটিও ছিল এ ধরনের রগরগে উত্তেজনায় ভরা। সেখানে স্বল্পবাস পরা নর্তকীরা অপ্রয়োজনে অকারণে নিজে–

প্রতাপ মঞ্চ : অশ্লীলতার নাট্যদূর্গ থেকে

নাটকীয় আকর্ষণ

দের প্রদর্শন করেছে। 'নেশা'র কাহিনীও মোটা দাগের। ওই নাটকেও ছিল অনর্থক যৌনতার সুড়সুড়ি। অতএব বাণিজ্যের তরী পার করতে প্রতাপ মঞ্চের তেমন কোন অসুবিধে হয় নি। এবং হুহু করে টিকিট বিক্রি হবার জন্য মঞ্চ কর্তৃপক্ষ, পরিচালক ও অভিনেতাদের ঘরে জমা হয়েছে মোটা টাকা। সংস্কৃতির বাহক কলকাতা শহরে বীরদর্পে কয়েকশ' রজনী পার করেছে 'নেশা' নাটকটি। ইদানিং 'অভিশপ্ত রাত'ও চড়া বাণিজ্যিক মালমশলা দিয়ে দর্শকদের আকর্ষণ আদায় করে নিতে পেরেছে।

যে শহরের তিনশ বছর পূর্তি উপলক্ষে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে একের পর এক, সেখানে প্রতাপ মঞ্চ সকলের চোখের সামনে কাগজে রীতিমত বিজ্ঞাপন দিয়ে 'অভিশপ্ত রাত' প্রদর্শন করে চলেছে। হলের বাইরেই ডিসপ্লে হচ্ছে মিস শেফালির অশ্লীল ছবি। এবং এক নয়, একাধিক ছবি শোভিত হচ্ছে হলের ডিসপ্লে ফ্রেমে। এবং তামাম নাটকের মুখ্য লক্ষ্য, কারণে অকারণে যৌনতার সুড়সুড়ি জাগানো নাচ দেখিয়ে নাটকের টিকিট বিক্রি বাড়ানো।

মজাটা এখানেই, সুস্থ সংস্কৃতিকে এই অশ্লীল নাটকগুলি সর্বতোভাবে দূষিত করলেও এখনও পর্যন্ত সেরকম কোন প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ সংগঠিত হতে দেখা যায় নি। এবং সকলের চোখের সামনেই, একটার পর একটা সফল রজনী পার করে বক্স অফিস হিট 'অভিশপ্ত রাত'–এর মত সুড়সুড়ি জাগানো নাটক চলছে একাদিক্রমে। বাংলায় নাট্য সংস্কৃতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে এই ধরনের নাটক সংস্কৃতিবান মানুষদের উদাসীনতার সুযোগে নিজেদের ব্যবস চালিয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর। এখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে কি সাধারণ মানুষ, কি কোন সামাজিক সংগঠন কিংবা সরকারের পদাধিকারীদের সচেতন প্রতিবাদ চোখে পড়ে নি। সংস্কৃতির এই শোচনীয় অবক্ষয়ই সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করছে পাশবিক নীচতা। এবং সমাজে তার প্রতিফলন ঘটতে শুরু করেছে মাত্রাতিরিক্ত হারে। বিপথগামী যুব সমাজের অর্গল খুলে পড়েছে বিস্ময়করভাবে। ফলে দেখা যাচ্ছে নারীর শ্লীলতাহানি, ধর্ষণের ঘটনায় বানতলা, বিরাটি, বারাসাত, কোচবিহার কুমারগ্রাম থেকে শুরু করে খোদ কলকাতাতেও দূষিত হয়ে উঠেছে সমাজ।

গত উনিশ জুলাই এর বিকেলে পরিস্থিতিতে চোখ বুলিয়ে দেখে নিতে এই প্রতিবেদক ও আলোকচিত্রী হাজির হয়েছিলেন প্রতাপ মঞ্চে। নাটক শুরু হবার আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। হলের সামনে মাঝে মাঝেই ট্যাক্সি এসে দাঁড়াচ্ছে। ট্যাক্সি থেকে নামছেন ধোপ দুরস্ত পোশাক পরা নারী পুরুষেরা। ট্যাক্সি থেকে নেমে সোজা এসে ঢুকছেন হলে। ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টার মধ্যে এই রকম অনেক নারী ও পুরুষকে চোখে পড়েছে এই প্রতিবেদকের। সাড়ে ছ'টার সময় কাউন্টারে

তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : এ বিষয়ে বক্তব্য কি ?

উত্তর কলকাতার এই মঞ্চটিকে নিয়ে বারেবারেই বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই মঞ্চ বরাবরই সুড়সুড়ি জাগানো নাটক প্রদর্শন করে আসছে।

জিজ্ঞেস করতেই জানা গেল নাটকের সব টিকিটই শেষ। এবং তাদের বক্তব্য অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল হলের ভেতর চোখ বুলিয়ে। ওই দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশেও হলের একটি আসন খালি নেই।

উত্তর কলকাতার এই মঞ্চটিকে নিয়ে বারেবারেই বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই মঞ্চ বরাবরই সুড়সুড়ি জাগানো নাটক প্রদর্শন করে আসছে। এর আগে 'বারবধূ'র বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ ওঠে। নাটকটির বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। ওই মামলাটিকে কেন্দ্র করে বিশাল ঝড়ও উঠেছিল সে সময়। কাফেটেরিয়া থেকে সাধারণ মানুষদের মধ্যেও আলোচনা চলেছিল দিনের পর দিন। এক সময় ধীরে ধীরে অন্যসব উত্তেজনার মত বিষয়টি থিতিয়ে যায়। তারপর সকলেই লক্ষ্য করলেন, কলকাতা শহরে 'বারবধূ'র মত আরেকটি অশ্লীল নাটক 'নেশা'র আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। এবং বৃহস্পতি, শনি, রবি এবং ছুটির দিন ভিড়ে ছেয়ে গিয়েছে। বাণিজ্যিক ভাবে সফল হবার পর এবার ওই মঞ্চেই শুরু হয়েছে 'অভিশপ্ত রাত'।

আশ্চর্য, একাধিক বিকৃত রুচির অশ্লীল নাচ থাকা সত্ত্বেও 'অভিশপ্ত রাত' সম্পর্কে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী মানুষেরা কেউই সেভাবে সচেতন নন। এমন কী দক্ষিণ কলকাতার 'সুজাতা সদনে'ও শুরু হয়েছে পার্থসারথি দাস পরিচালিত 'পাপী'। সেখানেও যথারীতি চড়া বাণিজ্যের মোড়কে যৌন আবেদনের ছড়াছড়ি। কলকাতার সংস্কৃতি তথা জনমানসকে এই ধরনের নাটকগুলি দূষিত করছে কিনা এ ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত। এমন কি সরকারের বিরুদ্ধেও কেউ কেউ অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। কারও কারও মতে, সাধারণ মানুষরাও এ ব্যাপারে যথেষ্ট উদাসীন। 'অভিশপ্ত রাত' নাটকটির বিকৃত রুচি ও যৌন আবেদন সম্পর্কে বিশিষ্ট সমাজসেবী কৃষ্ণা রায়ের বক্তব্য রীতিমত আক্রমণাত্মক। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চ এবং আরও নানা ধরনের সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কৃষ্ণার মতে, 'অভিশপ্ত রাত'এর মত অশ্লীল নাটক সমাজকে সর্বতোভাবেই দূষিত করছে। মানুষের সামাজিকবোধকে নষ্ট করে দিচ্ছে এইসব নাটকগুলি। আসলে সবটাই কমার্শিয়ালাইজেশান করা হচ্ছে। কোন নাটক বা ছবি করলে বাজারে চালানোর জন্য ওরা সুড়সুড়ি দিচ্ছে দর্শকদের।' কৃষ্ণা দেবীর কথায়, 'শিল্প সৃষ্টি যদি মানুষের মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য না হয়, সেই শিল্প যদি পুঁজির স্বার্থে হয়, তাহলে তা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। এইসব নাটকের উদ্দেশ্য হলো নিছক লাভের জন্য।' সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে এই সমাজসেবীর বক্তব্যও খুব পরিষ্কার। কৃষ্ণা জানালেন, 'সরকার মুনাফালোভীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। যেসব মুনাফালোভী বিকৃত রুচির প্রবক্তা, সরকার তাদের সমর্থন করছে।' তবে এসব দূর করার জন্য সামাজিক সংগঠনগুলির যেমন এগিয়ে আসা উচিত, তেমনই এগিয়ে আসতে হবে সরকারকে।'

আসলে প্রতাপ মঞ্চের নাটকটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। নানাভাবেই কলকাতার সংস্কৃতি তিনশ বছর বয়সে দূষিত হতে শুরু করেছে। 'অভিশপ্ত রাত' উপলক্ষ মাত্র। কলকাতার সংস্কৃতির এই ক্ষয় সম্পর্কে প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী, যিনি এক সময় মহাজাতি সদনে উষা উত্থুপের পপ গান অপসংস্কৃতি আখ্যা দিয়ে ঝড় তুলেছিলেন– সেই জাঁদরেল মানুষটিকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি প্রায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। যতীনবাবু জানালেন, 'শুধু সাম্প্রতিক কালে কেন, আমি তো অনেকদিন ধরেই বলে আসছি যে অপসংস্কৃতি বেড়েই চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের বোধবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা এগিয়ে আসুন–গণসচেতনতা গড়ে তুলুন। আজকে চারদিকে অবক্ষয় শুরু হয়েছে। এর জোয়ারে সমস্ত সুস্থ চেতনাগুলো ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছে। আজকের বানতলার নারীমেধ, কোচবিহার, করিমপুর ও বিরাটির গণধর্ষণ–সেই অবক্ষয়ের নামান্তর মাত্র। এসব দূর করতে দলমত নির্বিশেষে এগিয়ে আসতে হবে।' তিনি যখন মন্ত্রীপদে আসীন ছিলেন, তখনও যেরকম সোচ্চার

ছিলেন, এখনও তার ঘাটতি হয়নি। আশ্চর্যের ব্যাপার, তখন যতীনবাবুর মত কেউই কিন্তু অশ্লীলতা–অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন নি। এখনও 'অভিশপ্ত রাত' কিংবা দক্ষিণ কলকাতার সুজাতা সদনে পার্থসারথি দাস পরিচালিত 'পাপী' নাটকের বিরুদ্ধে কোন বামপন্থী মন্ত্রীকেই সরব হতে দেখা যায় নি। ব্যাপারটা যতীনবাবু ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে, 'তাদের হয়তো রাজনৈতিক অসুবিধে রয়েছে। বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দিকে চোখ রেখেই ওরা এসব পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত রয়েছেন। হয়তো বা ক্ষমতালোভী, অপসংস্কৃতির ধারকরা তাদের কখনও কোনভাবে সাহায্য করতে পারেন। এককথায়, ক্ষুদ্রস্বার্থের দিকে তাকিয়ে বৃহত্তর স্বার্থকে ওরা ভুলে গেছে। এর বিরুদ্ধে নতুন প্রজন্মের যুবক যুবতীদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।' কিন্তু কথা হলো, প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বহুবারই যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে বলেছেন এই সব অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে কিন্তু বর্তমান রাজ্যসরকারের যুব কল্যাণ দপ্তর দুবার যথাক্রমে হোপ '৮৬ ও আলোকের এই ঝর্ণাধারায় বোম্বের অভিনেতাদের নিয়ে এসে রীতিমত শোরগোল তুলেছিলেন। সেই দুটি অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ টেনে আনতেই যতীনবাবু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জানালেন, 'ওই অনুষ্ঠানগুলো সমাজকে দূষিত করছে। ওগুলো আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। আমি ওইসব অনুষ্ঠানে যাই না। আমার পার্টিরও কেউ যায় না। এমন কি তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও যান না।' তবে সুভাষ চক্রবর্তী ওই অনুষ্ঠানের মধ্যমণি ছিলেন–এ কথা জানাতেই যতীনবাবুর স্পষ্টবাক উত্তর, 'সুভাষবাবুর ধারণা অন্যরকম। উনি হয়তো সস্তায় যুব সমাজকে ধরে রাখার চেষ্টা করছেন।' অশ্লীল নাটকের মত পপ সঙ্গীতেও যৌনতা আছে বলে যতীনবাবুর বক্তব্য। 'তবে মহাজাতি সদনে যৌন আবেদন সর্বস্ব পপ সঙ্গীত বন্ধ হলেও দূরদর্শনে যৌন আবেদন সর্বস্ব পপ টাইম দেখানো হচ্ছে। দূরদর্শন কর্তৃপক্ষও যে কিভাবে একটি পারিবারিক বিনোদনকে যৌনতা সর্বস্ব পপ গান দেখানোর কেন্দ্র করে তুলেছেন কে জানে।' তাঁর কথা, 'ওইভাবে নিম্নরুচির অনুষ্ঠানও বন্ধ করে দেওয়া উচিত।' প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রীর অভিযোগ, বর্তমানে সারা কলকাতা যৌন আবেদনমূলক নাটক, ছবিতে ভরে গিয়েছে। চৌরঙ্গির 'টাইগার' হলেও নিয়মিত পর্ণো ছবি দেখানো হচ্ছে। রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ যথেষ্ট সজাগ নয় বলেই এ ধরনের অশ্লীল নাটক ও ছবি চলছে বলে তাঁর আক্ষেপ।

অশ্লীল নাটক, ছবির ব্যাপারে রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভূমিকাকে যাচাই করতে গিয়ে মহাকরণে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর সাক্ষাৎকার নিতে গেলে 'ব্যস্ততা'র কথা জানিয়ে এই প্রতিবেদককে ফিরিয়ে দেন বুদ্ধদেববাবুর ব্যক্তিগত সচিব অংশুমান শূর। 'বুদ্ধদেববাবু পার্টি মিটিং–এ প্রচণ্ড ব্যস্ত আছেন, তাই তার সঙ্গে দেখা করা যাবে না।' বলে এই প্রতিবেদককে ফিরিয়ে দিয়ে অংশুমানবাবু জানালেন, 'লিখবেন, বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয় নি। দেখা করতে অস্বীকার করেছেন, এ কথা লিখবেন না।' পরে অশ্লীল নাটক 'অভিশপ্ত রাত' এর ছাড়পত্র মিলল কিভাবে এ সম্পর্কে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের নাম প্রকাশের অনিচ্ছুক এক অফিসার জানালেন, 'ছাড়পত্র দেবার ব্যাপারে আমাদের কোন ভূমিকা নেই। আমাদের আবার কি ভূমিকা থাকবে! অশ্লীল নাটকের বিরুদ্ধে অ্যাকশান নেবার কথা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ভাবছেন না।' কিন্তু মজার ব্যাপার, কলকাতার পুলিশের ডি সি ডি ডি (২) নারায়ণ ঘোষ এই প্রতিবেদককে স্পষ্টই জানিয়েছেন যে নাটকের 'অবসিনিটি' সেনসার করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের।

যতীন চক্রবর্তী : 'ওইসব অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া উচিত'

কলকাতা সংস্কৃতির জগতে এ ধরনের দূষণ ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে বলে লেবেদফ ড্রামা সার্কেলের অভিনেতা অশোক গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিমত।

তবে বেশ কয়েক বছর ধরে নাটক চলচ্চিত্রে অপসংস্কৃতি অশ্লীলতা বেড়ে গেছে বলে ক্যালকাটা ইউথ কয়্যারের মধ্যমণি রুমা গুহ ঠাকুরতা স্বীকার করেছেন। গণসঙ্গীতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব রুমা দেবীর মতে, এইসব অশ্লীলতা, অপসংস্কৃতি বেড়ে যাওয়ার জন্য 'আমরা সকলেই দায়ী'। তাঁর কথানুযায়ী, 'মানুষকে আমরা সেভাবে শিক্ষা দিতে পারছি না, ফলে অপসংস্কৃতি বেড়ে চলেছে। তবে সারা পৃথিবীতেই অপসংস্কৃতি ছেয়ে গেছে। আমরা তার ব্যতিক্রম নই। তবে অশ্লীল অপসংস্কৃতির স্থায়িত্ব সাময়িক, তার কোন নিজস্বতা নেই। নিজস্বতা না থাকার জন্য সেটা তাড়াতাড়িই হারিয়ে যায়।'

বিশিষ্ট কবি ও বুদ্ধিজীবী সুভাষ মুখোপাধ্যায় যদিও ইদানিংকার নাটক চলচ্চিত্র দেখেন না, তবে নাটক চলচ্চিত্রের অশ্লীল পোস্টার প্রদর্শনে তিনি ভীষণ ভাবে ক্ষুব্ধ। সুভাষবাবু বললেন, 'যতদিন যাচ্ছে, পোস্টার খুব উগ্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমাদের সময়ে এতটা ছিল না। চলচ্চিত্র তো একটা ব্যবসা, আগে এর প্রতিযোগী কম ছিল। এখন প্রতিযোগী বেড়ে গেছে। তাই লোক টানার জন্য অশ্লীল উগ্র পোস্টার করছে। ধরুন, একটা সুন্দরী মহিলার মুখ ছেলেদের আকর্ষণ করে, তখন তা দেওয়া হতো। কিন্তু তাতে হলো না। আরও কিছু তারা চায়–এই 'আরও কিছু' জুড়তে গিয়ে এই সমস্ত এসে যাচ্ছে।' অশ্লীলতা সম্পর্কে সুভাষবাবুর বক্তব্য, 'অশ্লীলতা কথাটি আপাত–বড়ই পরিবর্তনশীল। আমার কাছে যেটা অশ্লীল, আপনার কাছে তা নাও হতে পারে। অশ্লীলতা বয়স, পরিবেশ, সংস্কৃতি ইত্যাদির ওপর পরিবর্তনশীল। গ্রামের মানুষের কাছে যেটা অশ্লীল, শহরের মানুষদের কাছে তা অশ্লীল মনে নাও হতে পারে। এর উল্টোটাও হয়ে থাকে। পনেরো ষোলো বছরের ছেলেদের কাছে যেটা শ্লীল মনে হতে পারে, বয়স্ক মানুষের কাছে সেটা অশ্লীল বোধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুভাষবাবুর কথায়, 'আসলে অশ্লীলতা ব্যাপারটা ব্যক্তি মানুষের রুচির ব্যাপার। যেটা রুচিতে বাধবে, যেটা মানুষকে ওপরে নিয়ে যায় না বরং নিচের দিকে নিয়ে যায়, সেটাই অশ্লীল। রাস্তায় একজন মরে পড়ে আছে, আমরা দেখেও না দেখার ভান করে চলে যাব–এটা তো আমাদের রুচিতে বাধে। এটাকে কি আপনারা অশ্লীল বলবেন।' তবে অশ্লীলতা অপসংস্কৃতি রোধ করার জন্য সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

কলকাতা সংস্কৃতির জগতে এ ধরনের দূষণ ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে বলে লেবেদফ ড্রামা সার্কেলের অভিনেতা অশোক গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিমত। তাঁর মতে, 'আসলে সাধারণ মানুষ সেভাবে সজাগ ও সচেতন হচ্ছেন না, ফলে বাণিজ্যিক গোষ্ঠীগুলি এ ধরনের অশ্লীল নাটক দেখাবার

সুযোগ পাচ্ছেন। সেরকম ভাবে জনমত গড়ে উঠলে এ ধরনের নাটক প্রদর্শনের সাহস তারা পাবেন না।' অশোকবাবুর মত 'অন্বেষক' নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালক সুব্রতবাবুও গণচেতনার অভাবের কথা বলেছেন। সুব্রতবাবু দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে গণমুখী নাটক পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। সুব্রতবাবুর বক্তব্য খুব পরিষ্কার, 'সংস্কৃতির সুস্থ আবহাওয়াকে দূষিত করা হচ্ছে এইসব অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ নাটক প্রদর্শন করে। এখন চাই সংগঠিত প্রতিবাদ।'

বার বছরের বামফ্রন্ট সরকারের শাসনে এই রাজ্যের সংস্কৃতি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে তার নমুনা 'হোপ ৮৬' ও 'আলোকের এই ঝর্ণাধারা'র অনুষ্ঠান দুটি। ওই দুটি অনুষ্ঠান সম্পর্কে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকরা উচ্চ কণ্ঠে সমালোচনা করেছিলেন। এবং নানা কাগজেও ওই দুটি অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রশংসাযোগ্য কিছু লেখা হয়নি। ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকারের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক নীতির সঙ্গে সত্যিই কী তেমন সাযুজ্য ছিল ওই দুটি বর্ণাঢ্য তারকাখচিত অনুষ্ঠানের? বোম্বাই-মার্কা অনুষ্ঠান দুটি কি বামপন্থী নীতির অনুসারী? এ ধরনের অনুষ্ঠান দেখিয়ে বামফ্রন্ট 'সস্তায়' বাজিমাৎ করতে চাইছেন বলে বামফ্রন্টের অন্যতম শরিক আর এস পি–র নেতা ও বিতর্কিত প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন। সব থেকে মজার ব্যাপার, ক্ষমতায় আসীন হবার আগে যারা প্রগতিশীল সংস্কৃতির স্বপক্ষে শ্লোগান দিতেন, ক্ষমতায় আসার পর তারা কি সেই প্রতিবাদী প্রগতিশীল ভাবমূর্তি বজায় রাখতে পেরেছেন? এই প্রশ্ন বেশ কিছু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের। এমন কি অশ্লীল নাটকগুলির বিরুদ্ধে বামফ্রন্টের ছাত্র সংগঠনগুলিকে এখনও পর্যন্ত সরব ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় নি। তাদের নাকের ডগাতেই 'অভিশপ্ত রাত'এর মত অশ্লীল নাটকগুলি কয়েক শো সফল রজনী পার করে চলেছে।

সুস্থ সমাজ চেতনার দূষণ এখন সর্বত্রই মৌরসিপাট্টা জমিয়ে বসেছে। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনার (২) নারায়ণ ঘোষ জানালেন, 'সারা কলকাতাতে এখন অশ্লীল বই, ভি ডি ও এবং নানা ধরনের জিনিস ছেয়ে গিয়েছে। তবে কলকাতা পুলিশ তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে অসুস্থ পরিবেশকে সুস্থ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। আমরা গত ছ'মাসে ৮২৭টি বিদেশি অশ্লীল বই বাজেয়াপ্ত করেছি মধ্য কলকাতা থেকে। কিছু বই উদ্ধার করা হয়েছে দক্ষিণ কলকাতা থেকে। তবে সাহেবপাড়া আর হোটেলেই এদের রমরমা বেশি।' নারায়ণবাবু জানালেন, 'এ পর্যন্ত ৮৩০ জনের বিরুদ্ধে ২৯২ সি আর পি সি ধারায় মামলা করা হয়েছে। ব্লু ফিল্ম–এর ৭৯টি ক্যাসেট বাজেয়াপ্ত করেছে কলকাতা পুলিশ। ২৬ জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে ফৌজদারি মামলা। এছাড়া প্লেন কার্ড আর আই ভিউয়ার বাজেয়াপ্ত করেছে কলকাতা পুলিশ। বড় বাজারে এর চক্র রয়েছে।'

নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ : ডেপুটি কমিশনার, গোয়েন্দা বিভাগ

অশ্লীল নাটক চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাইলে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর সরাসরিই জানিয়ে দেন এ ব্যাপারে তাদের কোন ভূমিকা নেই।

কলকাতা পুলিশের মতে, গত ছ'মাস অশ্লীলতা বিরোধী অভিযান চালানোর পর এই কালা কারবারের দাপট কিছুটা কমেছে। অনেক কফি হাউসেও ভি ডি ও–তে ব্লু ফিল্ম দেখানো হচ্ছে বলে তাদের অভিযোগ। সেক্ষেত্রে পুলিশ মাঝে মাঝেই হানা দিচ্ছে। তবে এ ধরনের দূষণ পুরোপুরি রোধ করা যায় নি বলে নারায়ণবাবুর বক্তব্য। কিছু দিন আগে 'টাইগার' হলে 'লেডি ফুটবলার' নামে বিদেশি অশ্লীল একটি ছবি দেখানো হচ্ছিল। ওই ছবিটির বিশেষ কয়েকটি দৃশ্য নিয়ে আপত্তি ওঠে। এবং একটি ফৌজদারি মামলা করা হয়। মামলায় বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন যে একটি কেন্দ্রিয় বোর্ড গঠন করে অভিযোগের যথার্থ যাচাই করা হবে।

প্রশ্ন : অভিশপ্ত রাত–এর মত অশ্লীল নাটক তো কলকাতায় চলছে। ছবিটিতে একাধিক অশ্লীল নাচ রয়েছে। এই ধরনের নাটক কি করে ছাড়পত্র পেল?

নারায়ণবাবু : এটা রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যাপার। এ সব ব্যাপারে ওঁরাই ছাড়পত্র দিয়ে থাকেন। ওদের জিজ্ঞেস করুন।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন এ ধরনের নাটকে অশ্লীলতা রয়েছে?

নারায়ণ : দেখুন, নাটক যখন সরকারের ছাড়পত্র পেয়েছে তখন সেটা অশ্লীল বলি কি করে? আমাদের জীবনের অস্বস্তিকর বিষয়গুলি আমরা সর্বসমক্ষে দেখতে চাই না। তবে কথা হলো, সেগুলি তো সত্য। তাছাড়া দেখতে হবে সেটা সমাজকে কতটা দূষিত করছে। তবে পরিবেশন পদ্ধতির ওপর গোটা জিনিসটা নির্ভর করে। 'এ' মার্কা লাগিয়ে মাত্রাতিরিক্ত যৌনতার প্রদর্শন কোনভাবেই শুভ নয়।

প্রশ্ন : তাহলে বলছেন এইসব কুরুচিপূর্ণ নাটকের ব্যাপারে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরেরই একমাত্র ভূমিকা আছে। আপনি কি ওইসব নাটকগুলিকে অশ্লীল বলতে চান?

নারায়ণ : আমি এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে পারছি না। তবে সংস্কৃতিকে যা বিপন্ন করে, তা কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।

কিন্তু কথা হলো, বামফ্রন্ট সরকারের সাংস্কৃতিক নীতি বার বছরেও পরিষ্কার হয় নি। অশ্লীল নাটক চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাইলে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর সরাসরিই জানিয়ে দেন এ ব্যাপারে তাদের কোন ভূমিকা নেই। অথচ খোদ কলকাতাতে এই ধরনের সগৌরবে চলতে থাকা নাটকগুলি সপরিবারে কেন, সুস্থ মস্তিষ্ক নিয়েও দেখা সম্ভব নয়! এমন কি ডিসপ্লে ফ্রেমে মিস শেফালির যৌন আবেদনমূলক ছবিগুলি কি সত্যিই সুস্থতার পরিচায়ক? এ ব্যাপারে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আশ্চর্যজনক ভাবে নির্বাক। 'অভিশপ্ত রাত', 'পাপী'র মত রগরগে অশ্লীল বাণিজ্যিক নাটকগুলির মত প্ররোচনামূলক মাধ্যমগুলি অনস্বীকার্যভাবেই যুব সমাজকে প্ররোচিত করে চলেছে অন্যায় সংগঠিত করতে। প্রযোজক চান অশ্লীল নাচ, দৃশ্য দেখিয়ে টাকা রোজগার, আর দূষিত হতে থাকে যুব সমাজ। যার ফলে বানতলা, বিরাটির মত নিন্দনীয় ঘটনা প্রায়শই ঘটতে থাকে। কেনই বা সরকার অথবা সামাজিক সংগঠনগুলি ওই নাটকগুলিতে সমাজের মানসিকতা দূষিত হচ্ছে কি না তা ক্ষতিয়ে দেখতে এগিয়ে আসছেন না? নাকি প্রগতিশীল বামপন্থী সরকারের নাকের ডগাতেই তাদের চরম উদাসীনতায় কয়েক শ' সফল রজনী পার করবে এই নাটকগুলি?

মণিশংকর দেবনাথ

ছবি : কাজী আব্দুল মোহিত, সুস্মিতা চৌধুরী, বিকাশ চক্রবর্তী

বোকা বাক্সের তালতরিয়ৎ

যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ—এই প্রবাদ বাক্যটি দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ সম্ভবত ভুলেই গিয়েছিলেন। নচেৎ এই দুর্নীতি হবে কেন ! প্রসার ভারতী বিল এসেছে। টি.ভি. স্বশাসিত হচ্ছে। এই আনন্দে কতিপয় কর্তা আহ্লাদে আটখানা। তাই সত্য ও তথ্যের ফারাক কমিয়ে আনার দুঃসাহসে কর্তাদের কেউ কেউ মেতে ওঠেন। ভুলে যান বহুল প্রচলিত প্রবাদটি। হয়ত এজন্যেই দূরদর্শনের ক্যামেরায় ধরা পড়েনি কলকাতা বন্ধ—এ দোকানপাট রাস্তাঘাট সব খোলা। চলেছে বাদুড়-ঝোলা ট্রাম-বাস। চালু কলকারখানার চিমনি দিয়ে বেরুচ্ছে গলগল করে ধোঁয়া। অফিস আদালতে কাজের ভিড়ে লক্ষ লোক গিজ গিজ করছে। কোথাও বিক্ষোভ নেই। নেই কোন মিছিল। শান্তিপূর্ণ মহানগরীতে ক্যাডার নামধারী কিছু কৃষ্ণভক্ত প্রাণ অবিরাম মালা জপ করে যাচ্ছে। কোতোয়ালবাহিনী বন্দুকের ডগায় ফুলের মালা ঝুলিয়ে শহরময় পরিভ্রমণ রত। চোখে প্রেমাশ্রু। মুখে হরিনাম। দূরদর্শনকর্তারা এমন কোন দৃশ্যই সেলুলয়েডের ফিতেয় ধরে রাখতে পারে নি। এমন কি কৃষ্ণ নামে মাতোয়ারা এক ভক্তের বেদম আদরে ধূলায় ধুলুণ্ঠিত রক্তাক্ত প্রমীলার আসল ঘটনাও এরা উপলব্ধি করে নি। বোঝে নি। বা বুঝতে চায় নি। হাজরা মোড়ে মহিলা নেত্রীর মাথায় রক্ত নয়—ওটা রক্তরাগ। অসংখ্য সেলাই নয়—প্রেমের বাহ্যিক বন্ধন। লাঠ্যৌষধিতে আলোকচিত্রীর রাজপথে কুঁকড়ে পড়ে যাওয়া নয় এ হলো কৃষ্ণভক্তের পায়ে আত্মনিবেদন। বোমার ঘায়ে ধড়হীন অবস্থায় লুটিয়ে পড়া—এ তো কৃষ্ণ পূজায় আত্মোৎসর্গ।

এই সোজা সরল কথা টি ভি কুশীলবরা কেন যে বোঝেন না ! আসলে প্রবাদবাক্য বিস্মরণের জের। আর তাই দেখাল তখতওয়ালীদের বিরুদ্ধে কিছু অন্য চিত্র ! শুধু কলকাতা বন্ধই নয়, টি ভি কর্তারা কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েকদিন হল কিছু ঘটনা নিজের চোখে দেখার চেষ্টা করছে। এর জন্য তাদের কোন দলের রঙিন চশমা পরতে হয় নি।

কাল হয়েছে সেখানেই। শুরু হল চিঠি চাপাটি। দিল্লি থেকে ছুটে এসেছেন তথ্য দপ্তরের সচিব সুরেশ মাথুর। বেশ চালাকচতুর। বুঝেছেন। ডালমে কুছ কালা হ্যায়। হালচাল বুঝেই মাথুর সাহেব অনুষ্ঠান উপদেষ্টা কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিয়ে দিল্লি ফেরৎ চলে যান। শেষ পর্যন্ত কি ঘটবে তা সম্ভবত জানে দিল্লির মান্ডি হাউসই। তবে বন্ধু সরকারের 'স্বশাসিত' দূরদর্শনে এবার যদি বোকা বাক্সের দর্শকের টি ভি-র পর্দায় রাজনৈতিক শ্লোগানে ঘুম ভাঙে, ঘুম আসে যদি ক্যাডার বাহিনীর পথ নাটিকায়, তা হলে অবাক হবার কিছু নেই। আমরা বরং আগেভাগেই আমাদের শ্লোগানটা একটু মক্স করে রাখি। লং লিভ প্রসার ভারতী। লং লিভ স্বশাসন।
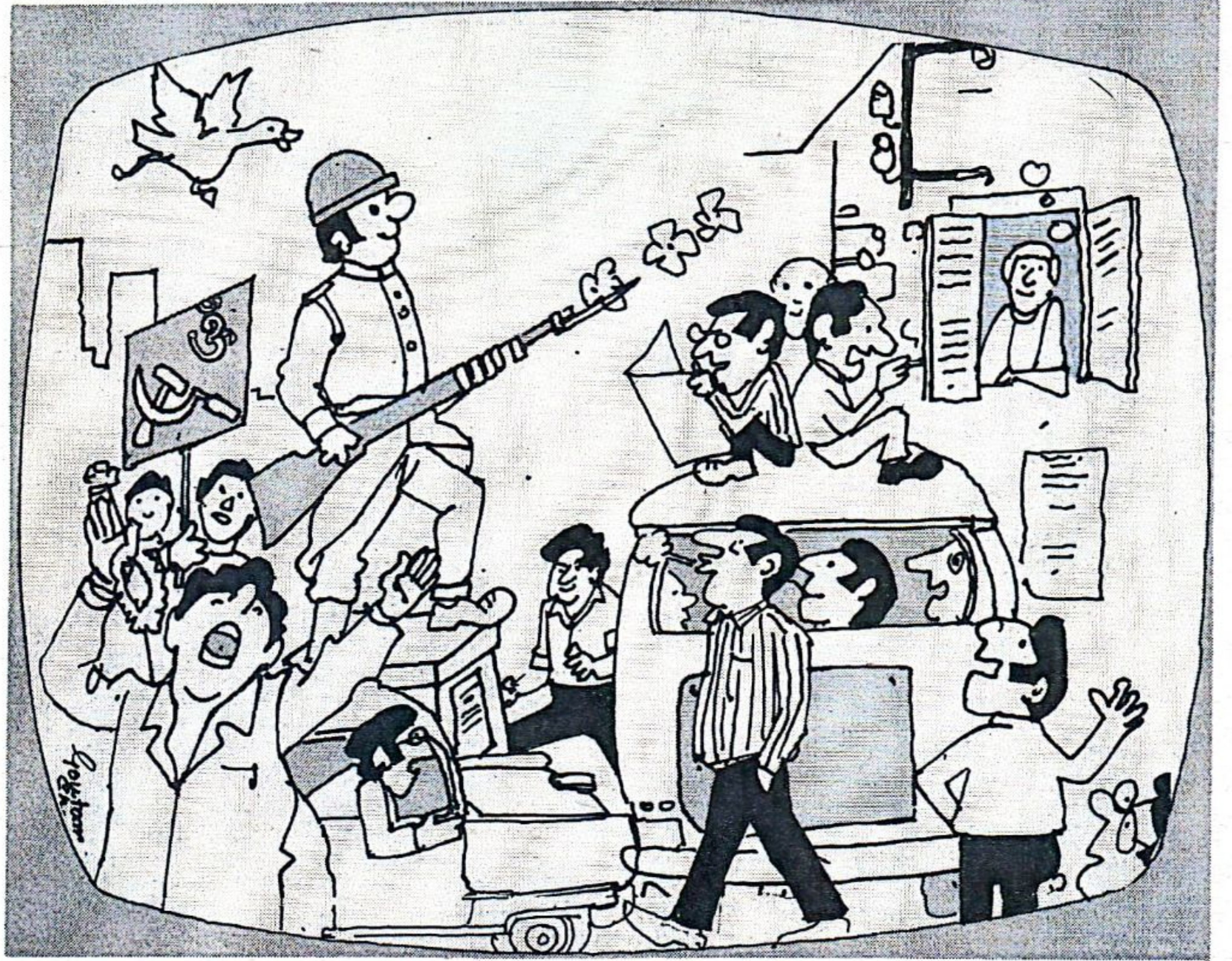
শিষ্টাচার নিয়ে আঁতলামি

শিষ্টাচারের রকমফের নিয়ে ২১ আগস্ট টি ভি-র পর্দায় একটা অনুষ্ঠান হয়ে গেল। শহরে সভ্যতার শিষ্টাচার একরকম, আবার তা গ্রামে অন্যরকম। নগর ও গ্রাম সভ্যতার বয়সের ফারাকে কালস্থান অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে শিষ্টাচার রঙ বদলায়, রূপ বদলায়, পাল্টায় এর ঢং।

অনুষ্ঠানে টগবগে কিছু তাজা তরুণ-তরুণী এ নিয়ে বেশ উপভোগ্য অনুষ্ঠানই উপস্থাপনা করেছেন। অনুষ্ঠানে অভিনন্দ, কৌশিক, জয়শ্রী, রত্না ঝকঝকে ভাষায় খোলামেলা আলোচনায় ওই দিন বেশ জমিয়ে ছিলেন। এরাই বলছিলেন, ডাক্তার পিতা চিকিৎসক পুত্রকে যদি বলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ ঢের হয়েছে, পড়াশুনো করে খুব শিখেছ। এ তো এক ধরনের অবমাননা। এক প্রজন্ম আরেক প্রজন্মকে ছোট করে দেখছে। কিংবা গ্রামের বৃদ্ধ অভিজ্ঞ চাষীকে যদি কেতাবী পড়াশুনার চালে তরুণ এগ্রিকালচারের পড়ুয়া কিছু বোঝাতে চান কিংবা তাঁর পড়াশুনা না থাকার জন্য তাঁর অভিজ্ঞতাকেও উপেক্ষা করেন তবে কি তা আরেক ধরনের অপমান করা নয় ? এও তো এক ধরনের এক প্রজন্মকে অস্বীকার করারই সামিল। এসব কথা প্রসঙ্গেই শুভবিজয়ায় কার্ড চালু করা, কনে দেখার বিড়ম্বনা, কলেজে র‍্যাগিং এবং শিষ্টাচারের নানা ভূমিকা নিয়ে আলোচনা চলে।

মনোগ্রাহী হলেও আলোচনাটিতে কফি হাউসের সময় কাটানোর মত একটা ভাব যেন পরিস্ফুট হয়। অংশগ্রহণকারীরা প্রায় সবাই নস্টালজিয়া, পারফেক্‌শন, নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, স্যাডিস্ট প্রভৃতি ভারি ভারি কথার আমদানি করে সরস আলোচনাটি তেতো করে ফেলছিলেন। মূল ভাব প্রকাশের জন্য এ শব্দগুলি কি সত্যিই সেদিন আলোচনায় প্রয়োজন ছিল ? টি ভি-র দর্শক এখন শুধু সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমেই বাঁধা নেই। ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামে গঞ্জেও। অনুষ্ঠানের প্রযোজক মলয় সাহা, সংযোজনায় আশীষ মিত্র এ ব্যাপারে কিছু গুরুত্ব দিলে বলা যেত দূরদর্শনের দ্বিতীয় চ্যানেল অনেকদিন পর একটি ভালো অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছে। কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি, ইংরেজিবুলির কপচানি যে সব সময়েই উপভোগ্য হয় না বা সাজে না বোধকরি অনুষ্ঠান কর্তাদের মাথায় এটি ঢোকে নি। আলোচনা আঁতলামিতে পর্যবসিত হোক এটা সম্ভবত 'শিষ্টাচারের'ও বহির্ভূত। টি ভি কর্তাদের স্পেশাল ক্লাসে এ শিষ্টাচার শেখাবে কে ?

রণব্রত মুখোপাধ্যায়

একটি গ্রামের মেয়ের কথা

পঞ্জাবের রোপার জেলার প্রধান কার্যালয় থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে খিজরাবাদ (পশ্চিম) নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে প্রায় আট হাজার চাষী বাস করে। আগে এটি একটি পিছিয়ে পড়া গ্রাম ছিল। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ এখানকার অনেক উন্নতি হয়েছে। একদিন সকালবেলা, রোজকার মত কুরালী শহর থেকে বাস এসে গ্রামের বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়েছিল। ওখানকার চেনা পরিচিত লোকেরাই বাস থেকে নেমেছিল। কিন্তু এর মধ্যে একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত মুখও ছিল—একটি অচেনা মেয়ে। সে বহু কষ্টে বাস থেকে নেমে মাটিতে ঘষটে ঘষটে এগোচ্ছিল। এরকম ভাবেই সে গিয়ে গ্রামের প্রধান বাজারে পৌঁছায়। সেখানে গ্রামের এক বৃদ্ধ রাণা শের সিং মেয়েটিকে থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকেন। অন্যান্য লোকেরাও সেখানে এসে জড় হয়। মেয়েটি সংকুচিত হয়ে উঠছিল। কথা বলতে বলতে এক-সময় তার চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে তার দুঃখের কাহিনী শোনায়। তার কথা শুনে ওখানে যে সমস্ত লোকেরা জড় হয়েছিল তাদের চোখেও জল এসে যায়।

মেয়েটির নাম ছিল ফুলবতী। নিজের মা-বাবার সম্বন্ধে কোনকিছুই ওর মনে নেই। সে যে কোথায় থাকত তাও স্মরণ করতে পারে না। শুধু এইটুকুই ওর মনে আছে যে খুব ছোটবেলায় যখন সে গলিতে খেলা করছিল তখন এক মহিলা তাকে তুলে নিজের সঙ্গে নিয়ে চলে যায়। সেই মহিলা ছিল একেবারে ডাইনি। ঘরে নিয়ে এসে সে ফুলবতীকে নির্মম ভাবে মারে। তার পর ওর কোমরে শক্ত করে দড়ি বেঁধে দেয়। এই সময় কষ্টে ফুলবতীর চোখ উল্টে বেরিয়ে এসেছিল কিন্তু তাতেও মহিলার কোনরকম দয়া হয় নি।

কোমরের ওপর ওরকম শক্ত করে দড়ি বেঁধে দেওয়ার ফলে ফুলবতীর শরীরের নিচের অংশে রক্তের প্রবাহ ধীরে ধীরে কমতে থাকে। চলাফেরা করতে ক্রমশ অসুবিধা হতে থাকে। কিছুদিন পরে ওর দুই পা'ই অচল হয়ে যায়। এখন এগোতে হলে তাকে মাটিতে ঘষটে যেতে হয়। ফুলবতী গ্রামের লোকেদের বলল, 'আমার কোমরে এখনও ওই দড়ি বাঁধা আছে।' রাণা শের সিং তখন একটি ব্লেড আনিয়ে ওর কোমরের দড়ি কেটে দেয়। ফুলবতীর কোমরে গভীর ক্ষত হয়ে গেছিল। রাণা শের সিং আদর করে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। তিনি গ্রামের এক ডাক্তারকে ডেকে ফুলবতীর ক্ষতস্থানে মলম লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেন। তারপর খুব আদর করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'আচ্ছা মা, তারপর কি হল? এই গ্রামে তুমি এলে কেমন করে?'

আমার পা যখন একেবারেই অচল হয়ে গেল তখন ওই মহিলা আমাকে ভিখারীদের আড্ডায় রেখে এল। সেখানে রেখারানী আর মায়াদেবী নামে দুই মহিলা ছিল। রেখার সঙ্গে তার স্বামীও

দুর্ভাগ্যের শিকার ফুলবতী কি ভাবে একটি পুরো গ্রামের মেয়ে হিসেবে আশ্রয় পেল তারই গল্পময় প্রতিবেদন।

থাকত। এক প্রৌঢ়ও ওখানে থাকত। ওরা আমাকে কয়েকদিন নিজের কাছে রেখে খুব মারল। মারার সময় ওরা বার বার একটি কথাই বলছিল যে, কোন-ভাবে যদি এখান থেকে পালানোর চেষ্টা করি তাহলে ওরা আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। শীতের রাত্রে ওরা আমাকে একটা ঘরে বন্ধ করে ফ্যান চালিয়ে দিত। সুইচ সামনেই ছিল। কিন্তু দেওয়াল ধরেও আমি যতটুকু খাড়া হতে পারতাম, তাতে আমার হাত সুইচে পৌঁছত না। কিছুদিন পর আমি বুঝতে পারলাম যে ওই আড্ডায় আমার মত আরও চারটি মেয়ে রয়েছে। তাদেরকেও আমার মতই বিকলাঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে। তারা চারজনই সারা দিন ভিক্ষা করত। তার মধ্যে একটি মেয়ে আমাকে বলে যে ওই আড্ডার একটি লোক সব সময় তাদের ওপর নজর রাখে। কাউকে বাইরের কোন লোকের সাথে কথা বলতে দেখলেই সবাইকে দারুণ মারে।

ওই নরকে আমার দিনও কোনরকম ভাবে কেটে যাচ্ছিল। কিছুদিন পরে যখন ওদের বিশ্বাস হল যে আমি কোথাও পালিয়ে যাব না তখন একদিন আমাকে এক চৌমাথার মোড়ে নিয়ে গেল! সেখানে বসিয়ে দিয়ে বলল ভিক্ষা করতে। আমিও তাদের শিক্ষা মত ভিক্ষা করতে লাগলাম। সন্ধ্যার সময় মায়াদেবী এসে আমাকে রিকশা করে নিয়ে গেল। আমার ভিক্ষার পয়সা গুণে দেখা গেল যে পুরো পঞ্চান্ন টাকা হয়েছে। কিন্তু তাও সে রাত্রে আমাকে প্রচণ্ড মার খেতে হল। আমাকে বার-বার বলা হল যে অন্য মেয়েরা দুশো টাকা করে নিয়ে আসে।

তারপর ঠিক এভাবেই আমার দিন কাটতে লাগল। শীত-গ্রীষ্ম যে ঋতুই হোক খোলা জায়গায় বসে আমি সারাদিন ভিক্ষা করতাম। কেউ যদি দয়া করে কিছু খেতে দিত তাই খেতাম। সন্ধ্যার পর আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। ঘরে আবার খুব মারধোর হত।'

সন্ধ্যার সময় ফুলবতীকে যখন ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সে দেখে যে ওই বাচ্চাটিকে সকলে মিলে ভয়ংকর মারছে। বাচ্চাটির নাম মধু আর সে বেশ বড় ঘরেরই ছেলে। ও হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলতে পারত। পরে ও ডেরায় সমস্ত লোকের হাত দেখে তাদের অন্ধকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলে দেয়।

ডেরার লোকেরা মধুর বাড়ির লোকেদের কাছে কোনরকম মুক্তিপণ দাবী করে নি। কিন্তু একদিন রাত্রে মধুর একটি চোখে অ্যাসিড বা অন্য কোন তরল পদার্থ ঢেলে দিয়ে একটি ঘরে বন্ধ করে দেয়। সেখানে সারা রাত ধরে মধু যন্ত্রণায় চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। সকালে দেখা যায় যে তার একটি চোখ খারাপ হয়ে গেছে। সারা জীবনের জন্য ও অন্ধ হয়ে যায়। তারপরও কিছু দিন ধরে ওকে নানাভাবে যন্ত্রণা দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত এক কোণে ভিক্ষা করতে বসিয়ে দেওয়া হয়। ততদিনে জলন্ধর থেকে ডেরা উঠে গিয়ে রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগরে নতুন আস্তানা গেড়েছিল।

বিভিন্ন জায়গা ঘুরে কয়েক বছর বাদে এরা যখন আবার পঞ্জাব এল, তখন রোপার জেলার কুরালী শহরে ডেরা তৈরি হল। এদের সঙ্গে ফুলবতীর প্রায় দশ বছর কেটে গেছিল। ও এখন ষোল সতের বছরের নবযুবতী। ওর দুর্ভাগ্য এই-যে বয়সে মেয়েরা নিজেদের রঙীন ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর থাকে, সেই সময় রাস্তার ওপর বা চৌরাস্তার মোড়ে বসে তাকে ভিক্ষা করতে হয়। আর ভিক্ষা না পাওয়ার অজুহাতে সন্ধ্যাবেলায় বেশ্যাবৃত্তিও অবশ্যম্ভাবী। কুরালীতে ভিক্ষা কিছু বেশিই পাওয়া যাচ্ছিল। তার কারণ সম্ভবত এই যে ফুলবতী খুব মিষ্টি করে কথা বলত। ওই কেবল পাঞ্জাবী বলত আর ডেরার বাকি সকলেই হিন্দি বলতে অভ্যস্ত ছিল।

জানুয়ারি ১৯৯০–এর কথা। করালির বাসিন্দা-মনোবিজ্ঞানের এক অধ্যাপক প্রতিদিন সকালের গাড়িতে রোপার যেতেন। স্টেশনে ঢুকেই ওনার দৃষ্টি প্রথমেই ভিখারিনী ফুলবতীর ওপর পড়ত। কেন জানি না তার ফুলবতীর ওপর খুব দয়া হয়। তাঁর যত তাড়াহুড়োই থাকুক ফুলবতীর থালায় একটি বা দুটি টাকা না দিয়ে তিনি যেতেন না।

একদিন গাড়ি লেট ছিল। ফুলবতীকে ভিক্ষা দেওয়ার সময় তিনি ওর সাথে কথা বলতে শুরু করেন। প্রথমে তো ফুলবতী ডেরার লোকজনের শিখিয়ে দেওয়া মনগড়া গল্প বলছিল, কিন্তু ওর মিথ্যা বেশিক্ষণ টেকে নি।

খানিকক্ষণ জোরজার করার পর ফুলবতী এদিক ওদিক দেখে নিয়ে তার জীবনের সত্যি ঘটনা ভদ্রলোককে শোনায় তখন তিনি ফুলবতীর হাতে কুড়ি টাকার একটি নোট দিয়ে বলেন, 'বেটি এখনও সময় আছে। এই ডেরা থেকে এই নরক থেকে যদি উদ্ধার পেতে চাস তাহলে এখুনি পালা। যা সামনের বাসটাতে চড়ে যা।' ফুলবতী কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করে, 'কিন্তু এই বাস যাবে কোথায়?'

–যেখানে তোর ভাগ্য নিয়ে যাবে। কিন্তু এখন সময় নষ্ট না করে পালিয়ে যা।

তার কথাবার্তায় আর ফুলবতীকে বোঝানোর মধ্যে এমন এক আত্মীয়তার সুর ছিল যে পালাবার সিদ্ধান্ত নিতে ফুলবতীর মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগে।

ততদিনে ফুলবতীর ওপর ডেরার সব সদস্য-দেরই বিশ্বাস জন্মেছিল। সেইজন্যই হয়ত সেই সময় তার ওপর নজরদারি করার জন্য ডেরার কেউ ছিল না। ফুলবতী ঘষটাতে ঘষটাতে বাসের কাছে পৌঁছায় আর ধরে ধরে বাসে উঠে পড়ে। এই বাসে করেই সে এসে পৌঁছেছে খিজরাবাদে।

রাণা শের সিং আর গ্রামের অন্য লোকেরা ফুল-বতীর দুঃখের কাহিনী শুনে কেঁদে ফেলে। এর মধ্যে গাঁয়ের মোড়ল চত্তর সিংও খবর পেয়ে এসে পৌঁছে-ছিল। তিনি ফুলবতীর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'বেটি, তুমি এই গ্রামে আশ্রয় নিয়েছ, এখন পুরো গ্রামই তোমার ঘর। তুমি যেখানে থাকতে চাও খুশি মনে থাক। এখানে থাকার বা খাওয়া দাওয়ার কোন অসুবিধা তোমার হবে না। আজ থেকে তুমি সমস্ত গ্রামেরই মেয়ে।'

সেই দিন রাণা শের সিং তাঁর নিজের ঘরেই ফুলবতীর থাকার ব্যবস্থা করলেন। বহু দিন বাদে সেই রাত্রে ফুলবতী মারের বদলে ভরপেট খেতে পেল আর শোবার জন্যও জুটল নরম বিছানা।

পরদিন সকালে ফুলবতীকে নিয়ে আলোচনার জন্য পঞ্চায়েত বসল। সর্বসম্মতিক্রমে এটাই স্থির হয় যে ফুলবতী খাওয়ার জন্য গ্রামের যে বাড়িতেই যাক কেউ তাকে ফেরাবে না। ওকে স্কুল পাঠানোর আর দেখাশোনার ব্যবস্থা গ্রাম পঞ্চায়েত তাড়াতাড়িই করবে।

পঞ্চায়েতে এ বিষয়েও আলোচনা হয় যে ফুল-বতীর ইচ্ছা অনুসারে গ্রামের কোন ভাল ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী করারও চেষ্টা করা হবে। গ্রামবাসীদের বক্তব্য ছিল এই যে ফুল-বতী যেরকম নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছে তার পরিবর্তে ওকে সব রকম ভাবে সুখি করার চেষ্টা করা উচিত।

গ্রামবাসীদের এই সিদ্ধান্ত ফুলবতী বিশ্বাস করতে পারছিল না। তার মনে হচ্ছিল যে ভগবান বোধহয় তার ডাক শুনেছেন। আর তাই আজ তার দুঃখের দিন শেষ হতে চলেছে। পঞ্চায়েতের সদস্যরা ওকে সঙ্গে নিয়ে সারা গ্রাম ঘুরে সকলের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিল। চারদিনের মধ্যেই ফুলবতী গ্রামের মানুষদের মধ্যে মিলেমিশে গেল। তার পরবর্তী দিনগুলি সুখে কাটতে লাগল।

খিজরাবাদে ফুলবতীর ছ'দিন কেটে যাওয়ার পর একদিন দুপুরবেলা দুটি লোক আর দুই মহিলা জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে তার কাছে এসে দাঁড়াল। নিজেদেরকে তারা ফুলবতীর আত্মীয় বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু তাদের দেখেই ফুলবতী কাঁদতে শুরু করেছিল। তারা চারজনে মিলে ফুলবতীকে তুলে নিয়ে প্রথমে ভাল কথা বলে তারপর ধমকাধমকি করে তাকে জোর করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল। ফুলবতী সমানে চিৎকার করে বলছিল, 'এরা আমার আত্মীয় নয়। এরা ওই ডেরার লোক যারা বাচ্চাদের ধরে নিয়ে গিয়ে ভিখারী বানায়। এরাই আমাকে ধরে নিয়ে গেছিল আর আমাকে দিয়ে ভিক্ষা করিয়েছে।'

সেই দিন মোড়ল চত্তর সিং আর রাণা শের সিং কোন কাজে বাইরে গেছিলেন। গ্রামবাসীদের ওই লোকগুলোকে বাধা দেওয়ার সাহস হয় নি। কারণ ওদের একজনের হাতে লম্বা ছুরি ছিল।

কাছেই রুলদুরামের বেনের দোকান ছিল। গোলমাল শুনে তিনি বাইরে বেরিয়ে আসেন। ব্যাপার বুঝতে তাঁর বেশি দেরি হয় না। দেখতে না দেখতেই উনি ওই লোকগুলির সঙ্গে দারুণ মারামারি শুরু করেন। এর ফলে ওখানে যে সমস্ত লোকেরা ভিড় করেছিল তারাও মারামারি করতে শুরু করে। তাদের খুব মেরে তারপর ধরে নিয়ে গিয়ে থানায় নিয়ে যায়।

গ্রামবাসীদের বক্তব্য এই যে পুলিশের লোকরা তাদের আশ্বস্ত করে ফেরৎ পাঠিয়েছিল আর ওই ছেলেধরাদের থানাতেই বসিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই অ্যাকশন–এর নাম করে পুলিশের লোকেরাই তাদের নিরাপদে গ্রামের বাইরে পৌঁছে দিয়েছিল। পুলিশ গ্রামের লোকদের সতর্ক করে দিয়ে বলে যে ফুলবতীকে ফের কুরালী পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু গ্রামবাসীরা পুলিশের এই কথাকে উড়িয়ে দেয়। তারা স্পষ্টভাবে ফুলবতীকে ফেরৎ পাঠাতে অস্বীকার করে।

এরকম ঘৃণ্য আর অমানবিক কাজ যারা করে তাদেরকে পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে শুনে গ্রামবাসীদের খুবই দুঃখ হয়। কিন্তু তাদের একটাই সান্ত্বনা ছিল যে ফুলবতী তাদের কাছে রয়ে গেছে। তারা ফুলবতীর সুরক্ষার জন্য চারজন অল্পবয়স্ক যুবককে নিযুক্ত করে।

খিজরাবাদের বাসিন্দা বিনোদ শুক্লা ছিলেন রেজিস্টার্ড ডাক্তার। তিনি তার সঙ্গে কিছু লেখা-লিখির কাজও করতেন। জলন্ধর এবং চণ্ডীগড়ের কিছু সংবাদপত্রের সঙ্গে তিনি আংশিক ভাবে যুক্ত। তিনি ফুলবতী আর পুলিশের কাহিনী কাগজে ছাপিয়ে দেন। এতে ক্ষুব্ধ পুলিশ একদিন রাত্রে তার বাড়িতে হানা দেয় আর তাকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড মারে। সকালে তাকে ছেড়ে দেওয়ার আগে এই বলে সতর্ক করে দেয় যে ভবিষ্যতে কোন-দিন ফুলবতী আর পুলিশকে নিয়ে কাগজে কিছু ছাপলে তার ভয়ংকর পরিণাম তাকে ভুগতে হবে।

ডঃ বিনোদ শুক্লা সমস্ত বিষয় তাঁর কাগজের সম্পাদককে জানান। এই সমস্ত কথাবার্তা রোপার পুলিশের বড়কর্তার কাছেও গিয়ে পৌঁছায়। এস এস পি মহম্মদ মস্তুফা সমস্ত বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন। ওই থানা থেকে তখনই কিছু কর্মচারীকে বদলি করে দিয়ে এই মাম-লার বিচার শুরু করেন।

ডঃ বিনোদ শুক্লা র চেষ্টায় জেলার 'দুঃখ নিবা-রণ কমিটি' ফুলবতীর কথা জানতে পারে। এপ্রিল '৯০–এর প্রথম সপ্তাহে রোপারের ডি এস বৈঁস, খড়ড়ের এস ডি এম-কে ফুলবতী কেসের রিপোর্ট তৈরি করতে বলেন। এছাড়া রেডক্রশ সোসাইটি থেকে ফুলবতীকে একটি সেলাই মেশিন, ৫০০ টাকা আর হাতে চালানো গাড়ি দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত বৈঁস, গ্রামের লোকেদের খুব প্রশংসা করেন। পরে মোড়ল চত্তর সিং–এর সাহায্যে ফুলবতীর নামে ১০,০০০ টাকার একটি চেক পাঠান। এর মধ্যে ৮,০০০ ফুলবতীর নামে ফিক্সড ডিপোজিট করে দেওয়া হয়। বাকি ২,০০০ টাকা ওর নিজের রক্ষণা বেক্ষণের জন্য রাখা হয়।

এখন ফুলবতী খিজরাবাদ গ্রামেরই মেয়ে হয়ে খুব সুখে আছে। রুলদুরাম তাঁর বাড়ির পিছনে ওকে একটি আলাদা ঘর দিয়েছেন। দিনের বেলায় ফুলবতী সকাল ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত সেলাই শেখে। তারপর স্কুলে পড়তে যায়। এছাড়া অন্য সময় সে গ্রামের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। যার সঙ্গেই দেখা হয় ফুলবতী তাকেই বলে, 'আমি নরক থেকে বেরিয়ে স্বর্গে এসে পৌঁছেছি।'

'তোমার মা–বাবা যদি খবর পেয়ে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখানে আসে তাহলে তুমি গ্রাম ছেড়ে তাদের সঙ্গে চলে যাবে?' লেখকের এই প্রশ্নের উত্তরে ফুলবতী একটু গম্ভীর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ সে চুপ করে রইল। তারপর বলল, মা–বাবাকে ফিরে পেলে আমার খুশির কোন সীমা থাকবে না। কিন্তু আমি কোন কিছুর জন্যই এই গ্রাম ছেড়ে যেতে পারব না। আমার মা–বাবা যেই হোক আমি তো এখন এই গ্রামেরই মেয়ে।

মনোহর শুক্লা

করবেট ন্যাশনাল পার্ক

অন্য ধরনের শিকারি,

শিশু অপরাধী রাম সিংহ

অপরাধ : জঙ্গলের আঙ্গিনায়

প্রায় এক ঘন্টা লড়াইয়ের পর ঘায়েল হল জগ্গা। কর্বেট নাশনাল পার্কে কেন এই গুলি বিনিময়? কে জগ্গা? কিভাবেই বা ঘায়েল করা হল তাকে এবং তার সঙ্গী সাথীদের?
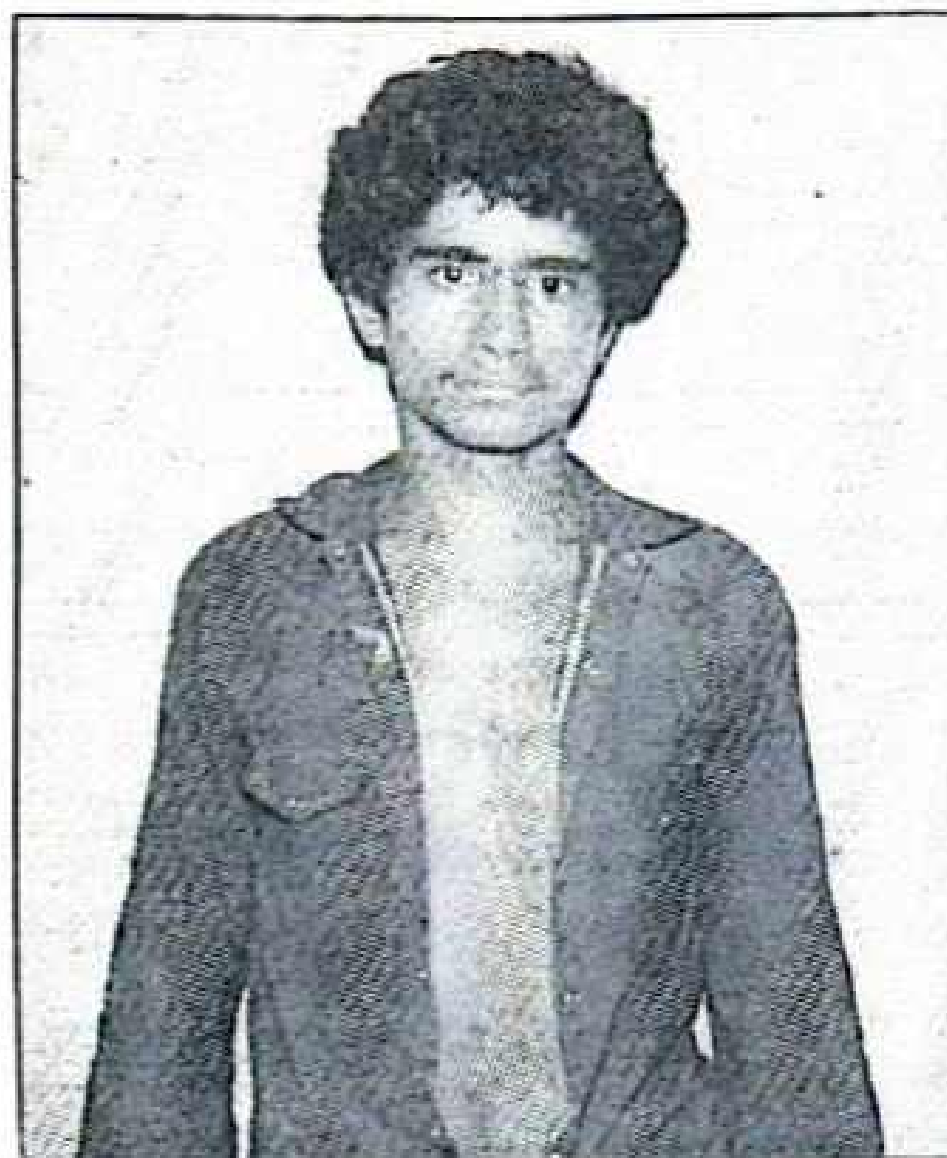
বিশ্ববিখ্যাত কর্বেট ন্যাশনল পার্কের রেঞ্জ অফিসে এক যুবক রেঞ্জ অফিসার রমেশ চন্দ্র নৌটিয়াল—এর সাথে দেখা করতে এসেছিলো। রমেশবাবু আগে কখনো তাকে দেখেননি। বেশভূষা এবং চেহারা দেখে যুবকটিকে শিক্ষিত বলেই মনে হচ্ছিলো। সে নৌটিয়ালকে নমস্কার করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো।

নৌটিয়াল খালি চেয়ার দেখিয়ে বললেন—'বসুন'।

ধন্যবাদ জানিয়ে যুবকটি বসলো। তারপর বললো, 'আমি আপনার সঙ্গে একটা গোপন ব্যাপারে একলা কথা বলতে চাই।'

'আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন। আমি না ডাকলে এখানে কেউ আসবে না।' নৌটিয়াল বললেন।

'রেঞ্জার সাহেব, আসল ব্যাপার হলো কি,

আজ দুপুর বারোটা নাগাদ নুনগড় এলাকা দিয়ে সাতজন লোককে পার্কে ঢুকতে দেখেছি। তাদের দেখে আমার সন্দেহ হয়েছে।'

নৌটিয়াল জিজ্ঞেস করলেন, 'সন্দেহ হলো কেন?'

'দুটো কারণে। প্রথমত, লোকগুলোর কাছে লাঠি, বল্লম আর মালপত্রের বড়ো বাড়ো গাঁঠরি ছিলো। দ্বিতীয়ত, ওদের মধ্যে একজনকে আমি খুব ভালোভাবেই চিনি। সে এই অঞ্চলের কুখ্যাত অপরাধী। কয়েকটি জেলার পুলিশ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আতঙ্কবাদীদের সঙ্গেও তার সম্পর্ক আছে।'

আগ্রহের সঙ্গে নৌটিয়াল বললেন, 'তার নাম কি?'

'জগ্গা।'

জগ্গার নাম শুনে চমকে উঠলেন নৌটিয়াল। শুধু নৌটিয়ালই নন, জগ্গার নামের সঙ্গে বনবিভাগের সমস্ত কর্মচারীই পরিচিত। সে বেশ কয়েকবার পার্কের মধ্যে থেকে কাঠ চুরি এবং বন্যপ্রাণী শিকার করার দায়ে ধরা পড়েছিলো। শুধু কাঠ চুরি বা বন্যপ্রাণী শিকারই নয়–চুরি, হত্যা, ডাকাতি, ইত্যাদি ব্যাপারেও জগ্গা জড়িত।

রেঞ্জ অফিসার রমেশ নৌটিয়াল

তার অপরাধের বিবরণ কালাগড়, রহেড়, আফজলগড়, বিজনৌর প্রভৃতি থানায় লিপিবদ্ধ ছিলো। বিভিন্ন অপরাধের জন্যে তার বিরুদ্ধে বিজনৌর, পৌড়ি এবং নৈনিতাল কোর্টে ২৬ টা মোকদ্দমা চলছিলো।

সুতরাং জগ্গার নাম শুনে নৌটিয়ালের চিন্তিত হওয়া স্বাভাবিক ছিলো। তিনি যুবকটির কাছ থেকে জগ্গার সম্পর্কে আরও কিছু দরকারি খবর জেনে নিলেন। যুবকটি বলেছিলো যে, জগ্গার বাবার নাম বিষণ সিং। বিজনৌর জেলার রেহড় থানার অন্তর্গত কল্লুবালা গ্রামে তার বাড়ি।

নৌটিয়াল যুবকটির নাম–ঠিকানা জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যুবকটি নাম –ঠিকানা জানাতে অস্বীকার করে। সে যেমন চুপচাপ এসেছিলো তেমনি চুপচাপ চলে যায়। এই ঘটনাটি ঘটেছিলো ১৩ জুলাই ১৯৯০ দুপুর দুটো নাগাদ।

খবরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো তাই নৌটিয়াল গভীর চিন্তায় পড়লেন। কর্বেট পার্ক ১৫ জুন থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত পর্যটকদের জন্যে বন্ধ থাকে। সুতরাং ঐ সময় পার্কে কারো প্রবেশ নিষিদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে জগ্গার মতো কুখ্যাত লোকের দলবল নিয়ে লুকিয়ে পার্কে ঢোকা নৌটিয়ালের কাছে রীতিমতো চিন্তার বিষয় হয়ে উঠলো। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, জগ্গার সঙ্গে যারা আছে তারাও নিশ্চিত অপরাধী। একটা প্রশ্ন নৌটিয়ালের মাথায় বার বার আসছিলো–ঐ সব লোক আতঙ্কবাদী নয় তো! যাইহোক, কোনো পদক্ষেপ নেবার আগে তিনি তাঁর উপরের অফিসার কর্বেট পার্কের নির্দেশক এ.এস. নেগীকে এ ব্যাপারে জানালেন।

সব শুনে নেগী বললেন, 'মিঃ নৌটিয়াল, আপনার কেন মনে হচ্ছে যে, জগ্গা অসৎ উদ্দেশ্যে পার্কে ঢুকেছে।'

'স্যার, জগ্গা পুরোনো কাঠ চোর, খুব সম্ভব এবারেও সে কাঠ চুরি করতেই ঢুকেছে।' নৌটিয়াল নিজের সিদ্ধান্ত জানালেন।

'সে সম্ভাবনা নেই বলেই আমার মনে হয়,

এ.এস. নেগী

কেননা, জগ্গা যদি কাঠ চুরির উদ্দেশ্যেই পার্কে আসতো তাহলে তার সঙ্গী–সাথীদের কাছে লাঠি বল্লমের বদলে কুড়ুল থাকতো। এছাড়া ভুললে চলবেনা যে কাঠ কেটে তারা নিশ্চয়ই মাথায় করে নিয়ে যেতে পারবে না। সঙ্গে চুরির মাল নিয়ে যাবার জন্যে কোনো বাহন থাকতো।'

'স্যার, আর এক সম্ভাবনা আছে। হয়তো ওরা অবৈধভাবে বন্যপ্রাণী শিকার করার উদ্দেশ্যে পার্কে ঢুকেছে।'

নেগী বললেন, 'এ ব্যাপারেও আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। কেননা, জগ্গা যদি শিকার করতেই আসতো তাহলে তার সঙ্গে বন্দুক থাকা উচিত ছিলো। আর এটা ভাবুন, শিকারের জন্যে তো এক দু' জন লোকই যথেষ্ট। ছ'সাত জন লোকের দরকার কি? এ জন্যেই বলছি, জগ্গা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এসেছে।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার। কিন্তু আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। যে খবর দিয়েছে সে বলেছে জগ্গাদের কাছে বড়ো বড়ো মালের গাঁঠরি আছে। জঙ্গলে এতো মাল নিয়ে যাবার উদ্দেশ্য কি?' নৌটিয়াল বললেন।

'দেখুন নৌটিয়াল, জগ্গা তো কুখ্যাত অপরাধী, তার সঙ্গে যারা আছে তারাও অপরাধীই হবে। হয়তো তারা পুলিশের ভয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে চায়। তাই গাঁঠরিতে বেশ কিছুদিনের খাবার দাবার আর বিছানা–চিছানা নিয়েছে।'

নৌটিয়াল বললেন, 'স্যার, এও হতে পারে কি জগ্গার সঙ্গে যারা আছে তারা পাঞ্জাবের আতঙ্কবাদী। তাদের গাঁঠরিতে খাবার দাবার বিছানাপত্রর সঙ্গে অবৈধ অস্ত্রশস্ত্রও থাকতে পারে।'

'হ্যা, তাও হতে পারে। আমাদের সময় থাকতেই কিছু করতে হবে।'

নৌটিয়াল বললেন, 'আমার ওপর কি আদেশ স্যার?'

'আপনি আগে গোপনে খোঁজ করুন যুবকটি যে খবর দিয়েছে তা সত্যি না মিথ্যে। খোঁজ নিন, জগ্গা বাড়িতে আছে না নেই। যদি বাইরে গিয়ে থাকে তাহলে তার সঙ্গে কে কে এবং কতোজন লোক আছে। এ সব খবর নিয়ে আমাকে ওয়ারলেসে জানাবেন।' নেগী আদেশ দিলেন।

নৌটিয়াল যাবার পর নেগী ওয়ারলেসে সব অরণ্যরক্ষীকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, পার্কের মধ্যে কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে দেখলে যেন সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়। এছাড়া বন্যপ্রাণী প্রতিপালককে জানিয়ে রাখেন যে সশস্ত্র বন্যপ্রাণী রক্ষক ও বিভাগীয় পুলিশ যেন তৈরি থাকে–যে কোনো মুহূর্তে দরকার পড়তে পারে।

ওদিকে নেগীর কথামতো নৌটিয়াল একজন বিশ্বস্ত লোককে পাঠিয়ে সমস্ত খোঁজখবর পেলেন। ঐ যুবকের খবর সত্যি ছিলো। এ খবর জানার পর নেগী সমস্ত বন রক্ষককে আদেশ দেন জগ্গার খোঁজ করতে। পার্কের প্রত্যেকটা ওয়াচ টাওয়ারে দু'জন করে সশস্ত্র রক্ষী মোতায়েন করেন এবং তাঁদের শক্তিশালী দূরবীন দেওয়া হয় নজরদারীর জন্য।

নুনগড় অঞ্চলে ঘনো, বিশাল জঙ্গল, বর্ষায় তা আরো ঘনো হয়ে উঠেছিলো। এই অঞ্চলটা কর্বেট পার্কের কালাগড় রেঞ্জের অন্তর্গত। এই রেঞ্জেই কর্বেট পার্কের সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার আছে। এই টাওয়ারটিকে বলে চিড় চোটি টাওয়ার। অত্যধিক উঁচু হবার ফলে এই টাওয়ার থেকে শুধু নুনগড় এলাকাই নয়, পার্কের বহু দূর দূর অঞ্চলও নজরে আসে। সে জন্যেই নেগী চারজন সশস্ত্র রক্ষীকে এই টাওয়ারে বসিয়ে রাখেন।

এছাড়াও নেগী একজন রক্ষীকে জগ্গার বাড়ির ওপর নজর রাখার জন্যে মোতায়েন করেন যাতে জগ্গা বাড়ি ফিরে এলে তাকে গ্রেপ্তার করা যায়।

৯৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

গয়া : যেখানে আত্মার মুক্তিলাভ হয়

পিণ্ডদানের মাধ্যমে আত্মার পাপমুক্তির কেন্দ্র পৌরাণিক শহর 'গয়া'র স্মৃতিসত্তাভবিষ্যতের কাহিনী।
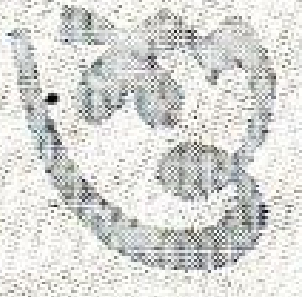
শুক্লপক্ষের অবসান, কৃষ্ণপক্ষের শুরু। আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় পক্ষ, জ্যোৎস্নাময় নিশির সমাপ্তি। নক্ষত্রখচিত অন্ধকার আকাশে তীব্র গাম্ভীর্য, তিমির তমসায় যেন তামাম চরাচরের সর্বাঙ্গে এক বিস্ময়কর নৈঃশব্দ। মহাকাল স্থানুবৎ, শুধু পুণ্য-প্রার্থী তীর্থযাত্রীরা এগিয়ে চলেছে পিতৃপুরুষের অতৃপ্ত আত্মার শান্তি স্বস্ত্যয়ন কামনায়।

গন্তব্য পিণ্ডদান কেন্দ্র গয়া, ভারতের লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর সমাবেশ যখন সামিল হয় তখন আকাশ থেকে মুছে যায় চাঁদের শুভ্র রেখা। নিকষ অন্ধকারে ছেয়ে যায় চর্তুদিক।

প্রতি বছর আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষে শুধু ভারতবর্ষ নয়, অন্যান্য দেশ থেকেও হাজারে হাজারে পুণ্যার্থী ছুটে আসেন এখানে। পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার মানুষও ছুটে আসেন এখানে। মানুষের বিশ্বাস, মৃত আত্মার সদ্গতির জন্য গয়ায় পিণ্ড দান অনিবার্য। নচেৎ আত্মা চির অতৃপ্ত থেকে যায়। ফল্গু নদীতটে পিণ্ডদান ও তর্পন বিনা সদগতি হয় না কারও। ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী, একমাত্র গয়াতেই পিণ্ডদান হয়ে থাকে। কবে পিণ্ডদান শুরু হয়, তার কোন প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। স্থানীয় পাণ্ডারা বলেন, ব্রহ্মাই প্রথম এখানে এসে পিণ্ড দেন। পাণ্ডাদের মতে, ভগবান শ্রীরাম, ভীষ্ম এবং পাণ্ডবদের কাহিনীতে গয়ায় পিণ্ডদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। মৌর্য, গুপ্ত রাজারা, বিজয়নগরের শাসককুল এবং অধ্যাত্ম যুগের কুমারিল ভট্ট, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব এবং চৈতন্য মহাপ্রভু এখানে এসেছেন। পিণ্ডদানের জন্য এখানে ৫৫টি বেদি রয়েছে। শোনা যায় এখানে ৩৬০টি পিণ্ডদানের জন্য বেদি ছিল। এই বেদিগুলির মধ্যে 'বিষ্ণুপদ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুপদ মন্দির বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান বলে পরিগণিত। এই মন্দির ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, ইন্দোরের মহারানী অহল্যাবাঈ ১৭৬৬ সালে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির নিয়ে আদালতে একটি মামলাও দায়ের করা হয়েছে। সেই মামলা এখনও বিচারাধীন।

পাণ্ডারা সরকারের চিহ্নিত প্রতিষ্ঠার সময়কেই মেনে আসছেন। সম্পূর্ণ কালো পাথরে তৈরি এই মন্দিরটি। মন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর ১৩ ইঞ্চি পায়ের ছাপ আজও রয়েছে। বিষ্ণুপদ মন্দিরে প্রতি বছর কয়েক লাখ মানুষ পিণ্ডদান করতে আসেন। মন্দিরের কাছেই আছে সূর্যকুণ্ড। আছে উত্তর ব্রহ্ম সরোবর। এই সরোবরে পিণ্ডদান করা হয়। এছাড়া রামগয়া, কাগবলি রামশিলা, সীতাকুণ্ড, প্রেতশিলা, মঙ্গলাগৌরী, ব্রহ্মযোনি, অক্ষয়বট, ব্রহ্মসদ, বৈতরণী, ফল্গুঘাট রুক্মিনী সরোবর, গজাধর ঘাটও গয়ার উল্লেখযোগ্য পিণ্ডদান বেদি হিসেবে পরিচিত। অধিকাংশ ঘাটই সারা বছর উপেক্ষায় অবহেলায় থাকে। পিতৃপক্ষের পরেই জমজমাট হয়ে ওঠে এই উপেক্ষিত বেদিগুলি।

গয়ার বিষ্ণুপদ মন্দির

৯৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

আলিমুদ্দিন

এক্সক্লুসিভ

অভিযোগ উঠেছে, আলিমুদ্দিনের কর্তারা সরকারি প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রকে বঞ্চিত করে সি পি এম-এর দলীয় মুখপত্র 'গণশক্তি' তে এক্সক্লুসিভ খবর দেবার জন্য বিভিন্ন সংস্থাকে বাধ্য করছে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এভাবেই মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের ক'দিন আগেই মেরিট লিস্ট অর্থাৎ প্রথম দশজন কৃতী ছাত্র ছাত্রীর নাম ঠিকানা গণশক্তি পত্রিকার কাছে লিক করেছে। গণশক্তিও পর্ষদ কর্তৃপক্ষের যোগসাজসে সব সংবাদপত্রের আগে মেরিট লিস্ট প্রকাশের কৃতিত্ব জাহির করতে চেয়েছে? প্রকাশ্যে গণশক্তি 'স্কুপ'এর কথা বলতে চায়নি, কারণ সি পি এম-এর পার্টি মুখপত্রে সরকারি খবর নিয়ম ভেঙে বেরুলে দায় পড়বে সরকারের প্রধান জ্যোতি বসুর ঘাড়ে। উদ্দেশ্য কি তবে কাগজের বিক্রি বাড়ানো? তা না হলে গণশক্তি মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল সরকারিভাবে ঘোষণার আগে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের ছবি জোগাড় করে তালিকা প্রকাশ করল কি ভাবে? শুধু মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলই নয়, ইদানিং রাজ্য সরকারের বহু খবরই গণশক্তিতে স্কুপ হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়

কেঁচো খুঁড়তে সাপ

১৯৮৭ সালের মে মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কসিট জালিয়াতির নায়ক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা বিভাগের কর্মী অমর ঘোষের ওপর থেকে সাসপেনসন তোলার ব্যাপারে বিশেষ রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট এক প্রভাবশালী মহল উপাচার্য ডঃ ভাস্কর রায়চৌধুরীর ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন। এ নিয়ে সিন্ডিকেটের বৈঠকেও একচোট হৈ-চৈ হয়ে গিয়েছে। অমরবাবুর ওপর থেকে সাসপেনসন প্রত্যাহারের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সিন্ডিকেটের নির্দেশে ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সি পি এম-এর অধ্যাপক নেতা, সিন্ডিকেট সদস্য এবং বর্তমানে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিশন গঠন হয়। তদন্ত কমিশন অমর ঘোষের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নি বলে রায় দিয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক বলেছেন, এই জালিয়াতি চক্রের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু কেলেঙ্কারির যোগ আছে। পাছে, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোয় তাই অমর ঘোষকে বাঁচাবার চেষ্টা চলছে।

লেক থানা

পুলিশমন্ত্রীর পুত্রবধূ সমাচার

জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার ক্ষেত্রে সব নাগরিকই পুলিশের কাছে সম ব্যবহার পাবেন, এটাই ভারতীয় সংবিধানে লেখা আছে। অথচ দক্ষিণ কলকাতার লেক থানার পুলিশ এ ব্যাপারে প্রচণ্ড পক্ষপাতিত্ব করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রীর পুত্রবধূ ডলি বসুর পূর্ণদাস রোডে একটি কাপড়ের দোকান আছে। ডলি বসু যখন কলকাতার বাইরে অথবা বিকেলে বেড়াতে যান, তখন লেক থানার পুলিশ ডলি বসুর দোকান 'মল্লিকা'কে পাহারা দেবার ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন। দেখা যায়, লেক থানার একটি গাড়ি ঘণ্টার পর ঘণ্টা মল্লিকার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির নম্বর ডব্লু এম ডব্লু ৪৭০২। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু একটানা তিন সপ্তাহ বিদেশ সফরে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন ডলি বসুও। ওই ২১ দিন লেক থানা তাদের কর্তব্যে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য দেখায় নি। ডলি বসু অবশ্য কলকাতায় থাকলে পুলিশের অতন্দ্র প্রহরার দরকার হয় না। প্রশ্ন উঠেছে, গড়িয়াহাটার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বিভিন্ন দোকানের মালিক যদি এই সাহায্য চান, তারা কি পাবেন?

প্রেস ইনস্টিটিউট

অনন্য সাধারণ

শহরের চটকদারি ও কেচ্ছার খবর বাদ দিয়ে প্রকৃত অর্থে স্রেফ গ্রামীণ খবরের ওপর ভিত্তি করে বাংলা ভাষার এক পূর্ণাঙ্গ সাপ্তাহিক বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্র বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সম্মান আদায় করতে পারে তা প্রমাণ করে দিয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউটের সদস্য বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী। বিশ্বনাথবাবু এক সময় কলকাতার বেশ ক'টি দৈনিক এবং সংবাদ সংস্থায় কাজ করে গ্রামীণ সংবাদের ওপর গবেষণার কাজে নামেন। সমীক্ষা করেন এ রাজ্যের ১৪ হাজার গ্রামের মধ্যে ৭ হাজার গ্রাম। তারপর জন্ম দেন যে সাপ্তাহিকের তার নাম 'কলকাতা থেকে গ্রাম'। বিশ্বনাথবাবু তাঁর কাজের নিরিখেই সদস্য হয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউটের, যার সদস্য অভীক সরকার, তুষার কান্তি ঘোষের মত ব্যক্তিত্ব। বিশ্বনাথবাবু ইতিমধ্যেই বেলজিয়াম, হংকং, রাশিয়া, ফ্রান্স, পূর্ব জার্মান সহ বিভিন্ন দেশে গ্রামীণ সংবাদপত্রের ওপর বক্তব্য রেখে প্রচুর সুনাম কুড়িয়েছেন। মস্কো নিউজ, 'কলকাতা থেকে গ্রাম' ধাঁচের একটি সাপ্তাহিক করতে চাইছে।

লালবাজার

সর্ষের মধ্যে ভূত
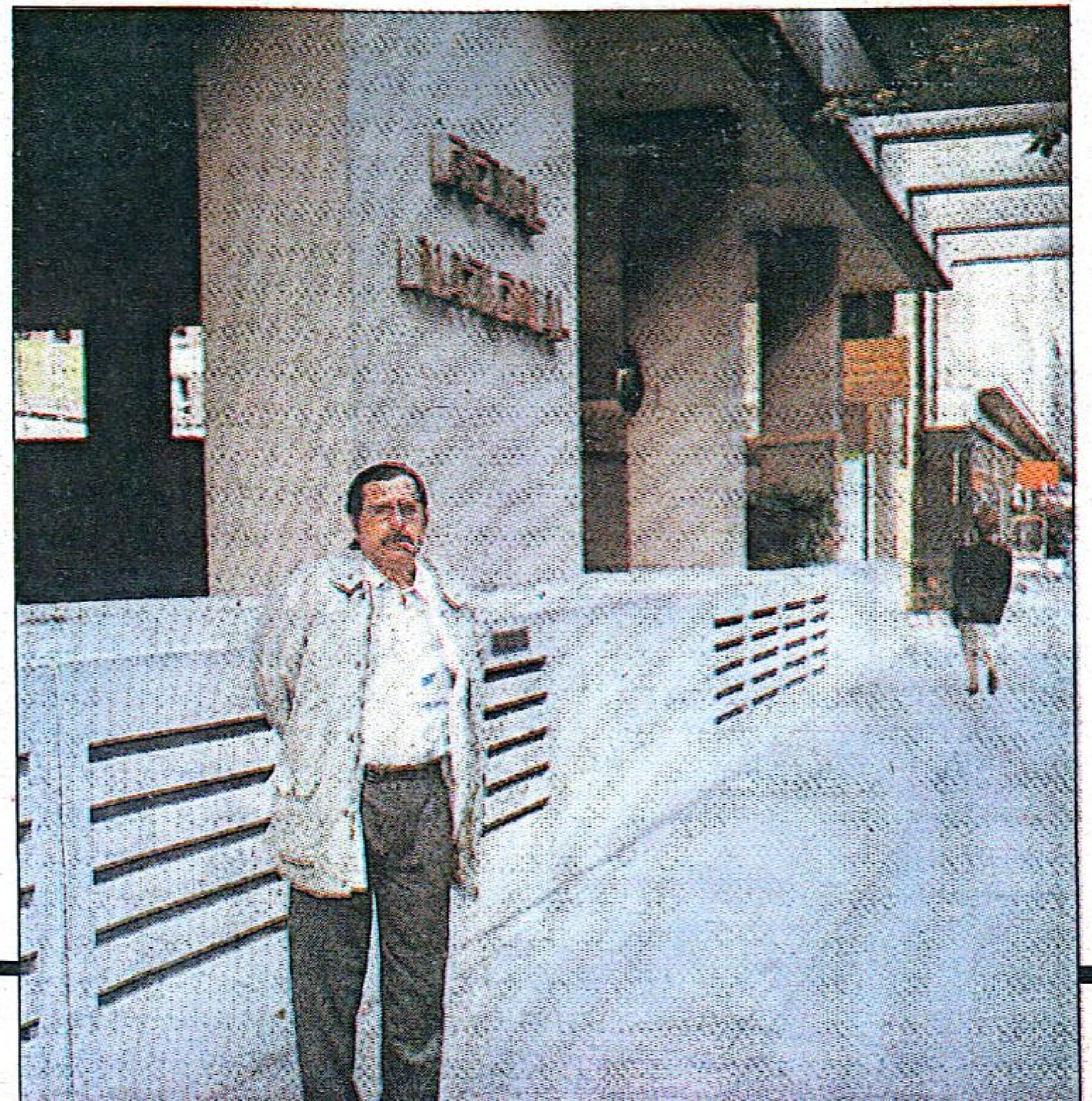
১৯৮৭ সালের কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিকাশ-কলি বসু (বর্তমানে রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত ডাইরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ) বিভিন্ন দুর্নীতি, গুণ্ডামি, রাহাজানি, সংঘর্ষ প্রতিরোধে এবং ভি আই পি–দের নিরাপত্তার ব্যাপারে এক টাস্ক ফোর্স গঠন করে-ছিলেন। গোয়েন্দা দপ্তরের ডিসি–র অধীনে এই টাস্ক ফোর্সে ছিলেন ১৮ জন অফিসার, ২জন ইনসপেক্টর, ৩০ জন কনস্টেবল ও ৩টি জীপ। শুরুতে টাস্ক ফোর্স বেশ ভালই কাজ করছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এক দুর্নীতিগ্রস্থ অফিসার ও তার দু'তিনজন বশংবদ দুর্নীতিতে টাস্ক ফোর্সের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করে দিতে শুরু করলেন। ওদের কাজ হয়ে দাঁড়াল বাজেয়াপ্ত জিনিস আত্মসাৎ, হকার ও ব্ল্যাকারদের কাছ থেকে কমিশন গ্রহণ ছাড়া হরেক দুর্নীতি। শেষে টাস্ক ফোর্সকে মূল উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে স্টোনম্যান রহস্য উদ্ঘাটনে সহ-যোগিতার কাজে লাগানো হল। সেখানেও টাস্ক ফোর্স পুরোপুরি ব্যর্থ হল। অবশেষে এই শ্বেত হস্তী না পুষে বিদায় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

টেলিফোন গ্রাহক সমিতি

মিনি বোফর্স ?
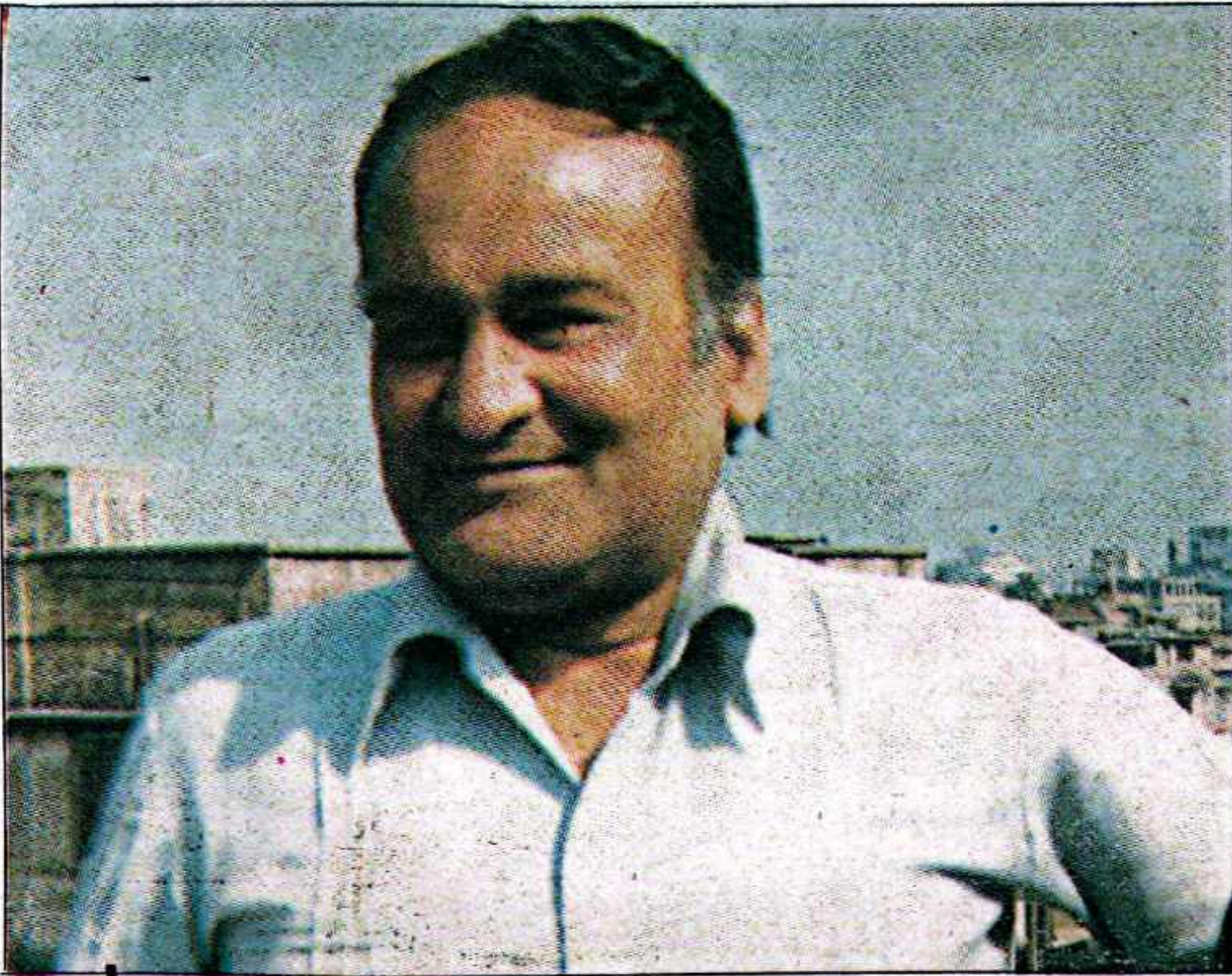
টেলিফোন কনজিউমার্স গাইডেন্স সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার সেক্রেটারি জেনা-রেল শৈলেন গাঙ্গুলির নাম কলকাতা টেলিফোন কর্তৃপক্ষের কাছে আতংক স্বরূপ। কলকাতা টেলিফোনের অন্তর্জলী যাত্রা, দেহরক্ষা, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান মায় স্থায়ী স্মৃতি বেদী তৈরি হয়েছে শৈলেনবাবুরই নেতৃত্বে। শৈলেনবাবুর প্রতিবাদ অভিনব। ভাঙচুর, বলপ্রয়োগ, চিৎকার চেঁচামেচি নেই, আছে বুদ্ধির প্রয়োগ। প্রতিবাদের ক্ষেত্রে নিত্য নতুন উদ্ভাবনী শক্তির পরি-চয় দিয়ে তিনি টেলিফোন কর্তৃপক্ষের মাথা হেট করে দেন। কলকাতায় টেলিফোনের যেটুকু অস্তিত্ব আছে, তার পেছনে শৈলেনবাবুর অবদান কম নয়। সম্প্রতি তিনি কেন্দ্রিয় যোগাযোগ মন্ত্রী জ্ঞানেশ্বর মিশ্রকে জানিয়েছেন, কল-কাতায় ইলেকট্রনিক সিস্টেমের নামে কেন্দ্রিয় সরকার একটি জালিয়াতি করেছে। যাকে মিনি বোফর্স কেলেঙ্কারি বললে ভুল হবে না। এই ব্যবস্থায় ফ্রান্সের যে নিকৃষ্ট মানের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে অচিরেই ইলেকট্রনিক সিস্টেমের দফারফা হবে। অথচ জাপানি পদ্ধতি সব চেয়ে ভাল, তা ব্যবহার করা হয়েছে হাতে গোনা ক'টি মাত্র ক্ষেত্রে। ফ্রান্সের কন্সেল জেনারেল শৈলেনবাবুকে বলেছেন, ওই রদ্দি মাল ফ্রান্স নিজেই ব্যবহার করে না। শৈলেনবাবু এই ব্যবস্থার প্রতিকার চেয়েছেন।

তাজ বেঙ্গল

উগ্রপন্থার ফন্দি ফিকির

পঞ্জাব থেকে কাশ্মীর অথবা অসমের কিছু উগ্রপন্থী বর্তমানে নানা ফন্দি ফিকিরে অথবা নিরাপদ আশ্রয় মনে করে কলকাতাকে বেছে নিতে চাইছে। এ ব্যাপারে অবশ্য গোয়েন্দা পুলিশের সতর্কতায় ঘাটতি নেই। ওই উগ্রপন্থীরা মোটা টাকা খরচ করে কলকাতার বিভিন্ন পাঁচ তারা হোটেলে থাকছে তার-পর পালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি কলকাতায় সদ্য নির্মিত পাঁচ তারা হোটেল তাজ বেঙ্গলের পিছনের গেটে দুজন কাশ্মীরি যুবক হোটেলের এক কর্মচারীর কাছ থেকে হোটেলটি সম্পর্কে নানা খোঁজ খবর নেয়। তারা গুপ্ত পথে এই হোটেলে ঢোকার জন্য এই কর্মীটিকে মোটা বক-শিসের লোভও দেখায়। কর্মীটি এই প্রলোভনে না ভুলে ঘটনাটি হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছে জানাতে গেলে যুবক দুটি গা ঢাকা দেয়। সন্দেহ করা হয় ওই দুই যুবক কাশ্মিরী উগ্রপন্থী।

মহাকরণ

অর্থদপ্তরের লুকোচুরি

কারা ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী বছর খানেক ধরে তার নির্বাচনী এলাকা পশ্চিমদিনাজপুরের বালুরঘাটে একটি অনাথ আশ্রম খোলার চেষ্টা করছেন। রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাবটি এলে তাঁকে জানান হয়, এটি অত্যন্ত উত্তম প্রস্তাব ও বামফ্রন্ট সরকারের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশ্বনাথবাবু উৎসাহী হয়ে এটি অনু-মোদনের জন্য অর্থ দপ্তরের কাছে নোট পাঠান। এরপর বারে বারে অর্থ দপ্তর বিশ্বনাথবাবুর কাছে নানান ক্ল্যারিফিকেশন চাইতে থাকেন। তাদের কথা মত কাজ করেও অর্থ দপ্তরের অনুমোদন পাওয়া যায় না। এরপর বিশ্বনাথবাবু খোদ অর্থমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানালে, তিনি বলেন, এমন হবার তো কথা নয়। আমি অবিলম্বে অনুমোদনের ব্যবস্থা করছি। এর ক'দিন পরেই বিশ্বনাথবাবুকে অর্থদপ্তর জানায়, প্রকল্পটি লাভজনক হবে না, তাই অনুমোদন দেওয়া গেল না। বিশ্ব-নাথবাবু হতবাক। অনাথ আশ্রম ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয় যে লাভ–লোকসানের কথা উঠবে। ক্ষিপ্ত বিশ্বনাথবাবু বলেন, আমি সব ব্যাপারটা সংবাদপত্রকে জানাব। ক'দিন পরেই অসীমবাবু বিশ্বনাথবাবুকে জানান, আপনার প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।

চন্দন নিয়োগী ও গুরুপ্রসাদ মহান্তি

শ্রাবন্তী মজুমদারের 'ওয়েলকাম'

আধুনিক বাংলা গানের জগতে শ্রাবন্তী মজুমদার একটি পরিচিত নাম। কুড়ি বছর ধরে গান গাইছেন শ্রাবন্তী। ১৯৬৯ সালে তাঁর প্রথম রেকর্ড বের করেন 'লিভিং সাউণ্ড'। তারপরই প্রস্তাব আসে এইচ এম ভি থেকে। ১৯৭০ সালে প্রথম এইচ এম ভি থেকে রেকর্ড বেরোয়।

ছেলেবেলা থেকেই গান সম্বন্ধে উৎসাহী শ্রাবন্তী। পড়াশোনার পাশাপাশিই চলত গান বাজনার চর্চা। পাঁচ বছর বয়স থেকে গান শিখেছেন সুধীর মুখোপাধ্যায়ের কাছে। এছাড়াও ছাত্রী ছিলেন মুনাব্বর আলি, মায়া সেন আর সুধীন দাশগুপ্তের। শিখতেন মূলত মার্গ সঙ্গীত। তাই বাড়ির বাইরে কোন অনুষ্ঠানে গান গাইবার অনুমতি ছিল না। এমন কি স্কুল কলেজের বন্ধুরাও জানতেন না গান গাওয়ার কথা।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে শিল্পী হিসাবে গানের জগতে এসে শ্রাবন্তী যে গান গেয়েছেন তার সঙ্গে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কোনরকম সম্পর্ক নেই। তাঁর প্রথম গানটিকে এইচ এম ভি বলেছিল পপ, তারপর থেকে শ্রাবন্তীর ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁর প্রায় সব গানই পপ নামে পরিচিত। পঞ্চাশের দশকে সলিল চৌধুরী কাহিনীমূলক গানের প্রচলন করেন। হেমন্তের গলায় গাওয়া 'রানার' বা 'পাল্কির গান' এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই ধরনের গানের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকার দরুন সত্তরের দশকে পপ মিউজিক এই ধরনের কাহিনীমূলক, দীর্ঘ গানের ধারাকে গ্রহণ করে। শ্রাবন্তীর প্রথম গান 'আমি একটি ছোট্ট বাগান করেছি' মূলত এই ধাঁচের। তবে এই ধরনের গানের সুরের যে আবেদন বা যে কাব্যিক মূল্য আগে ছিল তা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে গেছে। জায়গা নিয়েছে অশ্লীল কথা আর চটুল সুর।

ভি· বালসারার দেওয়া সুরেই তাঁর জীবনের প্রথম গানটি গেয়েছিলেন শ্রাবন্তী। এখনও পর্যন্ত তাঁর সুরে গাওয়া গানের সংখ্যাই সবথেকে বেশি। ভি· বালসারা যে শুধু তাঁর গানের সুরকার তাই নয়, তাঁর কাছ থেকে তিনি শিখেছেন গানকে ভাল করে তোলার বহু খুঁটিনাটি বিষয়। শ্রাবন্তী গান গেয়েছেন বাপি লাহিড়ীর সুরেও। কিন্তু সৌভাগ্য হয়নি রাহুল দেববর্মনের সুর দেওয়া কোন গান গাওয়ার। অথচ শ্রাবন্তীর কাছে তিনি একজন অত্যন্ত উঁচুদরের সুরকার। সত্যিকারের শিল্পী। তাঁর সুরে গান গাওয়াকে তিনি নিজের সৌভাগ্য বলে মনে করেন।

শ্রাবন্তী মনে করেন আধুনিক বাংলা গানের মান ক্রমশ নেমে যাচ্ছে। আগে সুন্দর লিরিক, –নিখুঁত সুর ও ছন্দের ব্যবহারে গান হয়ে উঠত। তাঁরা যাঁদের দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন সেই গীতা দত্ত, সন্ধ্যা মুখার্জি, মহম্মদ রফি বা হেমন্ত মুখার্জি–এই ধরনের গানই গাইতেন। কিন্তু আজকের শিল্পী অনেকখানিই পরিস্থিতির শিকার। সাধারণ মানুষ উঁচু মানের গান চায় না, চায় জনপ্রিয় গান অর্থাৎ চটুল উত্তেজক সঙ্গীত। তাই ভাল গান গাইলেও বিক্রির অভাবে তার প্রচার হয় না। 'তাছাড়া আজকাল তো আর রেকর্ডই হয় না, হয় ক্যাসেট। ক্যাসেটে গান স্থায়ী হয় না। ভাল করে বোঝা যায় না। আর রেকর্ড শুধুমাত্র রেডিওতেই ব্যবহার হয়। তাই বাধ্য হয়ে ক্যাসেটই করছেন শিল্পীরা। জীবনযাত্রার যে মান তাঁরা বেঁধে ফেলেছেন তাকে অটুট রাখতে নামাতে হচ্ছে শিল্পের মান। অন্যদিকে আবার মানুষের রুচির যে অবনতি ঘটেছে তাও খুব অস্বাভাবিক কোন ঘটনা নয়। আজ থেকে দশ পনের বছর আগে মানুষ তার জীবনসংগ্রামের মধ্যেও একটু ফাঁক পেত বিনোদনের জন্য। সেইটুকুতেই গড়ে উঠত একটি রুচিশীল মন। কিন্তু আজ আর সেই সময়টুকুও সে দিতে পায় না। তাই তার দরকার অস্থির উত্তেজনা। গানকেও তাই হয়ে উঠতে হচ্ছে এই ধাঁচের। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিই শিল্প ও শিল্পীর মানের অবনমনের জন্য দায়ী।

শ্রাবন্তী প্রথম গান গেয়েছিলেন ফরোয়ার্ড ক্লাবের অনুষ্ঠানে। তখন তিনি কিশোরী। দুরুদুরু বুকে স্টেজে উঠেছিলেন। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানের পর তাঁকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয় নি। তারপর বহু জায়গায় গান গেয়েছেন, কিন্তু স্মরণীয় হয়ে আছে মাত্র একটিই। ১৯৭৮ সালে বন্যাত্রাণে সাহায্য করার জন্য নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে একটি বাংলা আধুনিক গানের সান্ধ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাতে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত শিল্পী উপস্থিত ছিলেন এবং প্রত্যেকে দুটি করে গান গেয়েছিলেন। তখনও বেঁচে ছিলেন উত্তমকুমার, ছিলেন হেমন্ত মুখার্জি। সকলের উপস্থিতিতে সন্ধ্যাটি হয়ে উঠেছিল অনুপম।

–দীপান্বিতা রায়।

পাপেট থিয়েটার : সুরেশ দত্ত

দৌড়-দৌড়-দৌড়। জীবন-পণ দৌড়। এই বুঝি প্রতিমা ভাসান দিয়ে চলে গেল সবাই। গ্রামের পথ বরাবর নদীতে প্রতিমা নিয়ে যাবার সময়ে ঢাকঢোলের বাজনা কান পেতে শুনেছে কিশোরটি। এবার নদীর ঘাটে এসে দে ডুব টপাং টপাং। বিশালায়তন মেড় থেকে প্রতিমার মুখটি যে তাকে খুঁজে পেতেই হবে। মুক্তো সন্ধানীরা সমুদ্রের তলদেশে ডুব দিয়ে মুক্তো খোঁজে, কিশোরটি শুধু খোঁজে প্রতিমার মুখ। তাই-ই তার কাছে মুক্তোর চেয়ে দামী। কারণ সাজ সুদ্ধ মুখটিকে উদ্ধার করে আনবার পর মায়ের কাপড় জড়িয়ে পুতুল বানিয়ে কেমন নাচ দেখানো যায় সকলকে। তাক লেগে যায় সবার। অথচ আত্মীয় স্বজনদের কাছে ছেলেটি হাড়বিচ্ছু। প্রত্যেকের নাভিশ্বাস উঠেছিল এই বলে; এ ছেলে গোল্লায় গেল, কিছু করতে পারবে না জীবনে। অথচ এই বরবাদে যাওয়া কিশোরটিই একদিন স্বক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলেন। শুধু ক্যালকাটা পাপেট থিয়েটারের প্রাণ পুরুষই নয়, পুতুল নাচের ইতিহাসে সেদিনের কিশোর সুরেশ দত্ত নিজেই এক যুযুধান পরম্পরা।

বাংলাদেশের সবুজ জল হাওয়ায় কিশোর সুরেশ তরতর করে বেড়ে উঠছিলেন। অবশ্য সে বেড়ে ওঠা আর পাঁচজন কিশোরের মত নয়। নয় এইজন্য, অন্যরা যা ভালবাসত, যা করত, কিশোর সুরেশ তা আদপেই ভালবাসত না। আবার সুরেশ যা করত সাধারণত কোন ছেলেই সেসব করার কথা চিন্তা করতে পারত না। বাবা ব্যস্ত থাকতেন ফার্নিচারের ব্যবসাতে। মা নিতান্ত গৃহিণী। সুতরাং অভিভাবকের শাসন এড়িয়ে সুরেশ নিজের বৈশিষ্ট্যে বেড়ে উঠছিলেন। পাড়া চষে বেড়াতেন। মত্ত থাকতেন কৃষ্ণগানের পালার অনুকরণে

এ-ই যদি হয় ভিড়
তবে বিনসর তা সারা বছর ধরে রাখে
এমনকি জমজমাট সময়েও

বিনসর। ছোট্ট এক জায়গা, যার কথা প্রায় মনেই পড়ে না। কোলাহলমুখর পথের বাইরে। সেখানে কদাচিৎ কেউ যান। জীবনযাত্রা সেখানে একটুও ব্যস্তসমস্ত নয়, তাই মানুষজনের এখনও সময় আছে দাঁড়িয়ে পড়ে দু'দণ্ড গল্প করার। ওক আর রডোডেনড্রনের ঘন বনের কোলে এই বিনসর আলমোড়া থেকে মাত্র ৩০ কিঃ মিঃ দূরে। দিল্লি থেকে সড়কে আলমোড়া যেতে লাগে মোটামুটি ৯ ঘণ্টা। নিকটবর্তী রেল স্টেশন কাঠগোদাম। আলমোড়া থেকে বাস-এ অথবা ট্রেক করেও আপনি পৌঁছে যেতে পারেন বিনসর। সেখানে পাবেন ৪০-শয্যার আরামদায়ক টুরিস্ট বাংলো, সঙ্গে আ-লা-কার্ট রেস্তোরাঁ সার্ভিস। তুষার-চূড়া দিয়ে ঘেরা এই বিনসরে পাবেন চোখ জুড়িয়ে দেওয়ার মতো অনেককিছু।

কাছেই আছে কৌসানি, যার সৌন্দর্যের প্রশংসায় কবি ও দার্শনিকেরা সতত উচ্ছল। আর তা ত্রিশূল-নন্দাদেবী পর্বতমালার এত কাছে যে, আপনার মনে হবে ইচ্ছে করলেই তুষার ছোঁয়া যায়।

যাগেশ্বর হল শিবের ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গের একটি, বৈজনাথের খ্যাতি-শিখর স্টাইলের মন্দির-শোভিত ছবির মতো এক শহর হিসেবে। কাতারমল এক বিশিষ্ট পিকনিক স্পট, সেখানে দর্শনীয় সুন্দর একটি সূর্য মন্দিরও আছে। এ-ছাড়া আছে বাগনাথ মন্দির ও পুরোনো ভাস্কর্যশিল্পের জন্য বিখ্যাত জায়গা বাগেশ্বর। —বিনসরে থাকাকালীন এ-সবই আপনার দর্শনীয় স্থানের মধ্যে পড়ছে।

তাই আগামী ছুটিতে চিরাচরিত ভ্রমণপথের বাইরে বেরিয়ে পড়ুন—চলুন বিনসরে। আর এমন এক উত্তরপ্রদেশকে আবিষ্কার করুন, যার কথা খুব কম লোকেই জানেন।

UPT ইউ পি টুরিজম

চন্দ্রলোক বিল্ডিং, ৩৬, জনপথ
নয়াদিল্লি ১১০ ০০১। ফোন : ৩৩২২২৫১

এছাড়া —
আমেদাবাদ — ফোন : ৪৬৪৩১৮
বমবে — ফোন : ২১৫৪৯৭
কলকাতা — ফোন : ২০৭৮৫৫
চণ্ডীগড় — ফোন : ৪১৬৪৯,
লখনৌ — ফোন : ২৪৬২০৫,
মাদ্রাজ — ফোন : ৪৭৯৭২৬

HOLIDAY WONDERLAND UTTAR PRADESH

F.N/XIII-950

ছবি: প্রশান্ত কুমার কুণ্ডু

নিজে অভিনয় করায়। তখন বয়েস বা কত, বড় জোর আট, নয়। ধুতি পাঞ্জাবি পরে, পান চিবিয়ে, সে কি অভিনয়ের বহর! আপন মনে গান গেয়ে বেড়াতেন সুরেশ, হাতে গড়তেন পুতুল। ছবি আঁকার দিকে ছিল অসম্ভব রকম ঝোঁক।

ততদিনে যুদ্ধ লাগছে। সুরেশকে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে আসতে হল কলকাতায়। পরিবারের অন্য সকলের সঙ্গে। হাজাররকম পারিবারিক ঝামেলা এল। পড়াশুনো এগোল না। এখানে আসার পরও কিন্তু সুরেশের শিল্পী মন অন্য কোন কিছুতে মজলো না। যোগ দিলেন সি·এল·টি·তে। শিশুদের থিয়েটারের মঞ্চ, আবহ তৈরির কাজে লাগালেন নিজেকে।

সি·এল·টি·তে যোগ দিলেও সুরেশের মনের মধ্যে সৃষ্টিশীল চেতনাটি সব সময়েই নতুন কিছু করার জন্য ছটফট করছিল। আর সেই মানসিক অস্থিরতাই সুরেশকে এগিয়ে দিল বিশিষ্ট এই শিল্প পাঠ্যক্রমের দিকে। তৈরি হল ক্যালকাটা পাপেট থিয়েটার। সেটা ১৯৭৩ সাল। কিন্তু তারও আগে ১৯৬০-৬২ সাল থেকেই সুরেশ পাপেট শো করতেন। রামায়ণের কাহিনীগুলিকে ছোটদের উপযোগী করে মঞ্চে আনবার ক্ষেত্রে সুরেশ নিজেই একটি দৃঢ় স্তম্ভ। সুরেশ তার পুতুল নাচকে দু'ভাগে ভাগ করেন—একটি হল ট্রাডিশনাল অন্যটি নন-ট্রাডিশনাল। দেশে বিদেশে পাপেট শো করে তিনি অনুভব করেছেন পাপেট একটি উল্লেখযোগ্য মাসমিডিয়া। এটির সাংস্কৃতিক গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গে একটি শিক্ষামূলক মূল্যমানও জড়িয়ে রয়েছে যা শিশু থেকে বৃদ্ধ প্রত্যেককে আনন্দ দেবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত করে তুলতে যথেষ্ট সহায়ক।

ভারতীয় পাপেটের উপর দীর্ঘ গবেষণার ক্ষেত্রেই নয়, সুরেশ নিজস্ব চিন্তাভাবনার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির সুচারু সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। হরিয়ানায় শো করার সময়ে তিনি কৃষি বিপ্লবের উপর একটি কাহিনী বেছে নিয়েছিলেন। ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদে শো করার সময়ে নজর রেখেছেন যাতে দাক্ষিণাত্যের সাংস্কৃতিক আবহটিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা যায়। আবার বীরভূমের আদিবাসী মহল্লায় যখন তিনি শো করেন, তাঁর লক্ষ্য থাকে নাগরিক আলোক থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষগুলির মধ্যে শিক্ষার বীজ বপন করা। খোদ মহানগরে যখন তিনি শো করেন তার অনুষ্ঠানে নাগরিক প্রাণের স্পন্দনটি অটুট ধরা থাকে।

শুধু ভারত নয়, পোলাণ্ড থেকেও তাঁর আমন্ত্রণ এসেছিল শো করবার জন্য। দলবল নিয়ে তিনি শো করে এসেছেন সেখানে।

মূকাভিনেতা যোগেশ দত্তর দাদা সুরেশ নিজের ক্ষেত্রে শুধু বিশিষ্টই নয়, পুতুল নাচের ইতিহাসে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজের নাম সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ভারত জুড়ে বহু পাপেট থিয়েটার গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ ঘটলেও সুরেশ ক্যালকাটা পাপেট থিয়েটারকে বিপুল প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও যে মানে তুলে দিয়েছেন, তা অভাবনীয়।

গুরুপ্রসাদ মহান্তি।

সারেঙ্গীর সঙ্গত: মহম্মদ সাগিরুদ্দিন খান

সঙ্গীতের মাধুর্য চিরকালই মানুষের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে। পৃথিবীর সব জায়গাতেই তার জয় জয়কার। সঙ্গীতের আবার বিভিন্ন ঘরানা। যাঁরা ধ্রুপদী বা মার্গ সঙ্গীত চর্চা করেন তাঁরা এর মধ্যেই এক গূঢ় রসবোধ উপলব্ধি করেন।

বাবা হাজি টুণ্ডে খান ও দাদা ওয়েসি খান-এর প্রেরণায় শৈশব থেকেই ধ্রুপদী সঙ্গীতের প্রতি এক নাড়ীর টান অনুভব করেছিলেন। এঁরাই ছিলেন শিল্পীর শৈশবের গুরু।

ছেলেবেলা থেকেই সঙ্গীতের প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখে বাড়ির লোকজনেরা উৎসাহিত হন। তাঁরাই আন্তরিকভাবে সঙ্গীতের নানা দিক নিয়ে আলোচনা, পরামর্শ সেই সঙ্গে উৎসাহ দিয়ে গেলেন ধাপে ধাপে। ভোকাল ও ইনস্টমেন্ট একই সাথে দুই সত্ত্বা সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে এগিয়ে চলল।

কৈশোরের শেষ ধাপে বুকের মধ্যে কোথায় যেন শূন্যতা অনুভব করলেন। সব কিছু থেকেও যেন কি নেই। এই অতৃপ্তি থেকেই সম্ভাবনাময় কিশোর নতুন কিছু করার সংকল্প নিল। কিন্তু কিছুতেই তার বাস্তব রূপায়নের পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। ছুঁতে পারছেন না তাঁর সেই শিল্পী মনকে। এই অস্থিরতার মাঝে একদিন নিজের মনের গোপন কথা খুলে বললেন বাড়ির অভিভাবকদের কাছে। তাঁর এই অভিপ্রায়ে সকলেই মুগ্ধ। বাবা অনুমতি দিলেন। সাগিরুদ্দিন চলে গেলেন দিল্লি। ওস্তাদ বুন্দু খান সাহেবের কাছে তালিম নিতে। তখন তাঁর বয়স ১৫/১৬র মত। এই অল্পবয়সে তিনি ওস্তাদের অন্যতম প্রিয় শিষ্য হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে সাগিরুদ্দিন সাহেবও তাঁর সমস্ত স্বপ্নকে সফল করার লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে চললেন। রেওয়াজ শুধুই রেওয়াজ। কখনও কখনও ধ্যান মগ্ন হয়ে পার্থিব সব কিছু ভুলে যেতেন। শিল্পের প্রতি এই অকৃত্রিম ভালবাসাই তাঁকে বড় হতে সাহায্য করেছে। মার্গী বা ধ্রুপদী সঙ্গীতে একাত্ম হওয়ার ফলেই সাগিরুদ্দিন খান তাঁর স্বার্থক শৈল্পিকতার নিপুণ সাক্ষ্য রাখতে পেরেছেন সঙ্গীতপ্রেমীদের কাছে।

দীর্ঘ ৪৫ বছরের কর্ম জীবনের অবসান ঘটে ১৯৮৫তে। তার কিছু আগেই শিল্পী সারেঙ্গী থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেন। এর পেছনে হয়ত কোথাও কোন ক্ষোভ লুকিয়ে আছে। কিন্তু তা তাঁর একান্তই ব্যক্তিগত। বর্তমানে উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ সঙ্গীতের প্রতিই নিজেকে আবর্ত রেখেছেন। নিজস্ব অনুশীলনের বাইরে বেশ কিছু ছাত্রছাত্রীকেও তৈরি করছেন।

ভারতবর্ষের ধ্রুপদি সঙ্গীতের কিংবদন্তী শিল্পী পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, হিরাবাঈ, আবদুল করিম খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, আমির খাঁ, বেগম আখতার, মানিক ভার্মা, ভীমসেন যোশী, গিরিজা দেবী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, বি ডি পালুসকর থেকে শুরু করে মহম্মদ রফি, সন্ধ্যা মুখার্জী, ফিরোজা বেগম এই সমস্ত কালজয়ী শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর শিল্প-শৈলীর প্রকাশ ঘটিয়েছেন বহুবার বহু অনুষ্ঠানে।

তাঁর শিল্প মহিমা বাংলা চলচ্চিত্র জগতেও বিশেষ সমাদৃত হয়েছে। যে সমস্ত চলচ্চিত্র শিল্পীর শিল্পকলার সাক্ষ্য বহন করে সেগুলি হল—ক্ষুধিত পাষাণ, লাল পাথর, যদুভট্ট, হেডমাস্টার, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, স্ত্রী, বসন্তবাহার প্রভৃতি।

উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসিতে জন্মেও তিনি আজ কলকাতা শহরকে আপন করে নিয়েছেন। চার যুগেরও বেশি সময় ধরে এই কলকাতাতেই তাঁর শিল্পের উত্তরণ ও খ্যাতি। সব কিছুকে আন্তরিকভাবে ভালবাসার ফলে বিদগ্ধ শিল্পীর কাছে আজ কিছুই হতাশার নয়। বরং অনেক বেশি আবেশে জড়ানো। ধ্যানস্থ শিল্পী শুধুমাত্রই সুরকে অবলম্বন করে হয়ত নতুন কোন সুরকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তা একমাত্র যিনি টের পেতে পারেন তিনি হলেন তাঁরই সহধর্মিনী বেগম সাজেদা খান।

আবদুল কাইউম।

মোহনবাগানের 'মিল্লা': সুব্রত ভট্টাচার্য

শতবর্ষ পেরিয়ে আসা মোহনবাগান ক্লাবের ঐতিহ্যের ইতিহাসে যে নামটি এবার সংযোজিত হল তিনি শ্যামনগরের বাবলু, ময়দানের ডাকসাইটে ফুটবল যোদ্ধা সুব্রত ভট্টাচার্য। জনপ্রিয়তার শীর্ষমুখী চরিত্রটিতে বিচিত্র গুণাবলীর বর্ণসমাবেশ। সুদীর্ঘ খেলোয়াড় জীবনে কখনো বিতর্ক কখনো খ্যাতির বন্যা। মানুষ সুব্রত আর খেলোয়াড় সুব্রতের আশ্চর্য জীবনচর্যা উঠে এসেছে প্রতিবেদনটিতে।

সুব্রত ভট্টাচার্য: মাঠের মহানায়ক

লম্বায় পাঁচ ফুট সাড়ে এগার ইঞ্চি। মেদহীন পেটান চেহারা। মাথায় অল্প কালো কোঁকড়ান চুল। দেহের থেকে অপেক্ষাকৃত চোখ দু'টো ছোট। লম্বা মুখ, শক্ত চিবুক। গায়ের রঙ শ্যামলা। হাসলে দাঁতগুলো রূপোর মত চকচক করে ঝিলিক দেয়। স্বভাবে পরস্পর বিরোধী দু'টো সত্তা বিদ্যমান। একাধারে প্রচণ্ড অভিমানী, বদরাগী, দুর্মুখ। আবার অন্য সময়ে অত্যন্ত ভদ্র, বিনয়ী, পরোপকারী। এই মানুষটি আজ থেকে প্রায় আটত্রিশ বছর আগে কলকাতা থেকে কিছু দূরে উত্তর চব্বিশ পরগণার শ্যামনগরে জন্ম নেন। ভট্টাচার্য পরিবারে। ডাক নাম বাবলু। এই আদুরে বাবলুর পোশাকী নাম সুব্রত। সুব্রত ভট্টাচার্য। ছোটবেলা থেকে স্পষ্টবাদী এবং সাহসী। তবে মনের দিক থেকে ভীষণ নরম প্রকৃতির। ফলে বাড়ির মানুষজন কখনও কখনও অনুশাসন করলেও বাবলু ওরফে সুব্রতর মেজদা রথীপ্রকাশ ভট্টাচার্য সব সময় এক বিশেষ স্নেহাদর দিয়ে আগলে রাখতেন। এমন কি পরিবারের কাউকে তেমন কোন কঠিন শাসন করতে দিতেন না। এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে অনেক সময় বাকবিতণ্ডাও বেধেছে।

শৈশব থেকেই সুব্রত কিছুটা জেদী হলেও পড়াশুনায় ভালই ছিলেন। কিন্তু ক্লাস এইটে অনুত্তীর্ণ হবার ঠিক পর থেকেই বাবলুর মাস্টার মশাই ('কান্তিচন্দ্র স্কুল' এর এক শিক্ষক)—এঁর সঙ্গে সম্পর্কটা গাঢ় হল। তিনি প্রকৃত শিক্ষা গুরুর মত কাছে টেনে নিলেন। এবং বাবলুর পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় কিছুটা অভিভাবকের ভূমিকা নিলেন। কাছে ডেকে নিয়ে একদিন মাস্টারমশাই বললেন, 'পড়াশোনায় তো ভালই ছিলে সেটা নষ্ট করছ কেন?' তারপর থেকেই মাস্টারমশাই—এঁর বাড়িতে যাতায়াতের পথটা প্রশস্ত হল। উনিও বিশেষ ভাবে নজর দিলেন ছাত্রের প্রতি। সব মিলিয়ে মিশিয়ে প্রস্তুত হলেন প্রাইভেটে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার জন্য। পাশও করে গেলেন। এরই ফাঁকে খেলাধূলায়ও অনেকটা নিজেকে গড়ে তুলেছেন বাবলু।

শৈশব থেকেই ফুটবলের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও আগ্রহ ছিল। কৈশোর থেকেই ফুটবল খেলাকে ঘিরে স্বপ্ন দেখতেন। প্রথম ময়দানে কেষ্ট মিত্রের খেলা দেখে অনুপ্রাণিত হন। যিনি এখন একমাত্র প্রিয় বন্ধুর তালিকায়। কৈশোর থেকে যখন যৌবনে পা রাখলেন তখন সমস্ত সোনালী স্বপ্নগুলোকে ঘিরে বাঁচার, বড় হওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে যোগ দিলেন স্থানীয় ক্লাব 'যুগের প্রতীক'—এ। জেলা স্তরের এই ক্লাবটির তখন বেশ সুনাম। সালটি ছিল ১৯৬৬। বড় দলে প্রথম খেলার অভিজ্ঞতা ওই বছরই। জীবনের প্রথম খেলাতেই একটা গোলও করেছিলেন শ্যামনগরের অখ্যাত এই ফুটবলারটি। তখন অবশ্য ফরোয়ার্ড পজিশনে খেলতেন। তারপর ধীরে ধীরে বাবলু হয়ে উঠলেন গড়ের মাঠের ফুটবল তারকা সুব্রত ভট্টাচার্য। সেই ইতিহাসের পাতা নিশ্চয় আমরা উল্টে দেখব।

বাবলুর প্রথম পর্বের প্রশিক্ষক মুরারী শূরও মনে করেন, 'বাবলু ওরফে সুব্রত হল সৎ, উচিত-বক্তা। যদিও তার চরিত্রে জেদী মনোভাবটা মাঝে মধ্যে চাড়া দিয়ে ওঠে। তবুও বলব, ও উগ্র সুন্দর।' ফুটবল প্রশিক্ষক শূর তাঁর জীবনের এমন একটি উল্লেখযোগ্য ফুটবলারকে তৈরি করতে পেরে আত্মতৃপ্ত। এখনও 'যুগের প্রতীক' ক্লাবকে ঘিরে মুরারীবাবুর অনেক স্বপ্ন। কারণ তিনিই তো আন্তরিক প্রচেষ্টা দিয়ে এই ক্লাব থেকেই গড়েছেন আজকের দুঁদে সুব্রতকে। তাঁর প্রশিক্ষণের ধারা এবং ফুটবল কৌশল—এর পাঠ জলের মত সরল। অনুশীলন, অনুশীলন আর অনুশীলন। এই নির্দেশ যথাযথ পালন করেছে বলেই আজ সুব্রত কাগজের শিরোনামে উঠে এসেছে। কখনও প্রশংসা আবার কখনও তিরস্কার। কিন্তু যিনি প্রথম জীবনের শিক্ষাগুরু তাঁকে অস্বীকার করার মত স্পর্ধা দেখাতে সাহস পান নি সুব্রত। এখনও পর্যন্ত এক মধুর সম্পর্ক বজায় আছে গুরু—শিষ্যের মধ্যে। শহর কলকাতায় থাকলেও সপ্তাহে ছুটে যান শ্যামনগরের বাড়িতে বাবা-মা, দাদা, ভাই, বোনদের মাঝে। সারাদিন কাটিয়ে ফিরে আসেন রাত্রিতে। এরই ফাঁকে ছোটবেলার বন্ধু, গ্রামবাসী, আত্মীয়স্বজন ও অনুরাগীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটান। স্থানীয় ক্লাব, স্কুল, সমাজ কল্যাণমূলক

প্রতিষ্ঠানের নানা সমস্যার সমাধানের আন্তরিক প্রয়াস শ্যামনগরের মানুষের কাছে প্রেরণার বিষয়।

এই শ্যামনগর থেকে উঠে এসেছেন বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। এঁরা হলেন কেষ্ট পাল, মহাবীর প্রসাদ, অশোক লাল ব্যানার্জি, প্রশান্ত মিত্র থেকে এই সময়ের প্রিয় গোপাল গোস্বামী, সুমিত মুখার্জি। কিন্তু প্রায় বাইশ বছর আগে উঠে আসা শ্যামনগরের এই চরিত্রটি একটু আলাদা। বহুমুখী চরিত্রের নায়ক সুব্রত ভট্টাচার্য অনেকের কাছে প্রিয়। বলতে দ্বিধা নেই ময়দানের বিতর্কিত এক ফুটবল প্রহরী।

খেলাধূলার বাইরেও তাঁর কাছে আসেন শ্যামনগরের মানুষজন। কখনও চাকরির জন্য, কখনও হাসপাতালে ভর্তির ব্যাপারে। কখনও বা মন্ত্রীর কাছে তদ্বির করতে। তাঁদের কাছে বাবলুই ভরসা। হোক বা না হোক শেষ অবধি লড়ে যান বাবলু। যেমন করে প্রাণ লড়িয়ে দেন খেলার মাঠে।

লড়াকু-মেজাজের রক্ষণ ভাগের অতন্দ্র প্রহরী সুব্রতর ভাষায়, 'খেলাধূলা ভালবাসি কারণ খেলোয়াড় বলে। যদি খেলোয়াড় না হতাম হয়ত বেঁচে থাকার তাগিদে শ্রমিক হতে পারতাম।' সুব্রত সম্পর্কে বিচিত্র অনুভূতি অনেক ক্রীড়া প্রেমিকের মধ্যেই রয়েছে। সেটা কখনও দুঃখের, কখনও হাসির, আবার কখনও শ্রদ্ধার এবং কখনও হতাশার। কিন্তু কেন? বড় মাপের একজন ফুটবলার তিনি। নিজে যে ক্লাবে খেলেন সেই ঐতিহ্যশালী মোহনবাগানের আর এক খেলোয়াড়ের চরিত্র নিয়ে এমত বিতর্কে, সংঘাতে জড়িয়ে ফেলে নিজের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলতে গেলেন কেন?

সুব্রত যে বড় মাপের, বড় জাতের ফুটবলার এ বিষয়ে অতি বড় নিন্দুকও বোধহয় দ্বিমত হবেন না। একজন বড় মাপের ফুটবলার হতে হলে যে যে গুণাবলীর প্রয়োজন তার সবগুলোই আছে সুব্রতর মধ্যে। যেমন অসাধারণ অনুমান ক্ষমতা ও দক্ষতা, চমৎকার হেডওয়ার্ক, প্রচণ্ড সাহস ও আত্মপ্রত্যয়। এরপরেও যেটা আছে সেটা হচ্ছে 'লিডারশিপ কোয়ালিটি'। আর একটা বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী, তাহল নিজে ভাল খেলে সহ-খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা। যেটা শুধু ফাঁকা বুলি দিয়ে হয় না। শুধু তাই নয়, অনুশীলনে আন্তরিক উৎসাহ ও নিষ্ঠা। সাথে সাথে নিজেকে সব সময় 'কণ্ডিশনে' রাখবার প্রচেষ্টা। যেটা না হলে বয়সের সাথে সাথে নিজের ফর্মকে এতদিন ধরে রাখা যায় না। গত দুই দশক গড়ের মাঠের বহু যুদ্ধের নায়ক ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য তাঁর ক্রীড়ানৈপুণ্যের প্রশংসায় মুখরিত সবাই, অথচ তাঁর খেলোয়াড়ী জীবন এত বিতর্কিত, এত জটিল সমস্যায় জর্জরিত কেন?

সুব্রতর বাইশ বছরের খেলোয়াড়ী জীবন নানা বিশেষণে ভূষিত। কারুর মতে ও দলের ক্যান্সার তাই ছেঁটে ফেলা দরকার। আবার অনেকে মনে করেন ময়দানের মহানায়ক। অন্যদিকে সংবাদপত্রের খ্যাতিমান সাংবাদিকদের মতামত—সুব্রতর নিটোল, নির্ভেজাল ক্লাব প্রীতির আড়ালে রয়েছে একটা কৃত্রিমতা এবং ভণ্ডামি। তাঁর ক্লাবপ্রীতি নাকি একটা মুখোশ যাকে সামনে রেখে সুব্রত নিজের আখের গুছিয়ে নিচ্ছে। আবার কেউ কেউ বলেন ক্লাব প্রেমকে পণ্য করেছে বাবলু। এমন কি মূল্যবোধ, ন্যায়নীতি, আদর্শের প্রশ্নও উঠেছে সুব্রতকে ঘিরে। এইসব মন্তব্যের সত্য মিথ্যে যাচাই না করেও বলা যেতে পারে যে সত্তর সাল থেকে কলকাতার মাঠে মাথা উঁচু করে লড়াকু মনোভাব নিয়ে নিজের খেলোয়াড়ী জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার দুঃসাহস সুব্রতরই আছে। তারও কয়েক বছর আগে শৈশবের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে আবির্ভাব হয়েছিলেন এই ফার্স্ট ডিভিশন খেলায়। তারপর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে সেই তখন থেকে আজ নব্বুই সাল পর্যন্ত টানা বাইশ বছর ধরে ময়দান, দেশ, বিদেশে খেলা অবশ্যই একটা ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। এই কৃতিত্বের দাবি বাংলার গুটি কয়েক ফুটবলার অর্জন করতে পেরেছেন বললে বোধহয় ভুল বলা হবে না।
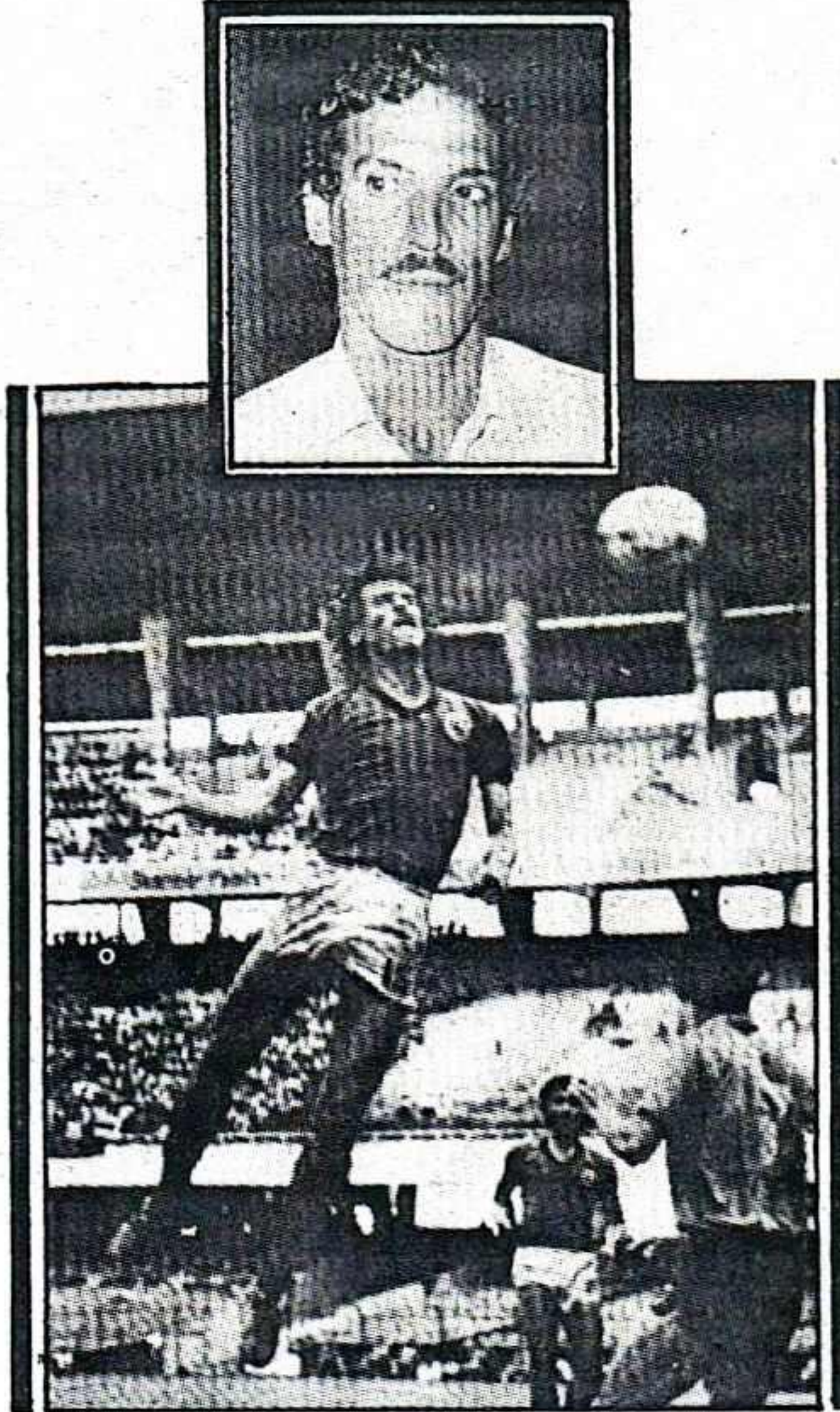
স্থির লক্ষ্যে

এক সময়ের বিশিষ্ট খেলোয়াড় এবং এই সময়ের উল্লেখযোগ্য কোচ পি·কে ব্যানার্জির কথায়, সুব্রত ভাল কথা বলতে পারেন, মিশতে পারেন সকলের সঙ্গে। সেই সঙ্গে ওঁ মানুষের এত উপকার করেন যা ভাবাই যায় না। এই এত গুণের ফলেই সুব্রত আজকে এমন স্তরে পৌঁছে গেছেন, তাতে ওঁকে নিয়ে আলোচনা করাটাই তো স্বাভাবিক। আজ থেকে প্রায় সাতাশ আটাশ বছর আগে এগার বারো বছরের ছেলেটিকে জহুরির মত খুঁজে বার করেছিলেন পি·কে। তাই তিনি খুবই যুক্তিযুক্ত ভাবে আবিষ্কৃত রত্নটিকে খুব কাছ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করতে পারেন। পি·কে–র উক্তি দিয়ে আবার বলি–'সুব্রতকে অনেকে যেমন ভালবাসে, তেমনি ওকে ভুলও বোঝে প্রচুর মানুষ।'

সুব্রতকে ভুল বোঝার বা বিভিন্ন কটু মন্তব্যের জন্য সুব্রত নিজেই অনেকাংশে দায়ী। ময়দানের খেলার ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করলে দেখা যাবে উনিশ'শ ছিয়াত্তর সাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় দু'ডজনেরও বেশি বড় ঘটনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যার মধ্যে রয়েছেন সহ–খেলোয়াড়, বিপক্ষ খেলোয়াড়, অধিনায়ক, কোচ, কর্মকর্তা, মেম্বার, রেফারি ইত্যাদি। বাবলু ওরফে সুব্রত ভট্টাচার্যর কাছে কেউই রেহাই পান নি। ভগবান প্রদত্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে হাত পা, মাথা, মুখ চোখ যখন যেটা প্রয়োজন সুব্রত নাকি সেটাই সময়মত ব্যবহার করেছেন নিজের প্রয়োজন মত। সে সব ঘটনার তথ্য ও বিশ্লেষণে গিয়ে লাভ নেই। কারণ যা কিছুই ঘটিয়ে থাকুন না কেন সেটা সুব্রতর দ্বিতীয় সত্তা অর্থাৎ খেলোয়াড় সুব্রতর বাইরে যে মাথা গরম বদরাগী সুব্রতকে আমরা চিনি এটা তাঁরই কাজ। আবার এই সুব্রতকে যখন নির্ভরযোগ্য রক্ষণভাগের প্রহরা হিসাবে সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্লেষণ করা হবে তখন কিন্তু একেবারেই অন্যরকম। সুব্রতর স্কিল এবং টেকনিক্যাল বোধ তার সহজাত বুদ্ধি ও প্রভূত পরিশ্রম দ্বারা অর্জিত। নিরন্তর সে পরিশীলিত করেছে নিজের দক্ষতাকে এবং এর প্রকাশ আমরা দেখেছি ১৯৭৭ সেপ্টেম্বরে কসমসের সঙ্গে ম্যাচে। বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক মতি নন্দীর বিশ্লেষণটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ–'এমন স্থির মস্তিষ্কে; অসাধারণ অ্যান্টিসিপেশনে জমিতে ও শূন্যে সে নিজেকে ছড়িয়ে রেখেছিল, যা দেখে মনে হয়েছিল ফুটবল তাহলে এত হিংস্রভাবে খেলা হয় কেন?' এত আবেগ ভরে নিজেকে নিবেদন করে দেওয়া দেখলে মন প্রসন্নতায় ভরে যায়। বস্তুত সুব্রত দানবের মত আবার আত্মমগ্ন শিল্পীর মত দু'ভাবেই নিজেকে মাঠের মধ্যে প্রকাশ করেছে। সুব্রত ভট্টাচার্য–যিনি ভারত, বাংলা ও মোহনবাগানের ডিফেন্ডার। ১৯৭৪ সালে চুনী গোস্বামী ও গজু বসুর ঐকান্তিক ইচ্ছায় মোহনবাগান ক্লাবে তাঁর প্রথম আবির্ভাব ঘটে। তারপর এক এক করে সতেরটা বছর কাটিয়ে দিলেন এই ঐতিহ্যশালী মোহনবাগান ক্লাবে।

শুধু ময়দানের সতীর্থ খেলোয়াড় নয়, বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রাও সুব্রত সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। দীর্ঘ সাত বছর মোহনবাগানে তাঁর সহযোদ্ধা হিসাবে যিনি রক্ষণভাগ আগলেছেন সেই প্রদীপ চৌধুরির বক্তব্য খুবই স্পষ্ট–'আমরা

পাশাপাশি একসঙ্গে খেললেও সম্পর্কটা যে খুব মধুর ছিল তা নয়। কিন্তু মাঠে দলের জন্য এসবের উর্দ্ধে সুব্রত নিজেকে নিয়ে যেত। এসব গুণের জন্যই ও সফল। সি প্রসাদ এবং নঈমের পর সুব্রত ভারতের অন্যতম সেরা স্টপার।'

প্রসুন ব্যানার্জির অনুভূতিটা একটু অন্যরকম, 'সত্তর দশকের একমাত্র ফুটবলার যে ময়দান দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বাবলুর খেলার মধ্যেই আমরা বেঁচে আছি দর্শকের স্মৃতিতে।' এই সব মন্তব্য সুব্রতর কাছে কতটা হৃদয়গ্রাহী বলা মুশকিল কিন্তু সুব্রত অনুরাগীদের প্রেরণার যে মূলধন সন্দেহ নেই।

জামসিদ নাসিরি ইরাণী ফুটবলার। প্রথম আবির্ভাবেই ময়দানকে মুখরিত করেছেন তাঁর ক্রীড়ানৈপুণ্যে। তিনিও অকপটে স্বীকার করলেন, 'কলকাতায় এসে যে ক'বছর আমি ফুটবল খেলেছি, সুব্রত আমার বিপক্ষ দলে ছিল। বলতে দ্বিধা নেই সেই সময় অনেকই ভাল স্টপার কলকাতায় ছিল। তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সেরা সুব্রত। মোহনবাগানের সঙ্গে খেলা থাকলে আমার চিন্তা হত কিভাবে সুব্রতকে টপকে গোল করব।'

সুব্রত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অতীতের খ্যাতনামা ফুটবলার এবং কোচ অরুণ ঘোষও প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যিনি খেলোয়াড় জীবনের শেষদিকে সুব্রতর সঙ্গে খেলেছেনও। তিনি স্বীকার করেছেন যে, 'ও একজন প্রচণ্ড সিরিয়াস ফুটবলার। মোহনবাগান ক্লাবে কোচিং করার সময় দেখেছি সবরকম প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সুব্রত রোজ মাঠে এসেছে। এমন কি আহত থাকলেও ওকে দেখেছি অনুশীলন করতে আসতে। সত্যি বলতে কি ওর এই ডেডিকেশনের জন্যই আজকে এত বড় এবং নামী ফুটবলার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। প্রসঙ্গক্রমে তাই বলতে হয়, এত বছর ধরে একই যোগ্যতায় খেলার ধারাবাহিকতা রাখার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে সুব্রত ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে এক অমোঘ আদর্শ, অনুকরণীয় চরিত্র।'

সুব্রত মনে করেন জীবনের টার্নিং পয়েন্ট ১৯৭৪-এর ডুরাণ্ড। সেমি ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলা। কিন্তু স্মরণীয় খেলাটি খেলেন ১৯৭৭-এ আই এফ এ শিল্ডের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। 'লিগে আমরা অপ্রত্যাশিত ভাবে ইস্টবেঙ্গলের কাছে হেরে গেছিলাম। শিল্ড ফাইনাল ছিল আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই।' কিন্তু জীবনের স্মরণীয় গোল কোনটি বলতে গিয়ে চোখে মুখে এক আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, '১৯৮১ তে নাগজী ট্রফি সেমি ফাইনালে সুরজিৎ সেনগুপ্তের সেন্টার থেকে মফতলাল স্পোর্টস ক্লাবের বিপক্ষে বাই সাইকেল কিকে করা গোলটি। বলাইবাহুল্য এই গোলেই মোহনবাগান জিতেছিল।' বিশ্ববিখ্যাত ফুটবলার পেলের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার মুহূর্তগুলি সুব্রতর স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। সাদা পোশাক এবং অবসর সময়ে গান শোনা-বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত তার প্রিয়। সুব্রত উদার মানসিকতাকে যত বেশি জীবনের অস্থি মজ্জায় মিশিয়ে ফেলতে চান ঠিক তেমনই শঠতা ছলচাতুরিকে ঘৃণা করেন। তাই নির্দ্বিধায় স্বীকার করলেন, 'ইন্দর সিং, হাবিব, আকবর, শ্যাম থাপা, সুরজিৎ সেনগুপ্ত ও চিমাকে ডিফেণ্ডার হিসাবে ভয় পেয়েছি। অনেক সময় সামলাতে হিমসিমও খেতে হয়েছে।'

শ্যামনগরের সেই অখ্যাত বাবলুকে আজ সবাই সুব্রত ভট্টাচার্য নামেই চেনে। তাঁর জেদ নিষ্ঠা যেমন তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে বহু খ্যাতির দরজায়, আবার ওঁকে মূলধন করে অতীতে যেমন অনেকে আখের গুছিয়ে নিয়েছে, এখনও রয়েছে সেই একই জিনিস অব্যাহত। সুব্রতর শিরদাঁড়া অত্যন্ত সোজা। মাঠেও যেমন খাড়া পায়ে দাঁড়িয়ে বিপক্ষের মোকাবিলার দুঃসাহস দেখিয়েছেন, মাঠের বাইরেও তেমনি অন্যায়কে কখনও প্রশ্রয় দেন নি। সবসময় প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। এই প্রতিবাদী বিদ্রোহী চরিত্র যদি একটু স্থির মস্তিষ্কে সংযমী হয়ে প্রয়োগ করতে পারতেন তাহলে ময়দানের ইতিহাসে নিশ্চয় বর্ণময় এই চরিত্রটি বিস্ময়কর অথচ প্রয়োজনীয় হয়ে চিরকাল কিংবদন্তী হয়ে থাকত।

আজ খেলোয়াড় জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে সুব্রত দপ করে জ্বলে উঠলেন। ওঁর ভাষায় বলতে গেলে 'নেভার আগে জ্বলে ওঠা'। তিনটে বড় দলের বিরুদ্ধে গোল করেছেন বলেই নয়, চলতি লিগে মোট ছ'টি গোল এবং ফেডারেশন কাপে একটি গোল করে ২২ বছরের খেলোয়াড় জীবনের অন্তিম লগ্নে এসে এক রেকর্ড করলেন। সুব্রতর কর্মক্ষেত্র ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের চৌরঙ্গী শাখার দ্বিতলে বসে কথা বলার সময় চোখেমুখে এক উজ্জ্বল দীপ্তিময় হাসি খেলা করছিল তাঁর চোখেমুখে। সেই হাসির রেশ ধরে বললেন, 'আমি মিল্লার মতই বুড়ো ফুটবলার বলতে পারেন। এই বয়সে সাতটা গোল করেছি। এর আগেও অবশ্য এত সংখ্যক গোল কোন সিজনে করেছি, তবে এবারের গোলগুলি খুব ক্রুশিয়াল মুহূর্তে করা বলেই এ নিয়ে এত হৈ চৈ। বোধহয় একটু বাড়াবাড়িই হচ্ছে।'

হঠাৎ কিভাবে হারানো পারফরমেন্স ফিরে পেলেন জানতে চাইলে স্পষ্ট বললেন, '২৮ এপ্রিল '৯০ থেকে মনে মনে শপথ নিয়েছিলাম যে আর কোন বিতর্কের মধ্যে যাব না। সব কিছু চোখ বুজে সহ্য করব। কারণ এ সমাজ ব্যবস্থায় কিচ্ছু হবে না। অন্য কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ বা নাক গলানো সমীচীন নয় বলেই আর ওদিকে ঝুঁকি নিই নি। শেষ দিকে এসে ভাবলাম আরও কিছু করা উচিত ছিল। দেখা যাক অবসর নেওয়ার আগে কিছু দিতে পারি কি না। তাই এ মরশুমে প্রদীপদা যখন বললেন, 'তুমি কোচিং করতে চাও, নাকি খেলতে চাও?' আমি দ্বিতীয়টা বেছে নিলাম। তারপর সাধ্যমত চেষ্টা করে গেছি খেলতে। এটা হয়ত দু'বছর আগেও দিতে পারতাম যদি খেলাধূলা বা ক্লাবের সৎ পরিবেশ থাকত। গত দু'তিন বছর এই পরিবেশ দূষিত হয়ে গিয়েছিল। পরে এ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। সুস্থ পরিবেশ আমাকে খোলা মনে খেলতে সাহায্য করেছে।'

এখন বহু চিত্রতারকা, রাজনীতিবিদ ক্রীড়াবিদ সঙ্গীতশিল্পী আপনাকে অভিনন্দন জানিয়ে নিকট সান্নিধ্যে আসছেন কিন্তু কয়েক মাস আগেও এঁদের তেমন ভাবে পাওয়া যায় নি।

কোন দ্বিধা না করে সাবলীল ভঙ্গিতে বললেন 'একটা উচ্ছ্বাস নিশ্চয়ই আছে। এঁরা আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু। হয়ত খারাপ খেলছিলাম ব বিতর্কে জড়িয়ে যাচ্ছিলাম বলেই বোধহয় এঁদের সঙ্গে দু'তিন বছর ধরে ব্যবধান বেড়ে যাচ্ছিল এটাই আমার শেষ বছর। লিগের পরই শিল্ড তারপরই ডুরাণ্ড। সম্ভবত ওটাই আমার জীবনের শেষ খেলা হবে।'

সুব্রত প্রথম খেলা শুরু করেছিলেন ১৯৬৯-এ 'বালি প্রতিভায়'। টানা বাইশ বছর ধরে প্রথম ডিভিশনে খেলেছেন। নানা বৈচিত্র্যময় ঘটনার মধ্যে দিয়ে হেঁটে এসে আজও সুব্রত ক্লান্ত নন। এখনও যে কোন তরুণের মতই তাঁর তারুণ্য টগবগ করছে প্রদীপ ব্যানার্জি চমৎকারভাবে তিনটি শব্দে সুব্রত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন-জেদ, নিষ্ঠা, বাসনা এখনও সবগুলোই রয়েছে এই খেলোয়াড়টির মধ্যে। মোহনবাগান ক্লাব তাঁর সম্মানে ষোল নম্বর জার্সি আর কাউকে পরতে দেবে না। এই ষোল নম্বর জার্সিটি সুব্রতর গায়ে কিভাবে উঠল? ঘটনাটি তাঁর বর্ণময় ক্যারিয়ারের মতই। তখন সুব্রত 'বালি প্রতিভা'য়। কিন্তু খেলার সুযোগ পাচ্ছেন না। মাঠের বাইরে বসে আছেন। গায়ে একটা ১৬ নম্বর জার্সি একজন খেলোয়াড় না আসায় সুব্রতকে বিভিন্ন টালবাহানার পরে ঝটিতে নামিয়ে দেওয়া হল জার্সি পাল্টানর সময় আর পাওয়া গেল না। মাঠে নেমে ভালই খেললেন। তারপর থেকেই সুব্রতর জার্সির নম্বর ১৬।

সুব্রত প্রতিষ্ঠার শিখরে এসে খেলা থেকে অবসর নিলেন। একাধারে খেলার অর্জিত অর্থ অন্যদিকে ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের চাকরির পাশাপাশি 'প্যানোরমা'র আংশিক মালিকানা।

অবসরের পর খেলাধূলার সঙ্গে কতটা যোগসূত্র রাখবেন এবং সতের বছরের প্রিয় ক্লাব মোহনবাগানের সঙ্গে সম্পর্ক কতটা নিবিড় করবেন এই কথার জবাবে সুব্রত মুচকি হেসে বললেন, 'না খেলাধূলার সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখার ইচ্ছে নেই। তবে মোহনবাগান ক্লাবের কর্মকর্তারা যদি আমাকে গুরুত্ব দেন নিশ্চয় সাড়া দেব। শহরে থাকলেও মন কিন্তু আমার গ্রাম শ্যামনগরে। তাই অবসর জীবনটুকু তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারলে সার্থক হবে আমার সারা জীবনের সাধনা।'

– আবদুল কাইউম

পশ্চিমবঙ্গে সংরক্ষণ–বিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা কম কেন

মণ্ডল কমিশনের সুপারিশকে কেন্দ্র করে সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রজীবনে কতটা প্রভাব ফেলছে তারই তথ্যসমৃদ্ধ সরজমিন প্রতিবেদন।

জয়েন্ট অ্যাকশন ফোরামের ইন্দ্রনীল গুপ্ত

তিনি ভট্টাচার্য

সংরক্ষণ বিরোধী অরাজনৈতিক আন্দোলনে বেথুন কলেজের ছাত্রীরা

সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন: পটভূমি বিহার

দিনটি ছিল এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসের সাত তারিখ। মহাকরণ থেকে এক কিলোমিটার দূরত্বে, এসপ্ল্যানেড ইস্টে দুপুর দু'টো নাগাদ জয়েন্ট অ্যাকশান ফোরামের নেতৃত্বে প্রায় সাত হাজার অরাজনৈতিক ছাত্রছাত্রী গর্জে উঠলেন কেন্দ্রিয় সরকারের সংরক্ষণনীতির বিরুদ্ধে। রোদের তীব্র তাপে কঠোর প্রতিবাদমুখী সমর্থকরা আকাশে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে প্রতিবাদ আর ধিক্কার জানাচ্ছিলেন কেন্দ্রের একপেশে সংরক্ষণনীতির সমালোচনা করে। মিছিলে সামিল হাজার সাতেক ছাত্রছাত্রীর জমায়েতে জয়েন্ট অ্যাকশান ফোরামের নেতৃস্থানীয় দেবাশিষ রায়চৌধুরী, ইন্দ্রনীল গুপ্ত, সৌমেন সরকার, অশোক সোম তীব্রকণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'কেন্দ্রিয় সরকারের এই কালানীতি বাতিল করো।' তাদের বিক্ষোভ ধ্বনিত হচ্ছিল হঠাৎ এসে জুটে যাওয়া হাজার দশেক সমর্থকদের মুখে। সব মিলিয়ে ধিক্কার শ্লোগান, পোস্টার ফেস্টুনে জমজমাট হয়ে উঠেছিল সাত সেপ্টেম্বরের দ্বিপ্রহরের এসপ্ল্যানেড ইস্ট।

সংরক্ষণ বিরোধী বিক্ষোভের উদ্যোক্তা যাদবপুরের ছাত্র নেতা ইন্দ্রনীল গুপ্ত দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'আমাদের এই সংরক্ষণ বিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে কোন রাজনৈতিক দলের কোন সংশ্রব নেই। এই আন্দোলন ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ। আমরা মনে করি সংরক্ষণ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর এই ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যে কোন মূল্যে রুখতে হবে। নতুবা এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় সমাজকে ভেঙে টুকরো করে দেবে। বাড়িয়ে দেবে গৃহযুদ্ধকে।' ইন্দ্রনীলের বক্তব্য সমর্থন করলেন স্কটিশ চার্চ কলেজের আর এক ছাত্র দেবাশিষ রায়চৌধুরী। তিনিও এই জয়েন্ট অ্যাকশান ফোরামের সদস্য। সাত তারিখের মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন দেবাশিষ।

ঘটনার শুরু আগস্ট মাসের মাঝামাঝি থেকে। সংরক্ষণের বিরোধিতায় দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, বিহারের ছাত্ররা আন্দোলনে ইতিমধ্যেই নেমে গেছেন। অগ্নিগর্ভ সারা দেশ। বিক্ষোভ রুখতে রাজ্যে রাজ্যে সর্বত্র পুলিশের লাঠি গুলি শুরু হয়ে গেছে। সংরক্ষণ নীতিতে হতাশ ও বিক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীরা আশ্রয় নিয়েছে হিংসাত্মক পথের। সংবাদপত্রের লীড নিউজ সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন, বিক্ষোভ। সেই সময়েই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে কিছু ছাত্রছাত্রী এ বিষয়ে কিছু আলোচনা শুরু করলেন। দুশ্চিন্তাতে এগিয়ে এলেন কারিগরি বিভাগের ছাত্ররাও। থাকতে না পেরে বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজের ৩০০ জন ছাত্র সরাসরি চিঠি লিখলেন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপের কাছে। তাঁদের দাবি অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে। তারপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে হেডকোয়ার্টার করে শুরু হল বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান। যাদবপুরের কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র সংসদটি এস এফ আই অর্থাৎ সি পি আই এম–এর ছাত্র সংগঠন স্টুডেন্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা পরিচালিত। ছাত্রদের এই গণ সচেতনতা ও সংরক্ষণ বিরোধী পদক্ষেপের ব্যাপারে তারা প্রবল আপত্তি জানাতে লাগলেন। কারিগরি বিভাগের ছাত্র সংসদ পরিচালনা করেন নকশালপন্থী ছাত্র সংগঠন। তখনও তারা এ ব্যাপারে সক্রিয় উদ্যোগ নেন নি। এদিকে সাধারণ ছাত্ররা এস এফ আই–এর আপত্তিকে গুরুত্ব না দিয়ে তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে লাগলেন। স্বাক্ষর সংগ্রহের কাজ কিছুটা এগোলে স্থির হয় ২৮ আগস্ট সমস্ত ফ্যাকাল্টি মিলিয়ে একটি সভা করা হবে। এবং সেখানেই আন্দোলনের নির্দিষ্ট পরিকল্পনার খসড়াও তৈরি হবে। এ ব্যাপারে কিছু উদ্যোগী ছাত্র ক্যাম্পেনও শুরু করে।

কিন্তু শুরুতেই বড় রকমের ধাক্কা খেল এই আন্দোলন। দিল্লি, বিহার, উত্তরপ্রদেশ সহ অন্যান্য রাজ্যে যখন প্রতিবাদ, আন্দোলনের হিংসাত্মক জোয়ার ঠিক

তখনই পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার অন্যতম প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদের বীজকে উৎপাটন করার উদ্যোগ নিলেন এস এফ আই–এর সমর্থকরা। শুরু হল পাল্টা স্কোয়াড ক্যাম্পেন। বিচ্ছিন্নভাবে সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে তাদের উত্তেজিত একের পর এক তর্ক বিতর্কের ঘটনাও ঘটতে থাকে। সংরক্ষণ বিরোধী সাধারণ সভার প্রতি ছাত্রদের আগ্রহের মাত্রা লক্ষ্য করে ২৭ তারিখ থেকেই হুমকি দেওয়া শুরু করে এস এফ আই। তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যেমন করেই হোক এই সভা তারা বন্ধ করবেই। সতর্ক হয়ে যায় সাধারণ ছাত্ররাও। হুমকি উপেক্ষা করে ২৮ তারিখ দুপুরে গান্ধী ভবনে সমবেত হয় প্রায় তিন হাজার ছাত্রছাত্রী। সভার কাজ শুরু হওয়ার মুখে; এমন সময় এস এফ আই নেতা শুভময় ভৌমিক দৌড়ে এসে মঞ্চে উঠে মাইক হাতে নিয়ে বলেন, 'ছাত্র সংসদের অনুমতি ছাড়া কোন সাধারণ সভা ছাত্ররা করতে পারেন না। সেটা নিয়মবিরুদ্ধ কাজ। তাই এই সভাকে আমি বাতিল ঘোষণা করছি।' সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড গোলমাল। ছাত্ররা দৌড়ে এসে চেষ্টা করে মাইক কেড়ে নেবার। মারামারি বেধে যাওয়ার উপক্রম হয়। বিভাগই এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগ নেয়। কোন সংগঠন বা নির্দিষ্ট নেতৃত্ব ব্যতিরেকেই ২১ আগস্ট তারা নিজেদের ক্যাম্পাসে ধর্মঘট ডাকেন। আশ্চর্যজনকভাবে সফলও হয় সেই ধর্মঘট। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেই ২৩ আগস্ট প্রেসিডেন্সি কলেজে ক্লাস বয়কটের ডাক দেওয়া হয়। তার পরের দিন আয়োজন করা হয় মিছিলের। দুটিতে অভূতপূর্ব সাড়া মেলে। এস এফ আই এই সংরক্ষণবিরোধী ছাত্র মিছিলকে 'সাম্প্রদায়িক শ্লোগান সর্বস্ব সুবিধাবাদীদের মিছিল' বলে সমালোচনা করলেও ছাত্ররাও তাদেরকে মোটেই গুরুত্ব দেয় নি। ইতিমধ্যে উত্তর কলকাতার অন্যান্য কলেজ যেমন স্কটিশ চার্চ, সিটি প্রভৃতি থেকেও ছেলেরা এসে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সিদ্ধান্ত হয় ২৯ আগস্ট সিটি কলেজে একটি মিটিং করা হবে। সেখানেই স্থির হবে পরবর্তী পদক্ষেপ। এর মধ্যেই ঘটে গেছে যাদবপুরের ঘটনা। বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ ও হাজরা ল কলেজের ছাত্ররা ক্লাস বয়কট করেছে। বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে আরও দু একটি কলেজে। সংরক্ষণ চালু হয়ে গেলে তাদের ভাগ্যে আর চাকরি জুটবে না এই আশংকায় লাগাতার ক্লাস বয়কট হয়ে যায় সাধারণ

পারমিতা ঘোষ মজুমদার

প্রেসিডেন্সি কলেজের অশোক সোম

দিল্লিতে বিক্ষোভ মোকাবেলায় পুলিশ

রাজধানী দিল্লিতে প্রবল বিক্ষোভ

২৮ তারিখের ঘটনা নিয়ে কথা হচ্ছিল অর্থনীতির স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্রী পারমিতা ঘোষ মজুমদারের সঙ্গে। তার মতে 'দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র সংসদকে নিজের খুশি মত ব্যবহার করার দরুন এস এফ আই–এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ক্রমশই বেড়ে উঠছিল। এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এস এফ আই–ও সেটা জানে আর তাই নিজের পায়ের নিচের মাটি হারাবার আশংকায় তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। গায়ের জোরে দমিয়ে রাখতে চাইছে ছাত্র সমাজের স্বতস্ফূর্ত আন্দোলনকে।' ব্যক্তিগত ভাবে পারমিতা মনে করেন যে আন্দোলন সম্পূর্ণ স্বতস্ফূর্ত। সুবিধাবাদী জায়গা অবশ্য খানিকটা আছে। নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগার সম্ভাবনার দরুনই অনেকে এগিয়ে এসেছেন। ইতিহাস বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী তিথি ভট্টাচার্য অবশ্য মণ্ডল কমিশনের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন। কিন্তু সেদিনের ওই সভায় এস এফ আই–এর আচরণে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তিনি মনে করেন নিজস্ব মত প্রকাশের স্বাধীনতা সকলেরই আছে। বক্তব্য রাখতে না দেওয়ার অর্থ গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা। এখানে তাই ঘটেছে।

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই সংরক্ষণ বিরোধী হাওয়া কলকাতায় নাড়াচাড়া ফেলছিল। প্রতিবাদপত্রে সই সংগ্রহ করা হয় বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায়। যেমন, প্রেসিডেন্সি কলেজ, স্কটিশ চার্চ, সিটি কলেজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, আশুতোষ কলেজ, রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। প্রেসিডেন্সি কলেজের অশোক সোম জানালেন যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ভাবে রাজনীতি থেকে শতহস্ত দূরে থাকা বেথুন আর ব্রেবোর্ন কলেজেও। এমন কি হিন্দু স্কুল, হেয়ার স্কুল আর টাকী হাউস গভর্মেন্ট স্কুলের ছাত্ররাও এই সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করে রাস্তায় নেমে পড়ে।

কিন্তু এই রাজ্যে সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন সেরকম দানা বাঁধতে পারেনি কেন? দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, এমন কি প্রতিবেশি রাজ্য বিহারেও আন্দোলন মারমুখী হয়ে ওঠে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে সেই আন্দোলন একেবারেই দানা বাঁধতে পারে নি। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, নিরীহ জনতার দিকে পুলিশের লাঠি চালনা, বিদ্যুৎ সংকট, আইন শৃংখলার অবনতি, নারী ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন নিয়ে যখন তামাম রাজ্য উত্তাল, তখন সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন এ রাজ্যে সংগঠিত হতে পারে নি। দৈনিক কাগজগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে অন্যান্য প্রদেশের আন্দোলনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের একটা বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। যে ধরনের বিধ্বংসী ঘটনা ঘটছে বিহার উত্তরপ্রদেশ বা দিল্লিতে, পশ্চিমবঙ্গে তা ঘটছে না। একটিও ট্রাম বা বাস পোড়ে নি কলকাতা শহরে। আত্মাহুতি তো দূরের কথা রেল অবরোধ বা রাস্তা অবরোধের বেশি কোন মারাত্মক ঘটনা ঘটে নি। প্রশ্ন জাগছে পশ্চিমবঙ্গে এই আন্দোলনের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম কেন? তার বিশেষ কারণটা কি এই যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পট অন্য রাজ্যের চেয়ে আলাদা?

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌমেন সরকার মনে করেন এই মত অনেকাংশে সঠিক। 'পশ্চিমবঙ্গের ছাত্ররা এতদিন পর্যন্ত কোন না কোন প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক

‘এখনও কোন সিদ্ধান্তেরই বাস্তব রূপায়ন হয়নি’

আইনমন্ত্রী আব্দুল কাইউম মোল্লা।

প্র: মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট যখন তৈরি করা হচ্ছিল তখন কি আপনি সে সম্বন্ধে কিছু জানতেন?

উ: হ্যাঁ, বিষয়টা আমার জানা ছিল। তখন যদিও আমি মন্ত্রী ছিলাম না। সেবার ডায়মণ্ডহারবার থেকে এম·এল·এ নির্বাচিত হয়েছিলাম। এই রিপোর্ট তৈরির আগে কমিশনের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন জায়গায় সার্ভে করেছিলেন। সে সময় তারা আমার কাছেও মতামত নেওয়ার জন্য আসেন।

প্র: আপনি যদি আপনার তখনকার মতামত সম্পর্কে কিছু বলেন, তাহলে ভাল হয়।

উ: আসলে স্বাধীনতার পর থেকেই তো তফসিল বর্ণ ও উপজাতির জন্য ২২·৫ শতাংশ সংরক্ষণ চলে আসছে। এর ফলে তাদের একটা অংশ নিশ্চয়ই উপকৃত হয়েছে। যদিও এটা সত্যি যে অধিকাংশই বঞ্চিত হয়। এই বঞ্চিতদের মধ্যে ধোপা, নাপিত, কেওড়, মুদ্দাফরাস প্রভৃতিরাই বেশি। আমার মত ছিল যে এই বঞ্চিতদের উন্নতির জন্যই বিশেষভাবে চেষ্টা করা দরকার।

প্র: আজকে যে এই মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা হচ্ছে। সে বিষয়ে আপনার মত কি?

উ: প্রথমত ‘কার্যকর করা হচ্ছে’ কথাটাই ভুল। এখনও কোন সিদ্ধান্তেরই বাস্তব রূপায়ন হয়নি। এখনই এত হৈ-চৈ এর কি আছে বুঝতে পারছি না। তবে এ বিষয়ে সি·পি· আই (এম) পার্টির যে নীতি তার সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই। আমি মনে করি জাতপাতের প্রশ্ন অবান্তর। আমাদের সমাজে অর্থনৈতিক অবস্থার পার্থক্যই একমাত্র বিভাজনের কারণ। তাই, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নতি করাই প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

প্র: মধ্যপ্রদেশে মুখার্জি, চ্যাটার্জি, ব্যানার্জি পদবির লোকেদের বা আসামে যাদের পদবি দে, তাদেরকেও ‘অন্যান্য পশ্চাদপদ বর্গে’র আওতায় আনা হয়েছে। এর পিছনে কি যুক্তি আছে বলে আপনি মনে করেন?

উ: দেখুন গ্রামাঞ্চলে অনেক ব্রাহ্মণ আছে যাদের নেশাই হল পুজো-আর্চ্চা করা। কিন্তু আজকাল তো পুজো করে পেট চালানো দুষ্কর। বাড়ি বাড়ি নিয়মিত পুজোর চল তো প্রায় উঠেই গেছে। সবই বারোয়ারি পুজো। তাহলে এই ধরনের ব্রাহ্মণকে কি আপনি পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মধ্যে আনবেন না? আবার তার অর্থ এই নয় যে ব্রাহ্মণ মাত্রই পিছিয়ে পড়া শ্রেণী। যে ব্রাহ্মণের তিনতলা বাড়ি, গাড়ি আছে তিনি নিশ্চয়ই সংরক্ষণের আওতায় আসবেন না।

আসলে কারা কারা সংরক্ষণের আওতায় আসবেন বা আসবেন না, তার একটা বাস্তব সম্মত মাপকাঠি তৈরি করতে হবে। সংরক্ষণের নামে একটি শ্রেণীকে বাড়তি সুবিধা দেওয়াও যেমন বাঞ্ছনীয় নয় তেমনি আবার কাউকে বঞ্চিত করাও উচিত নয়।

– চন্দন নিয়োগী

দলের ছত্রছায়ায় থেকেই আন্দোলন করতে অভ্যস্ত। তার ফল সুনির্দিষ্ট নেতৃত্বহীন এই আন্দোলন অনেক সময় খাপছাড়া হয়ে যাচ্ছে যথার্থ নেতৃত্বের অভাবে। এবং এর ফলে সম্ভাবনা বাড়ছে প্রতিক্রিয়াশীলতার দিকে ঝুঁকে পড়ার।’ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দেবাশিস ভট্টাচার্যের মতে “পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য কোন প্রদেশেই ছাত্রদের মাসলম্যানপুষ্ট একটি সুসংগঠিত ক্যাডারভিত্তিক রাজনৈতিক দলের মোকাবিলা করতে হচ্ছে না। পথে-ঘাটে, রাস্তায়, পাড়ায় সম্মুখীন হতে হচ্ছে না মারমুখী সি পি এম ক্যাডারদের।সেই সঙ্গে রাজ্য সরকার প্রতিটি গণ আন্দোলনে যেভাবে পুলিশ লেলিয়ে দেয় এখানে তা হচ্ছে। আন্দোলনে মুখোমুখি হতে হচ্ছে পুলিশের, যে পুলিশ গত এক মাসে আন্দোলনের সময় ১৭ জনকে গুলি করে মেরেছে। গুলি চালিয়েছে ১২১ রাউণ্ড। স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলনের তীব্রতা তাই পশ্চিমবঙ্গে কম।”

সৌমেনের সঙ্গে অবশ্য একমত নন দুই ছাত্র নেতা অশোক ও ইন্দ্রনীল। তাঁদের কথায়, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্ররা অনেক বেশি পরিণত। সেই কারণেই ট্রাম-বাস পুড়িয়ে জনগণের সম্পত্তি তারা নষ্ট করেন নি। কিন্তু তা বলে ভয়ও পান নি সি পি আই (এম) এর ক্যাডারদের ক্রমাগত হুমকিতে। সতর্ক হয়েছেন মিটিং মিছিলে ব্যাপক হারে আই বি-র লোকের উপস্থিতি অনুভব করে। তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে আন্দোলনের তীব্রতা কম।

বরঞ্চ এই আন্দোলনকে অনেক গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তাঁরা। বললেন, ‘বাংলার ছাত্রসমাজের কাছে এ কথা খুব স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে এই সংরক্ষণ কিছু রাজনৈতিক নেতার ভোটবাজির চাল মাত্র। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে তফসিল বর্ণ ও উপজাতির জন্য ২২ শতাংশ চাকরি সংরক্ষিত আছে। অথচ তার ফলে এই উপজাতিদের উন্নতি হয় নি বিন্দুমাত্র। সংরক্ষণের সুবিধা ভোগ করেছে তাদের মধ্যেই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এগিয়ে থাকা মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবার। এই কথাটাই সংরক্ষণকে সমর্থন করেও বলছেন বিরোধী দলনেতা রাজীব গান্ধী।’

ইন্দ্রনীল আরও কড়া এ ব্যাপারে। তাঁর কথায়– ‘ভি পি সিং নিজে ঠাকুর সম্প্রদায়ের–রাজা। উচ্চবর্ণের মানুষ তিনি। তার মুখ্যমন্ত্রীত্বের সময় উত্তরপ্রদেশের ওই ২২ শতাংশ সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু সে সময় অনগ্রসর শ্রেণীর ২ শতাংশ লোকও চাকরি পায় নি। ভি পি যখন কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী বা প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন তখন একজন অনগ্রসরকেও তিনি বেশি সুবিধা দেন নি। তাই ভি পি সিং একথা খুব ভাল করেই জানেন যে আজকের ২৭·৫ শতাংশের সুবিধার সুযোগও প্রকৃত অনগ্রসর মানুষরা পাবেন না। একে ব্যবহার করবেন স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষ। কিন্তু তবুও তিনি এ কাজ করছেন এই আশায় যে এর ফলে দেশের ৫২ শতাংশ মানুষের ভোট তিনি পাবেন–যা তার পদলোভী ভণ্ড রাজনৈতিক চরিত্রের অন্যতম পাথেয়। এভাবেই তিনি ভোটের ধান্দায় সমাজকে জাত পাতের দ্বন্দ্বে ফেললেন। আর জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়ে কোন প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলই প্রকাশ্যে এর বিরোধিতা করতে সাহস পাচ্ছেন না।’

ইন্দ্রনীল আরও জানালেন, ‘এই জাতিগত দাঙ্গাকে যাতে রোধ করা যায়, ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ যাতে মাথাচাড়া না দেয় তার জন্য খুব সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিয়েছে জয়েন্ট অ্যাকশান ফোরাম। প্রথমত সরকারের বিভিন্ন স্ববিরোধী বক্তব্যর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দাবী জানিয়েছি মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টকে পূর্ণাঙ্গভাবে জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করার। দ্বিতীয়ত, আমরা খুব স্পষ্টভাবেই জানিয়েছি যে কোন ধরনের বর্ণভিত্তিক রাজনীতি বা জাতিভেদবাদী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তেরই আমরা বিরোধী। কারণ এই ধরনের জাতপাতের সমস্যাটি প্রশ্রয় দেওয়ার অর্থ ভারতবর্ষকে আরও অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া। তৃতীয়ত, আমরা মনে করি সংরক্ষণ কোন সমস্যার সমাধান নয়।’

জয়েন্ট অ্যাকশান ফোরাম তাঁদের এই বৃহৎ পরিকল্পনাকে রূপায়িত করবেন বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে। আন্দোলন তাঁরা থামতে দেবেন না, চালিয়ে নিয়ে যাবেন এই নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিত দেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা যোগাযোগ করতে শুরু করেছেন অন্যান্য প্রদেশের ছাত্র সংগঠনগুলির সঙ্গেও। সবশেষে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে অশোক সোম জানালেন যে আজ তাঁদের আন্দোলন জঙ্গী নয় ঠিকই, কিন্তু ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে জঙ্গী পদক্ষেপই তাঁরা নেবেন। প্রশাসনিক কোন ভয়ই তাঁদের পিছনে ঠেলে দিতে পারবে না। আর পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গী ছাত্র আন্দোলনের উজ্জ্বল ইতিহাস তো কারও অজানা নয়।

– দীপান্বিতা রায়,
অমিতবিক্রম রাণা

ছবি: বিকাশ চক্রবর্তী
সঞ্জীব ব্যানার্জী

শিশুদের জন্যে সিদ্ধার্থঃ একক আন্দোলনের নেপথ্যে

পথ চলতি মানুষের কাছে রীতিমত বিস্ময় হয়ে রয়েছে ছেলেটি। বয়স কত? বড় জোর ২৪/২৫। কমদামী টি–শার্ট গায়ে, পরণে আজকালকার ব্যাগি ধরনের ঝলমলে পোশাক। আর হাতে একটি প্লাকার্ড।

––আপনার নাম?

––সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়।

–বাড়ি?

––হাওড়া ময়দান এলাকায়।

––কি করেন?

––এই যে প্লাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। রুজি রোজগার কিংবা চাকুরি করার কথা যদি বলেন, তাহলে বলব, নৈব নৈব চ। ছেলেটির কাটা কাটা সংক্ষিপ্ত উত্তর।

কোন রোজগার নেই অথচ নিয়মিত ছেলেটি সকাল সাড়ে নটা থেকে সাড়ে দশটা অব্দি দাঁড়িয়ে থাকে মৌলালি যুবকেন্দ্রের সামনে। হাতে ধরা প্লাকার্ডে লেখা, আমাদের সকলের সন্তানকে সমানভাবে প্রতিপালন করলে বিপ্লব আসবে। স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন জাগে শুধুমাত্র শিশু ভাবনায় ভাবিত হয়ে ছেলেটি ঝড় জল উপেক্ষা করেও বিগত সাড়ে তিন বছর ধরে রীতিমত যুদ্ধ করে চলেছে, তার সেই আন্দোলনের চূড়ান্ত প্রাপ্তি কি? আর কেউ কি শিশুদের বিকাশের জন্য সিদ্ধার্থের মত চিন্তা ভাবনা কিংবা আন্দোলন করেছেন? আদপেই কি আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিয়ে চিন্তাভাবনা করছি?

শিশু পালনের ব্যাপক ব্যর্থতার দায় নিয়ে নব্য প্রজন্মের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে সোচ্চার একক আন্দোলনে তিনবছর ধরে কলকাতায় নেমে পড়েছেন হাওড়ার সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়। গত তিন বছর ধরে প্রতিদিন তিনি মৌলালির মোড়ে প্রতিবাদী ব্যানার নিয়ে লাগাতার প্রতিবাদ করে যাচ্ছেন। কেন এই মরণপণ সাধনা?

দৈনিক সংবাদপত্রের শিরোনামে প্রতিনিয়ত যে সংবাদ উঠে আসে তাতে দেখা যায়, দুই সন্তানকে নিয়ে মা আত্মঘাতী, কিংবা ছেলে–মেয়েকে খুন করার পর পিতার আত্মহত্যার চেষ্টা অথবা আস্তাকুঁড় থেকে কুড়িয়ে পাওয়া গেল সদ্যোজাত নবজাতক। স্বাধীনতা পাওয়ার ৪৪ বছর পরও সামাজিক চিত্রে ফুটে উঠে গঙ্গার মত অসহায় মায়েদের ছবি, যারা খোদ মহাকরণের সামনে পাঁচদিন অভুক্ত অবস্থায় শিশু সন্তানকে নিয়ে নীরবে বসে থাকলেও কেউ দৃকপাত করে না। ফুটপাতে ফুটপাতে উলঙ্গ ছেলেমেয়েরা অন্যের উচ্ছিষ্ট অন্নে কতখানি জীবনের সার গ্রহণ করতে পারে তার সাক্ষ্য প্রমাণ দেবে তাদেরই কঙ্কালসার চেহারা। চায়ের দোকানে দোকানে কিংবা কল-কারখানাতে সুচতুরভাবে আজও শিশুদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে। শিশু ব্যবহারের করুণ পরিণতি যেখানে সমাজের বহুল পরিচিত চিত্র, সেখানে সিদ্ধার্থের একক আন্দোলনই বা কি পরিবর্তন আনতে পারবে? সিদ্ধার্থের নিজের কথাতে, আমি আন্দোলন করছি শিশুদের স্বার্থে। আমার আন্দোলনের কথা যদি একজনও অভিভাবকের মনে রেখাপাত করে, একজনও যদি আমার বক্তব্যের যথার্থ অনুধাবন করেন এবং নিজের জীবনে তা অনুসরণ করেন তাহলেও তো কিছু না কিছু লাভ হল।

প্লাকার্ড হাতে সিদ্ধার্থ

বন্ধুরা বলে পাগল, বাড়ির লোকেরা কোন কাজেই ভরসা করে না তার উপর তবু সিদ্ধার্থ এলাকায় রীতিমত জনপ্রিয়। আর তার এই জনপ্রিয়তার মূলে কিন্তু সেই একটিই প্রসঙ্গ, শিশুদের জন্য সিদ্ধার্থের অনমনীয় একক আন্দোলন। প্রতিদিন হাওড়া থেকে শেয়ালদা যাতায়াত। ট্রামে করে। হাতের প্লাকার্ডটি তখন মোড়া থাকে চটের থলেতে।

এইরকম একই জায়গায় একইভাবে সাড়ে তিন বছর ধরে দাঁড়িয়ে আপনি কি শিশুদের জন্য কিছু করতে পেরেছেন বলে মনে করেন?

–সকলেই তো একটা না একটা আদর্শ নিয়ে আন্দোলন করে। আমিও সেই আদর্শ নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। কি করতে পেরেছি, না পেরেছি, সে তো আপনারাই বলবেন। আমার কথা হল, আমি যতদিন পারব শিশুদের স্বার্থে কথা বলে যাব, যদি কেউ আমাকে দেখে বিন্দুমাত্র উৎসাহিত বোধ করেন––কিংবা এগিয়ে আসেন তাঁদেরকে যথাসাধ্য সাহায্য করব, অনু-প্রাণিত করব।

কিন্তু এরকমভাবে দাঁড়িয়ে নীরব আন্দোলন করে যাওয়ার মধ্যে আপনার ভবিষ্যৎ কিছু রয়েছে বলে আপনি মনে করেন? আপনার জীবিকা অর্জনেরও তো প্রয়োজন রয়েছে।

–তা তো রয়েইছে। তবু আমি যতদিন পারি শিশুদের উন্নতির জন্য বলে যাব।

শিশুদেরকে যে আমরা কি চোখে দেখি তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে? খোদ কলকাতা থেকে শিশু পাচারকারীরা গোপনে শিশু পাচার করে দুবাইতে। বেশি দূর নয়-দমদম ক্যান্টনমেন্টের গেস্ট হাউস থেকেই এরকমই ১২টি দুধের শিশুই পাচার হয়ে যাচ্ছিল মার্চ '৯০ এর মাঝামাঝি। নেহাত কমলাপুর স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্যারা কমলাপুর গেস্ট হাউসের উপর নজর রেখে অপরাধীকে পুলিশের হাতে তুলে না দিলে কোনদিনই এ খবর ফাঁস হত না যে এ শহর থেকেই শিশু পাচার হয় আরব দেশে। ধনী মানুষের আমোদের উটের রেসের সময়ে ছোট্ট বাচ্চাগুলিকে উটের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়, উটের দৌড়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা চেঁচিয়ে কাঁদতে শুরু করে আর তাই শুনে উটেরা দীর্ঘশ্বাসে ছুটতে থাকে। অনাথ অসহায় শিশুগুলিকে যে শহরের

অভিসন্ধিপরায়ণ মানুষ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বেচে দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না, সেখানে শিশু স্বার্থ রক্ষার প্রসঙ্গটি যে নিতান্তই সাদামাটা একথা নতুন করে বলার নেই। কলকাতার শিশুদের দেখভাল যথাযথ হয় না বা হচ্ছে না একথা শুনতে নিশ্চয়ই ভাল লাগবে না। কলকাতাতেই রয়েছে বহু শিশু কল্যাণ সংস্থা, যাদের কাজ শিশুর যথার্থ বিকাশের জন্য জনগণকে শিশুর পিতামাতাকে যথার্থ শিক্ষিত করে তোলা। এঁরা আবার শিশু প্রদর্শনী করেও জনসাধারণের সামনে আগামী প্রজন্মের সুস্বাস্থ্য কতখানি প্রয়োজন সে বিষয়ে আলোচনা করেন। অলকেন্দু বোধ নিকেতনের মত সংস্থা তো রয়েইছে। এছাড়া রয়েছে মাদার টেরিসার নির্মল হৃদয় আশ্রয়। পথের শিশুদেরকে তুলে নিয়ে এসে যেভাবে এখানে মানুষ করে তোলা হয়, তার দৃষ্টান্ত খুব বেশি নেই। মূক বধির অনাথ শিশুদের জন্য কয়েকটি হোমও রয়েছে কলকাতাতে এবং কলকাতা সংলগ্ন শহরতলীতে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় তা মোটেই প্রতুল নয়।

আমরা যতখানি চাই শিশুদেরকে কি ততখানি গুরুত্ব সহকারে দেখাশোনা করা যাচ্ছে। আমাদের সরকার কি শিশু উন্নতির জন্য যথাযথ কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন? স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রশান্ত শূরের কথায়, আমরা সম্ভব মত রাজ্যের অধিবাসীদের স্বাস্থ্য সচেতন করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছি। গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য-কর্মীরা গিয়ে অন্য সবার সঙ্গে শিশু ও মায়েদের স্বাস্থ্যের দেখভাল করেন। তাছাড়া কলকাতাতেও তো কয়েকটি চাইল্ড ওয়েল ফেয়ার সংস্থা কাজ করছে। কয়েকটি সমাজসেবী সংস্থা উদ্যোগ নিয়ে শিশুদের মঙ্গলে কাজ করছেন। পুজোর সময়ে বহু ক্লাব শিশুদের জন্য ফলমূল, কাপড় চোপড়, শীতবস্ত্র বিতরণ করেন।

শিশুদের উন্নতির চেহারা দেখতে অন্য কোথাও যেতে হবে না। বাড়ির
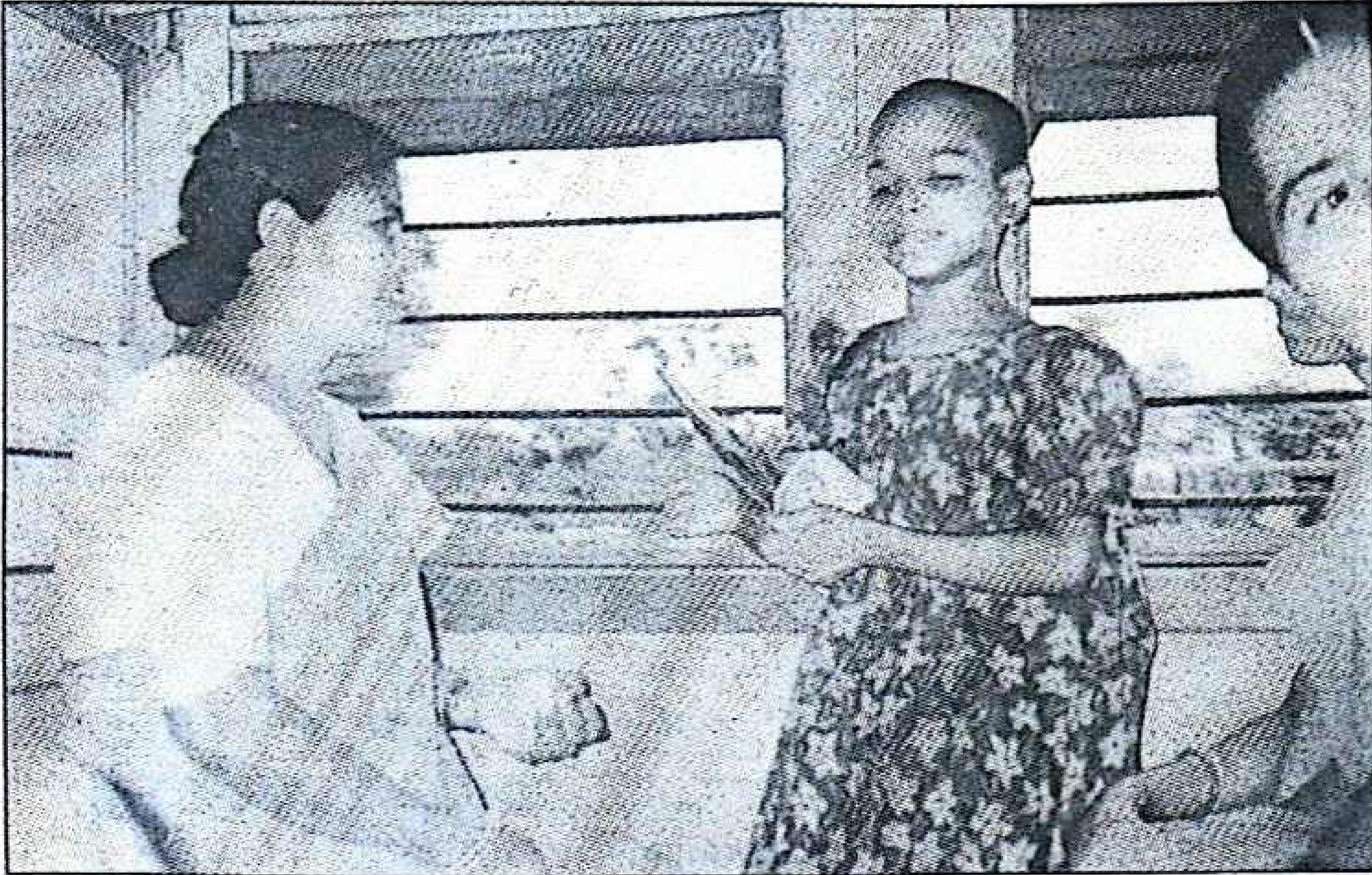
লটারির টিকিট বিক্রিরত শিশু

পাশের চা দোকানে কিংবা রেস্টুরেন্টের বয়দের দিকে তাকালেই চোখে পড়বে। জীর্ণ কংকালসার দেহ, বুকের পাঁজরায় সব কটি হাড় স্পষ্ট, হাড়-গুলিকে আবৃত করে আছে ধুলিকালি মাখা চামড়া। মাথায় রুক্ষ চুল, অবিন্যস্ত। পায়ের প্যান্টটি পর্যন্ত ময়লা চিটচিটে। এদের উপর দিয়েই চলে মালিকের লাভের গুড় সংগ্রহ। বেচারা কাজের শিশুরা পুজোর সময়ে একটা নতুন পোশাক তৈরির জন্য স্বপ্ন দেখে চলে। হাতে যা মাস মাইনে পায়, তা না বলাই ভাল। অনেককেই তো শুধুমাত্র পেটভাতা কাজ করতে হয়।

পেটভাতা যারা করতে রাজি হয় তাদেরও কি কম খাটতে হয়। আজও কলকারখানায় শিশু শ্রমিকদের দিয়ে নির্মমভাবে কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। হাতে যা দেওয়া হচ্ছে তাতে নিজের পেটই চলে না।

শ্রীমতী পদ্মা খাস্তগীর বললেন, আমাদের আইনে আছে শিশুদের কার-খানার কাজে ব্যবহার করা হলে তা রীতিমত অপরাধ বিবেচিত হবে। অথচ আশ্চর্য সমাজ আমাদের, আজ যেদিকেই চোখ পড়ে শিশুদেরকে নির্মম ভাবে ব্যবহার করিয়ে নিচ্ছি আমরা। অথচ আমরা নিজেদের সমাজ সচেতন বলে কতই না বড়াই করি। আমার তো মনেই হয় না, শিশুদের জন্য আমরা তেমন কিছু করে উঠতে পারছি।

স্টেশন তাহেবপুরের তুলসীকে আজ শিয়ালদা লাইনের লালগোলা ফাস্ট প্যাসেঞ্জার বা অন্য কোন লোকাল ট্রেনের নিত্যযাত্রীরা অবশ্যই চেনে। ছোট্ট মেয়েটি, রিনরিনে গলায় চমকে দেয় ট্রেনের কামরার প্রত্যেককে। বলে, 'দাদারা, কাকুরা, দাদুরা—রেল গাড়িতে চলার পথে কত সময় কত টাকা আপনারা খরচা করেন। মাত্র এক টাকার বিনিময়ে আপনি আপনার ভাগ্য বদলে ফেলতে পারেন—পেতে পারেন এক লক্ষ টাকা। আজকের খেলা সিকিম লটারি। প্রথম পুরস্কার এক লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার পঞ্চাশ হাজার, তৃতীয় পুরস্কার...।' তুলসীর দিবারাত্রির কাব্য এই। মা বাবা ভাই বোনের জন্য ছোট্ট মেয়েটির কি অমানুষিক পরিশ্রম। শুধু তাহেবপুরের তুলসীই নয়, কত শত তুলসীকেই লটারি টিকিট বিক্রি করতে হয়, দৈনিক সংবাদপত্র বিলি করতে হয়। যাদের মন্দ ভাগ্য তাদেরকে কাজ করতে হয় পরের বাড়িতে। রান্নাবান্না, বাজার হাট করার পরও কপালে জোটে অকথ্য গালাগাল। চড়-চাপড়ও যে বাদ যায় তা নয়। তবু শিশুদের লাঞ্ছিত হতে হয় বারংবার।

সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক তরুণটি শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী, বললেন, আমার আন্দোলন আমার নয়, সবার। আমি মনে করি একদিন জনগণ আমার মতে সামিল হয়ে শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু চিন্তা ভাবনা করবেন তাই নয়, তাদের যথার্থ বিকাশের সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলবেন।

—কিন্তু এই একক আন্দোলন চালিয়ে আপনি কতটুকু এগোতে পারবেন?

—আন্দোলন একক থাকে না, বিস্তৃতি পায়। একদিন সবাই আমার উপ-লব্ধ সত্যকে সত্য বলে মানবেন, তবেই সার্থক প্রজন্মের নয়া নির্মাণ সম্ভব হবে।

গুরুপ্রসাদ মহান্তি ●

রবীন্দ্রকুমারের একক আন্দোলন : প্রতিবাদ নাকি পাগলামি

৭ আগস্ট '৮৯, যন্তর মন্তর ও পার্লামেন্ট এলাকার রাস্তা ও ফুটপাতে উপচে পড়া ভিড়। সকল পথচারীর দৃষ্টি তখন এক বিরল দৃশ্যের দিকে। ফুটপাতে বসেছিলেন প্রায় পঞ্চাশ জন, জুতো পালিশ করতে। সকলেই সুটেড বুটেড। গলায় ঝুলছিল ডাক্তারি ও ইঞ্জিনিয়ারিং–এর সার্টিফিকেট। ডাক্তারদের গলায় স্টেথোস্কোপ পর্যন্তও ছিল। পেশাদার জুতো পালিশকারীদের মতই বসেছিলেন তাঁরা। জুতো পালিশ করার জন্য অনেকেই ভিড় জমিয়েছিল। কিন্তু তাঁরা কারুর কাছ থেকেই পয়সা চান নি। কেবল স্বইচ্ছায় যারা দিয়ে যাচ্ছিল তাদেরটাই নিচ্ছিলেন।

এই সব ডাক্তার আর ইঞ্জিনিয়ারদের এমন কান্ডের পিছনে আসল উদ্দেশ্য কি? প্রতিবাদ, বেকারত্বের প্রতি ক্ষোভ। শত দারিদ্রতা সত্বেও যারা হাজার কষ্টে ডাক্তারি ও ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ঘুষের টাকা না দিতে পারায় চাকরি পান নি, স্বজনপোষণের শিকার হয়েছেন, তাঁরাই সেদিন এমনি অভিনব প্রতিবাদে নেমেছিলেন। রোজগারের জন্য নয়। চেয়েছিলেন তাদের ক্ষোভ নেতাদের কানে পৌঁছে দিতে। আর এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভারতীয় মুক্তি মোর্চার প্রেসিডেন্ট রবীন্দ্রকুমার। যাই হোক, এই ঘটনা সেদিন হাজার হাজার পথচারীর মধ্যে বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

ওই সব বেকার ডাক্তার ইঞ্জিনিয়াররা সকাল থেকে বিকেল অবদি জুতো পালিশ করে সেদিন ২৮৬ টাকা ১৫ পয়সা রোজগার করেন। তারপর তাঁরা রবীন্দ্রকুমারের নেতৃত্বে তৎকালীন কেন্দ্রিয় শিক্ষামন্ত্রী শিবশংকরের বাড়ি যান এবং প্রতিবাদ স্বরূপ তাঁকে সারাদিনের রোজগার দিয়ে আসেন। এই প্রতিবাদের লাভ কি হল সে হিসেবে না গিয়ে তারা যে আগামী প্রজন্মের কাছে নজির সৃষ্টি করলেন তা বলাই বাহুল্য।

এই বিক্ষোভ রবীন্দ্রকুমারের প্রথম কিংবা অন্তিম নয়। এমন অভিনব প্রতিবাদ পন্থা তিনি প্রায়শই দেখিয়ে আসছেন। কেউ তাঁর সমালোচনা করছেন, কেউবা সমবেদনা জানাচ্ছেন। কেউ ভাবছেন এসব নিতান্তই স্টান্ট, কেউ বা উপলব্ধি করছেন এসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য, যা প্রকৃতই প্রতিবাদের। সব মিলিয়ে রবীন্দ্রকুমার এখন রাজধানীর বিতর্কিত পুরুষ।

অভিনব প্রতিবাদ

যে সরকারই হোক, অব্যবস্থা দেখলেই তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন রবীন্দ্রকুমার। কিন্তু তাঁর সেই গর্জনের ভাষা একেবারেই তাঁর নিজস্ব।
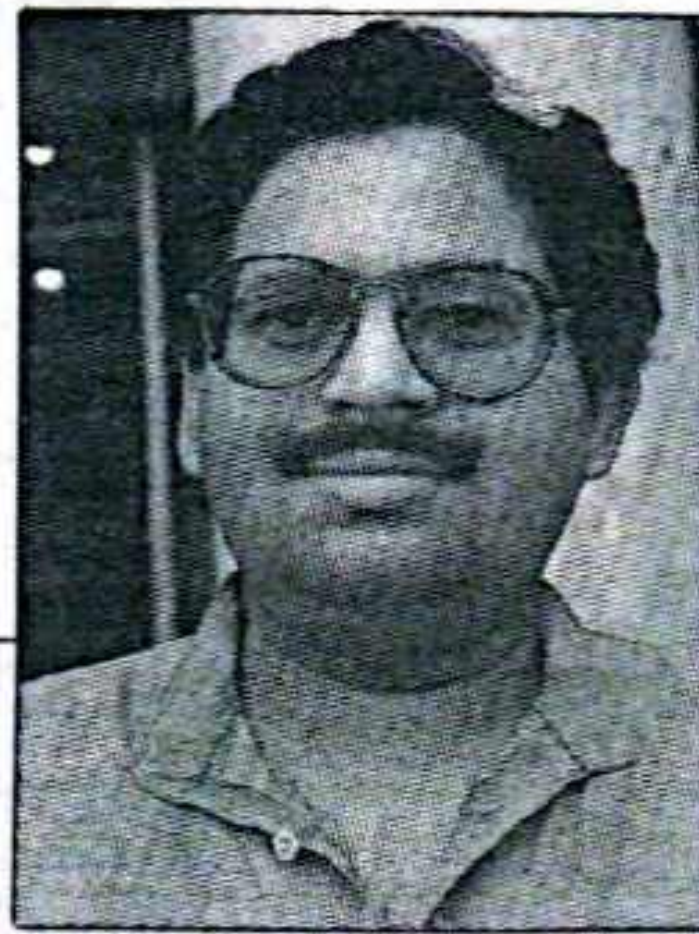
রবীন্দ্রকুমার

কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে এমন প্রতিবাদের প্রেরণা তিনি পেলেন কোত্থেকে?

বলতে গেলে সেইসব দিনে ফিরে যেতে হবে যখন রবীন্দ্রকুমার দিল্লি ইউনিভার্সিটির আইনের ছাত্র। সে সময় ল' ফ্যাকালটির এক প্রফেসর খুবই বদ মেজাজের ছিলেন। তিনি আবার বিভাগীয় প্রধানও। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী পরীক্ষার খাতা বিভাগীয় প্রধানই দেখেন। সেই সুযোগই নিতেন ওই প্রফেসর। পছন্দসই ছাত্রদের ভাল নম্বর দিতেন। যাদের অপছন্দ করতেন তারা যতই ভাল পরীক্ষা দিক না কেন খুব কম নম্বর দিয়ে রেকর্ড খারাপ করতে দ্বিধা করতেন না।

প্রফেসরের এই মর্জির খবর পান রবীন্দ্রকুমার। খোঁজ খবর নেন। তারপর ছাত্র ছাত্রীদের একত্র করে সাহসের সঙ্গে এর বিরোধিতায় নেমে পড়েন। তাঁর প্রতিবাদের পথও ছিল অভিনব। ওই প্রফেসর ক্লাসে এলেই রবীন্দ্রকুমার ও তাঁর সঙ্গীরা চুপচাপ একটি আঙুল ওপরে উঠিয়ে দেন। কিছু বুঝে উঠতে না পেরে প্রফেসর ছাত্রদের চোখ রাঙাতে থাকেন, কিন্তু সকলেই তখন চুপচাপ। কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না প্রফেসর।

সেইদিন থেকে ওই ভাবে আঙুল তোলা নিয়মে দাঁড়িয়ে যায়। প্রফেসর ক্লাসে এলেই সেই একই ঘটনা। ক্রমেই ক্লাস থেকে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যান্য ক্লাসেও সেই একই ঘটনা দেখা যায়। এমন কি রাস্তাঘাটেও ছাত্রছাত্রীরা ওই প্রফেসরকে দেখলেই আঙুল তুলতে শুরু করে।

প্রফেসরও খুব অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়েন। ছাত্রছাত্রীরা মুখে কিছু না বলায় তাদের বিরুদ্ধে কিছু করতেও পারছিলেন না। কিছু দিনের মধ্যে ইউনিভার্সিটির সকল ছাত্রছাত্রীরাই ওই প্রফেসরকে দেখলে আঙুল তোলা শুরু করে দেয়। তাঁর নামও হয়ে যায় 'অঙ্গুলি প্রফেসর'। ছাত্রদের এই ব্যবহারের ফলে প্রফেসর শেষ পর্যন্ত নিজের গদি তো ছাড়েন, এমন কি ইউনিভার্সিটিও ছেড়ে দেন। ঘটনাটি ১৯৮৪–র। এই সাফল্যে রবীন্দ্রকুমারের উৎসাহ বেড়ে যায়। মনে করেন কোন অব্যবস্থায় এই রকম প্রতিবাদে ভাল ফল পাওয়া যায়।

শান্ত স্বভাবের অত্যন্ত মিশুকে রবীন্দ্রকুমার সাধারণ পরিবারের ছেলে। বড় বড় বুলি, মিথ্যা কপটের রাজনীতির প্রতি ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রকুমার ছুটে যান অব্যবস্থার শিকার সাধারণ মানুষদের পাশে। এবং দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে অভিনব পদ্ধতিতে ক্ষোভ দেখান। তিনি মনে করেন নেতাদের মিথ্যা ভাষণ ও মিথ্যা আশ্বাসে মানুষেরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ভাষণবাজীর প্রতি কারুর আর আস্থা নেই। তাই ক্ষোভ প্রদর্শন হোক প্রতীকী। মানুষকে আকর্ষণ করুক। ভাবাক।

২৮ আগস্ট '৮৯ রবীন্দ্রকুমার লালকেল্লা থেকে টাউন হল অবদি এক অভিনব মিছিল করেন। এই মিছিলটি ছিল দিল্লির পৌর অধিপতি মহেন্দ্র সিংহ ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে। মিছিলে ছিল চারটি হাতি এবং কিছু লোকও মুখে হাতির মুখোশ পরেছিল। মিছিলে লিখিত শ্লোগান ছিল–'মহেন্দ্র সিং সাথী, ভ্রষ্টাচার কা হাতি।'

এমনি এক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন গত ২৬ সেপ্টেম্বর '৮৯ পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স–এ। এই বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছিল কৃষ্ণনগর ও শকরপুরের 'এস আর এন্টারপ্রাইজেজ' নামক সংস্থার কোটি টাকার নয়ছয় ও পুলিশের অকর্মন্যতার বিরুদ্ধে। বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল থালা বাটি বাজিয়ে।

এর ঠিক দু'দিন পর ২৮ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রকুমার সুপ্রীম কোর্টের সামনে বিচারকের দুর্নীতিবাজ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে 'নাক কাট' বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের সামনে কোর্টের কর্মচারীদের মূর্তি বানিয়ে তলোয়ার দিয়ে নাক কাটা হয়েছিল। পরে প্রধান বিচারপতির কাছে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়। বিহারের সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধেও তিনি ভালুক, বাঁদর, গাধা, সাপ ইত্যাদি জানোয়ারদের নিয়ে পার্লামেন্টে বিক্ষোভ জানান।

এইসব বিচিত্র বিক্ষোভ প্রদর্শনই শুধু নয়, রবীন্দ্রকুমার আরও অনেক বিচিত্র কাজও করেন। তিনি প্রত্যেক বছর 'চামচা অব দ্য ইয়ার' নামক রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেন। এই পুরস্কার স্বরূপ তিনি নির্বাচিত ব্যক্তিকে জোড়া চামচের শিল্ড, রূপোর জুতো আর এক কেজি মাখন দেন। এই রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য তিনি ১৯৮৬-তে ভজনলাল, ১৯৮৭-তে সতীশ শর্মা, ১৯৮৮-তে সুধাকর পাণ্ডে এবং ১৯৮৯-তে কল্পনাথ রাইকে নির্বাচিত করেন। অবশ্য পুরস্কৃত ব্যক্তিরা পুরস্কার গ্রহণ করেন নি। ১৯৯০-র জন্য এখন নির্বাচন চলছে।

রবীন্দ্রকুমার আলাদা একটি দলও গড়েছেন। নাম –'ভারতীয় অবসরবাদী দল' (ভারতীয় সুবিধাবাদী দল)। এই দলের প্রতীক 'চেয়ারে হেলান দেওয়া নেতা'। অবসরবাদী দলের ঘোষণাপত্রও বিচিত্র। –'আমি দুর্নীতি বাড়ানোর প্রতিজ্ঞা করছি। চরিত্রবানদের উপেক্ষা করা হবে।' পঁচিশটি অনুচ্ছেদের এই কর্মপন্থার শেষ ঘোষণাটি হল–'ঘোষণাপত্রটিকে যে কোন সময় উপেক্ষা করা হবে।'

অবসরবাদী দলের ব্যানারে রবীন্দ্রকুমার ১১ অক্টোবর '৮৯ তে কনট প্লেসের সেন্ট্রাল পার্কে 'কুর্সীযজ্ঞ' করেন! যজ্ঞবেদীর পাশে ১১ ফুট উঁচু চেয়ার রাখা ছিল, যার ওপর প্রধানমন্ত্রীর মুখোশ পরে একটি লোক বসেছিল। যজ্ঞের পরে চেয়ারটিকে আরতিও করা হয়।

রবিন্দ্রকুমার বোফোর্স নিয়েও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ১১ সেপ্টেম্বর '৮৯ ভারতীয় মুক্তি মোর্চা এক হাজার গ্যাস বেলুন ওড়ায়। ওই সব বেলুনের ওপর লেখা ছিল 'বোফোর্স দালালের নাম বলো, ১০০ টাকা পুরস্কার জেতো।' এরপর স্বকল্পনায় ২৬ অকটোবর রবীন্দ্রকুমার রাজীব গান্ধীকে ১০০টি চশমা ভেট পাটান। সঙ্গে যে চিঠিটি ছিল তাতে লেখা–'এইসব পরে আয়নায় মুখ দেখুন, বোফোর্স দালালের চেহারা দেখতে পাবেন।'

২৭ অকটোবর নেহরু শতাব্দীতে ভারতীয় মুক্তি মোর্চা অফিসে বোফোর্স কেক কাটা হয়। কেকটি ছিল বোফোর্স কামানের মতোই দেখতে। ওই অনুষ্ঠানে চারটি লোক রাজীব গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী, বুটা সিং ও সতীশ শর্মার মুখোশ পরে উপস্থিত ছিল। অনুষ্ঠানের নাম 'নাতি কি ভেট নাতা কে নাম'। ১৮ ডিসেম্বর বোফোর্স জুতো তৈরি করে মুক্তি মোর্চার কার্যালয়ে প্রকাশ্যে বোফোর্স দালালকে পরানো হয়।

ইণ্ডিয়া গেটের সামনে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি বসানো নিয়ে বিতর্ক উঠলে ২৯ জানুয়ারি '৯০ রবীন্দ্রকুমার একটি লোককে মহাত্মা গান্ধী সাজিয়ে ইণ্ডিয়া গেটের সামনে দাঁড় করিয়ে দেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি মেহাম ঘটনার পর তার প্রতিবাদে মুক্তি মোর্চা হরিয়ানার সবুজ উর্দি পোড়ান। ১২ মার্চ তেরজনের মাথা কমিয়ে হরিয়ানা ভবনের সামনে মেহাম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানান। এবং সেই তেরজনের মাথার চুল লোকসভার স্পিকার রবি রায়কে উপহার দেন।

১৫ মার্চ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্মাণ ভবনের সামনে মহিলা সিগারেট এম এস এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। প্রতিবাদ স্বরূপ মুক্তি মোর্চা নির্মাণ ভবনের সামনে ২০ ফুট লম্বা সিগারেট জ্বালান। এই বিক্ষোভে বাচ্চারা শ্লোগান দিয়েছিল–'মাম্মি কো মাম্মি সিগারেট দো, বাচ্চো কা সিগারেট'।

২৬ মার্চ চৌতালার চেয়ারের প্রতীক স্বরূপ ১১ ফুট উঁচু একটি চেয়ার পোড়ান হয়। ২৫ এপ্রিল পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে রবী কুমারের নেতৃত্বে বেনজিরের চিতা ও পাকিস্তানের পতাকা জ্বালানো হয়। ১৫ মে শঙ্করাচার্য স্বামী স্বরূপানন্দ সরস্বতীর গ্রেফতারের প্রতিবাদে মুক্তি মোর্চার সদস্যদের দেব দেবী সাজিয়ে মিছিল করেন রবীন্দ্রকুমার। ২৫ মে প্যাটেল চকে ওমপ্রকাশ চৌতালার শবযাত্রাও বের করে মুক্তি মোর্চা।

এই ভাবে সরকার রাজীব গান্ধীর হোক কিংবা ভি পি সিং–এরই হোক রবীন্দ্রকুমার কারুর মধ্যে প্রভেদ দেখেন না। তিনি সরকারের সমস্ত অব্যবস্থার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন।

সর্দার জগমোহন সিংহ, ডাঃ রস্তোগী, হেমন ভাটিয়া, আর এন তিওয়ারি এবং কুমারী চন্দ্রকান্তা ভারত মুক্তি মোর্চার সদস্য। জগমোহন সিংহ ভারত মুক্তি মোর্চার সচিবও। সেই সঙ্গে বিক্ষোভ প্রদর্শনগুলির ছবিও তোলেন।

রবীন্দ্রকুমার নিজেই সুপ্রীম কোর্টের একজন আইনজীবী কিন্তু তাঁর বেশির ভাগ সময় যায় মুক্তি মোর্চার কাজে। তাঁর স্ত্রী পরমজিৎ কউর সংসদের একজন গেজেটেড অফিসার। রবীন্দ্রকুমারের আরেক পরিচয় তিনি কবি এবং লেখক। সম্প্রতি তাঁর একটি কবিতা সংগ্রহ 'খিড়কী সে কুদতা জঙ্গল' প্রকাশিত হয়েছে।

পুষ্কর পুষ্প

ছবি: বিনোদ কুমার

ডঃরাহী মাসুম রেজা

'মহাভারত' শুধু হিন্দুর নয় সারাজাতির সম্পদ

প্রতিবেদককে বেশ জোর দিয়েই একথা বললেন 'মহাভারত' সিরিয়ালের সার্থক চিত্রনাট্যকার ও সংলাপ লেখক ডঃ রাহীমাসুম রেজা। ধর্মে মুসলমান হয়েও এই গুণী লেখক এই মহাকাব্যের সুবিশাল কাহিনী, এর অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শ এবং এদেশের চিত্রভূমিতে প্রতিষ্ঠিত বহু পরিচিত চরিত্র অডিওভিস্যুয়াল মাধ্যমে সার্থকভাবে পৌঁছে দেবার এক দুরুহ কাজ সম্পন্ন করে স্মরণীয় হয়ে রইলেন। ভাষা, ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক বৈষম্য অতিক্রম করে ৭০ কোটি ভারতবাসীর হৃদয়মূলে গোটা 'মহাভারত'–এর সম্পূর্ণ কাহিনীটি ৯৩টি এপিসোডে পৌঁছে দেওয়ার কাজটি খুব সহজ সাধ্য ছিল না। গত দুবছর ধরে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান–ভারতের সব ধর্মের সব প্রদেশের সব ভাষার লোকেরাই 'মহাভারত' সিরিয়াল অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে দেখেছেন। ভগীরথ যেমন গঙ্গাকে মর্তলোকে পৌঁছে দিয়ে কোটি কোটি মানুষের উপকার করেছিলেন, বি·আর· চোপরাও তেমনি ৭০ কোটি ভারতবাসীর কাছে 'মহাভারতের' অমৃতকথা পৌঁছে দিয়ে এক মহান ব্রত উদযাপন করলেন। ফিল্ম মূলত পরিচালকের মাধ্যম হলেও, এক বলিষ্ঠ চিত্রনাট্যই এক ফিল্মের (এ ক্ষেত্রে সিরিয়াল) বুনিয়াদ। চিত্রনাট্য আর সংলাপ সবল না হলে কোনো পরিচালকই ছবি জমাতে পারেন না। 'মহাভারত' সিরিয়ালের এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন, সিরিয়ালের অন্তিম এপিসোড শেষ হতেই 'আলোকপাত'–এর পক্ষ থেকে সেই ডঃ রাহীমাসুম রেজার সঙ্গে কথা বলার জন্যে আমরা ওঁর বান্দ্রার বাড়ীতে একদিন বিকেলে পৌঁছে গেলাম।

'মহাভারত'–এর মত বিশাল কাহিনী, যার অজস্র সাব-প্লট বা উপকাহিনী, অজস্র চরিত্র, তাকে গুছিয়ে ৯৩ পর্বে জাতিকে শোনানোর পেছনে ওঁদের প্রস্তুতি কিরকম ছিল, কিভাবে ডঃ রেজা এই দুরুহ কাজ সম্পন্ন করলেন সে–সব নেপথ্য কাহিনী শোনাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য।

তার আগে ডঃ রাহীমাসুম রেজার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে রাখি। ডঃ রেজা আজ হিন্দি চলচ্চিত্রের এক অত্যন্ত সফল চিত্রনাট্যকার ও সংলাপ লেখক। এই কাজে নিযুক্ত আছেন ১৯৬৭ সাল থেকে। দীর্ঘ ২৩ বছরে অনেক ছবির চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন, তবে ওঁর নিজের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে হৃষিকেশ মুখার্জির 'মিলি', 'গোলমাল', 'কিসিসে না কহনা' আর রাজ খোসলার 'ম্যায় তুলসী তেরে আঙ্গন কী'। আত্মপ্রচারে বিমুখ ডঃ রেজা উর্দু সাহিত্যের এক প্রগতিশীল কবি ও লেখক। এক স্বতন্ত্র শৈলী ওঁর কবিতাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। কথা সাহিত্যেও ওঁর অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত ওঁর স্বতন্ত্র শৈলীর ৮টি উপন্যাস। হিন্দিতে এবং উর্দুতে ছোটগল্পও লিখেছেন অনেক। হিন্দিতে ওঁর কবিতার সংকলন রয়েছে ৩টি, উর্দুতে এপর্যন্ত ১টি। ১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধের ওপর ওঁর হিন্দিতে লেখা একটি বিশাল-কাব্যের জন্য উনি যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেন। লিটারেরী ক্রিটিসিজম–এর ওপর দুটি জনপ্রিয় গ্রন্থ সাহিত্য মহলে ওঁকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে। উত্তরপ্রদেশের অধিবাসী ডঃ রাহীমাসুম রেজা ডক্টরেট লাভ করেন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। হিন্দি এবং উর্দু দুই ভাষায় ওঁর অসামান্য অধিকার ওঁকে লেখক হিসাবে এক সফল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বিশিষ্ট হিন্দু পণ্ডিত নরেন্দ্র শর্মা আর আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির

ডক্টরেট বিদগ্ধ মুসলমান ডঃ রেজা একত্রে বসে, একসঙ্গে ভেবে যে এই এপিক সিরিয়ালের চিত্ররূপ তৈরি করেছেন সেটা এক মহৎ ঘটনা কিনা জিগ্যেস করলে ডঃ রেজা বললেন, 'এদেশে হিন্দু ও মুসলমান মিলেমিশে একসঙ্গে কাজ করে আসছেন সুদীর্ঘ কাল ধরে। তাই 'মহাভারত' নিয়ে একসঙ্গে কাজ করাটা নতুন কিছু বলে আমার মনে হয়না। যাঁরা মনে করেন 'মহাভারত' শুধুমাত্র হিন্দুদের এক মহাকাব্য বা ধর্মগ্রন্থ আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। 'মহাভারত' আমাদের গোটা দেশের জাতীয় ঐতিহ্যের এক গৌরবময় অংশ। এটি তাই আর দশজনের মত আমারও।'

ডঃ রাহীমাসুম রেজার এই ঘোষণা যে কতবড় সত্য তা এই সিরিয়ালের ব্যাপক জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করেছে। ভারতের সব ধর্মের, সব ভাষার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, আপামর জনসাধারণ, রাস্তার ভিখিরি থেকে প্রাসাদের ধনীরা পর্যন্ত প্রত্যেকেই 'মহাভারত' দেখার জন্যে পরমাগ্রহে অপেক্ষা করেছেন। খৃস্টানরা 'মহাভারত' দেখে তারপর রোববারে গীর্জার প্রার্থনায় যোগ দিতে এসেছেন। মুসলমানরাও এরমধ্যে মানুষের সার্বজনীন প্রতিচ্ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। কারো মনে হয়নি তাঁরা হিন্দুদের এক ধর্মগ্রন্থের ইতিকথা শুনছেন।

তবে এই বিশাল মহাকাব্যে ঘটনা আর উপঘটনাতো অনেক। প্রধান চরিত্রের সংখ্যা ত প্রায় ৬০ এর কাছাকাছি। তাছাড়া ছোটখাট চরিত্র আরও কত।' সিরিয়ালে কৌরব ও পাণ্ডবদের পারিবারিক কলহের মূল কাহিনী শোনাতে গিয়ে উপকাহিনীগুলো কিভাবে বর্জন ও গ্রহণ করা হয়েছিল, এই প্রশ্নের জবাবে ডঃ রেজা বললেন: 'দর্শকদের আগ্রহ বজায় রাখার মূল কাহিনী শোনাতে গিয়ে গৌণ ও অপ্রয়োজনীয় সাব-প্লট বেশ কিছু আমাদের বর্জন করতে হয়েছে। আমরা সবাই মিলে আলোচনা করে ঠিক করে নিয়েছিলাম মূল কাহিনীকে একটি নির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত রাখতে কোন কোন উপকাহিনী বাদ দেওয়া সমীচীন হবে। এরজন্যে দরকার ছিল মহাকাব্যটি ঠিকমত এডিট করা। এই ব্যাপারেও পণ্ডিত নরেন্দ্র শর্মার অবদান অনেক।'

প্রশ্ন: চিত্রনাট্য এবং সংলাপ লিখতে গিয়ে আপনি নিশ্চয়ই এই মহাকাব্যের কিছু বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সবচেয়ে কোন বিষয়টি আপনাকে বেশি প্রভাবিত করেছিল, বা এখনও করে?

রেজা বললেন, 'এই মহাকাব্যের যে বৈশিষ্ট্যটি আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে তা হল এর কনফ্লিকটস্ বা সংঘাত। আর চরিত্রদের ডায়লামা বা অন্তর্দন্দ্ব। 'মহাভারত'—এর সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হল এতে কোনো চরিত্রই পুরোপুরি 'হোয়াইট' আবার পুরোপুরি 'ব্ল্যাক' নয়। 'গ্রে' চরিত্রই বেশি। 'গ্রে' বলতে বোঝাচ্ছি ভালো মন্দে মেশানো মানুষ। প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যেই ভালও আছে আবার মন্দও আছে। কোনো চরিত্রই সম্পূর্ণ ন্যায় এবং সম্পূর্ণ অন্যায়ের ওপর দাঁড়িয়ে নেই। এতেই চরিত্রগুলো হয়েছে হিউম্যান, মনুষ্যোচিত। তাই মানুষের কাছে গ্রহণীয়। ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে এরকম ভালোমন্দে মেশানো চরিত্র দেখা যায়না। তারা হয় খুব ভালো হয়, নয়ত খুব মন্দ হয়। সম্ভবত এই বিশেষগুণের জন্যেই 'মহাভারত' প্রায় তিন হাজার বছর পরেও মানুষের মধ্যে এমন জনপ্রিয় হয়ে আছে।'

প্রশ্ন: বৈষম্পায়ন ব্যাসের মুখ থেকে 'মহাভারত'—এর কথা শুনে পরে জণমেজয়ের সভায় এই কাব্যকথা যখন শোনান তখন এর কলেবর ব্যাপকভাবে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল পঞ্চাশ হাজার শ্লোকে। আর তখনই এর নাম হয়ে ওঠে ভারত কাব্য, মহা কথাটা যুক্ত হয়েছে আরও পরে। তাই পৃথিবীর বৃহত্তম মহাকাব্যে 'মহাভারত' এক 'এপিক অব গ্রোথ'। এর কলেবর একদিনে তৈরি হয়নি। এ সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা? আর এই মহাকাব্য নিয়ে সিরিয়াল তৈরি করতে গিয়ে আপনারা, রামানন্দ সাগর যেমন 'রামায়ণ' সিরিয়ালের জন্য আঞ্চলিক 'রামায়ণ'গুলোও দেখে নিয়েছিলেন। তেমনি আঞ্চলিক ভাষার 'মহাভারত' গুলো দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি কেন?'

ডঃ রাহীমাসুম রেজা বললেন 'বেদব্যাস যে কাব্য লিখেছিলেন তার আদিনাম ছিল 'জয়' কাব্য। সেটা লেখা হয়েছিল সাত হাজার শ্লোকে। আজ যে 'মহাভারত' আমরা সংস্কৃতে পাই তাতে আছে একলক্ষ শ্লোক। তাই এপিক অব গ্রোথ তো বটেই। প্রায় ৯৭ হাজার শ্লোক বেদব্যাস লেখেননি। পরবর্তী ন্যারেটাররা অনেক ঘটনা, অনেক নীতিকথা যোগ করেছেন। বিভিন্ন ভাষার 'মহাভারত' মানে, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় মূল মহাকাব্যের ইনটারপ্রিটেসন—ব্যাখ্যা। আমরা যদি সে-সব নিয়ে বসতাম তা হলে ভীষণ কনফিউসনে পড়তে হত। তাই এখন দেবব্যাসের নামে সংস্কৃতে যে মূল 'মহাভারত' পাওয়া যায় আমরা তাকেই ভিত্তি করে কাজে নেমেছি। পণ্ডিত নরেন্দ্র শর্মা সংস্কৃত ভাষায় বিরাট পণ্ডিতব্যক্তি ছিলেন। তিনিই আমাদের সংস্কৃত ভাষা থেকে কাহিনীর মূল কাঠামো তুলে দিয়েছেন। আমি সংস্কৃত জানিনা, তাই সংলাপ রচনার সময় আমার অবলম্বন ছিল পি·লাল—এর ইংরেজী অনুবাদ, গীতা প্রেসের দ্বারা প্রকাশিত 'মহাভারত'—এর হিন্দি অনুবাদ আর ১৯১৪ সালে প্রকাশিত এক উর্দু অনুবাদ। তারমধ্যে পি·লাল—এর অনুবাদই আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছে।'

প্রশ্ন: কেউ কেউ বলেছেন চিত্রনাট্যকারের কাছ থেকে সহানুভূতি লাভ করে দুর্যোধন চরিত্রটি শেষের দিকে এক সার্থক ট্র্যাজিক হিরোতে পরিণত হয়েছে। দুর্যোধনই অধর্মের প্রতীক। তার পতনে আমরা উল্লসিত না হয়ে তার জন্যে করুণা বোধ করেছি, যেটা ট্র্যাজিক নায়কের প্রকৃত লক্ষণ। এ সম্বন্ধে আপনি কি বলতে চাইবেন?

ডঃ রাহী মাসুম রেজা বললেন: 'না, 'মহাভারত' এক ট্র্যাজিক কাব্য নয়, এক পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট, ধর্মের জয়কে প্রতিষ্ঠিত করাই এর শেষ লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই লেখা হয়েছে। তবে 'মহাভারত'—এর দুর্যোধন এবং 'রামায়ণ'—এর রাবণ এই দুটো চরিত্রের মধ্যেই মহৎ ট্র্যাজিক ক্যারেকটার হবার মত সেরকম ডাইমেনসন আছে, ট্র্যাজিক লক্ষণগুলো রয়েছে। বাল্মিকী যদি রাবণকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে মহাকাব্য 'রামায়ণ' লিখতেন তাহলে এটি সার্থক ট্র্যাজিক কাব্য হতে পারত। আমরা যদি দুর্যোধনকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে সিরিয়াল লিখতাম তাহলে এটিও ট্র্যাজিডি হয়ে উঠত। রাবণ এবং দুর্যোধন দুজনেই বীর এবং কিছুটা গুণান্বিত। তাঁরা তাঁদের জীবনে করুণ পরিণতি ডেকে এনেছেন তাঁদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা—উচ্চাশা, দম্ভ এসব দুর্বলতার জন্য—যা ক্লাসিক্যাল ট্র্যাজিক নায়কের লক্ষণ। শেষের দিকে দুর্যোধনের জন্য সহানুভূতি যেটুকু জাগে সেটা মূল কবিরই বিশেষত্ব। আগেই বলেছি, এই মহাকাব্যে সব চরিত্রই হিউম্যান, তারা ভালোমন্দে মেশানো মানুষ। বেদব্যাস মহাকাব্যের নাম রেখেছিলেন 'জয়' কাব্য। ধর্মের জয় দেখানোই ছিল উদ্দেশ্য। দুর্যোধনের বিয়োগের ব্যাপারটা বড় নয়।'

প্রশ্ন: এই মহাকাব্যের কোন বিশেষ মহত্বের জন্যে অন্যান্য ধর্মের অগণিত দর্শককে এই সিরিয়াল দেখার জন্যে আকৃষ্ট করত বলে আপনার মনে হয়?

ডঃ রেজা বললেন: 'আবার বলছি, 'মহাভারত' শুধু এক হিন্দু মহাকাব্য বলে আমি কখনই মনে করিনা। প্রত্যেক মহানকাব্যই মেজাজ এবং সুরের দিক থেকে সেকুলার। সার্থক সাহিত্য কখনও সাম্প্রদায়িক হতে পারেনা। সত্যিকারের ক্রিয়েটিভ লেখক দেশ ও কালের উর্ধে উঠে সৃষ্টির বিষয়কে চিরকালের করে তোলেন। সংকীর্ণ গণ্ডীর মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের জন্যে তাঁরা লেখেন না। 'মহাভারত'ও সমগ্র মানুষের কথা বলেছে।'

প্রশ্ন: আপনার লেখা সংলাপই মূলত সিরিয়ালের কাহিনী শুনিয়েছে, আবার চরিত্রগুলো গড়ে তুলেছে। সিরিয়ালের সংলাপ সম্পর্কে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন: অত্যন্ত বলিষ্ঠ সংলাপের জন্যেই 'মহাভারত'—এর অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শ এমন হৃদয়গ্রাহী আর অতিপরিচিত চরিত্রগুলো এমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন: সংলাপ বড্ড বেশি থিয়েট্রিক্যাল হয়ে গেছে। আপনি সংলাপ লেখক হিসাবে এর জবাবে কি বলতে চাইবেন?

ডঃ রাহীমাসুম রেজা বললেন: 'মহাভারত'—এর মত বিপুল জনপ্রিয় এক এপিকের সংলাপ লেখা সত্যি ছিল দুরূহ কাজ। এ জায়গেন্টিক ওয়ার্ক। আমি স্বভাবতই খুব টেনসড ছিলাম। খুব সতর্ক থাকতে হয়েছিল। আমি

মহাভারত: সঙ্কটের মুহূর্তে পাণ্ডবেরা

ছবি: দুর্গাপ্রসাদ

জানতাম, আমাকে সংলাপ লিখতে হবে আজকের দর্শক সমাজের জন্যে। আজকের দর্শকের কাছে পৌরাণিক চরিত্রগুলো জীবন্ত করে তুলতে হবে, গ্রহণীয় করে তুলতে হবে, আমাকে এক ভাষার কথা ভাবতে হবে। কি সেই ভাষা? পৌরাণিক কিছু ছবির সংলাপের মত? না। তাতে চরিত্রগুলো দূরের মানুষই থেকে যাবে। আমি চাইছিলাম মানুষের কাছাকাছি ওঁদের নিয়ে আসতে। সংস্কৃত ঘেঁষা সংলাপ হলেও লোকে ওঁদের আপন করে নেবেনা। শক্ত হিন্দি ভাষায় সংলাপ বললেও কঠিন হয়ে যাবে। তখন আমার মনে হল এই সিরিয়ালের সংলাপ লিখতে হলে আমাকে ভাষার একটা স্টাইল, একটা বিশেষ শৈলী সৃষ্টি করতে হবে। অনেক ভেবে, অনেক চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত একটা ফর্মুলায় পৌছোলাম। ঠিক করলাম, সংলাপের ফরমেটটা অর্থাৎ গঠনটা হবে উর্দু আর ভোকাবুলারি বা শব্দরাজি হবে সংস্কৃতঘেঁষা হিন্দি। এই শৈলীতে সংলাপ লিখে আমি সফল হয়েছি বলে মনে করি। আর যারা বলেন, সংলাপ বড্ড বেশি নাটকীয়, তাঁদের বলব, এরকম সিরিয়ালের চরিত্ররা যখন জীবনের চেয়ে একটু বড়-লার্জার দ্যান লাইফ, তখন সংলাপও একটু সেরকম না হলে কি মানাত? না ম্যাচ করত না।'

প্রশ্ন: 'মহাভারত'—এর কোন চরিত্র সংলাপে রূপ দিতে গিয়ে আপনার সৃজনশীল মন সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছে?

ডঃ রেজা বললেন: 'বাবা-মা আর লেখকের মধ্যে পার্থক্য হল, বাবা-মায়ের কাছে একটি সন্তান সব সময়েই একটু বেশি প্রিয় হয়ে ওঠে। তবে পেশাদারী লেখকের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে সব চরিত্রই। সব চরিত্র ভালভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টাই আমাকে আনন্দ দিয়েছে।'

প্রশ্ন: 'গীতার' অংশে অভিযোগ উঠেছে শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণ হিন্দিতে অর্জুনকে বুঝিয়ে যখন গীতার সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন তখন মনে হল তিনি 'গীতা' থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন।

ডঃ রাহীমাসুমরেজা বললেন, 'কৃষ্ণ হিন্দিতে বলতে বলতে বিশেষ কথাগুলো 'সংস্কৃতে' বলায় ক্ষতি কিছু হয়নি, কারণ তখন সংস্কৃত ভাষাটা বিশেষ ভাষা হিসাবে চালু ছিল। বিশেষ বিশেষ বক্তব্যের ওপর জোর দিতে গিয়েই কৃষ্ণ যদি সংস্কৃত বলেন তা উদ্ধৃতি বলে মনে হবে কেন? উদ্ধৃতি বলে তখনই মনে হোত যদি কৃষ্ণ সংস্কৃত বলে অর্থাৎ শব্দের দ্বারা তা ব্যাখ্যা করতে বসতেন। অংশটির গুরুত্ব এবং গাম্ভীর্য বজায় রাখতে মূল গীতার অংশ রাখা আমরা প্রয়োজন মনে করেছি।'

প্রশ্ন: অনেকে বলেছেন ধর্মাশ্রয়ী পাণ্ডবেরা যখন কৃষ্ণের প্রশ্রয়ে ছল চাতুরী, মিথ্যা বলা আর নিয়ম লঙ্ঘন মেনে নিলেন তখন আর ধর্ম রইল কোথায়? এ সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

ডঃ রেজা বললেন, 'আসল কথাতো ধর্মের প্রতিষ্ঠা, দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণর মত মহাবীরেরা অধর্মের স্বপক্ষে লড়ছেন। ভীষ্ম বসে আছেন ইচ্ছামৃত্যুর বরদান নিয়ে, দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে, কর্ণ কবচ নিয়ে। অথচ এদের না সরালে ধর্মের জয় সম্ভব নয়। তাই কৃষ্ণ উপায় বার করলেন। কৃষ্ণ বলেছেন: উপায়টা কোনো কথা নয়, যে লক্ষ্য সাধনে উপায়টা নিচ্ছ, সেটাই বড় কথা। 'এণ্ড' ও 'মিন্স'—এর পার্থক্য মনে রাখতে হবে।'

প্রশ্ন: 'মহাভারত'—এর কথা আজকের যুগে আপনার কতটা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হচ্ছে?

ডঃ রাহী মাসুমরেজা বললেন, 'সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক। সেই পারিবারিক কলহ, সত্য ও অসত্যের সংঘাত, ধর্ম ও অধর্মের বিরোধ, ঈর্ষা, লোভ, উচ্চাশা, ন্যায় অন্যায় নিয়ে যুদ্ধ—এসবই তো এখনও আছে। আগেই তো বললাম: সমকালের কথা বলেও এই মহাকাব্য চিরকালের কথা বলেছে বলেই এখনও এর সমাদর। 'মহাভারত' আমার কখনই শুধু এক হিন্দু এপিক বলে মনে হয়নি, এই মহাকাব্য সকলের, চিরকালের।'

দিব্যেন্দু গুহ

অন্তর্দ্বন্দ্ব

...মা–কুকুরটা তীব্র গতিতে তার ছোট্ট বাচ্চাটিকে সমস্ত শরীর দিয়ে রাস্তার একপাশে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারল না। এই ঘটনাই এক ধনী ব্যবসায়ী হৃদয়হীন যুবকের আকস্মিক রূপান্তর ঘটাল।

কাদেরের চোখমুখ দেখেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে সে সলমাকে আর সহ্য করতে পারছে না। চারবছর হল ওদের বিয়ে হয়েছে, এখনো কোনো বাচ্চাকাচ্চা হয়নি। হয়তো এজন্যই এত অশান্তি–কিন্তু তাতে বেচারা সলমার কী দোষ। এই সলমাকে বিয়ে করার জন্য কাদের একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছিল একসময়। অথচ, আজ...? পারলে এই মুহূর্তে তালাক দেয়। কিন্তু সলমাকে তালাক দেওয়া কাদেরের কাছে খুব কঠিন ব্যাপার।

আসলে, কাদেরের বাবার বিজনেস পার্টনার হচ্ছেন সলমার বাবা। আর, ব্যবসাটা ফুলেফেঁপে ওঠার পেছনেও রয়েছেন সলমারই বাবা। অতএব, কাদের চাইলেও ওর বাবা ওদের তালাক হতে দেবে না, এটা ধরে নেওয়া যায়। লুকিয়ে চুরিয়ে আরেকটা বিয়ে অবশ্য করা যায়, তাতে আইনের ঝামেলা আছে প্রচুর। ফলে, কাদেরকে মুখ বুজেই থাকতে হয়। আর মনে মনে ভাবে, এবার হয়তো সলমার বাচ্চা আসবে পেটে। কিন্তু না, সেরকম কোনো ঘটনাই ঘটল না।

বিয়ের পরপর গদি থেকে ফিরে সন্ধেবেলা কাদের তার বৌকে নিয়ে বেশকিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াত এদিকওদিক। হাসি গল্প গান, এসবের ভেতরে কেটে যেত অনেক সময়। আজ, কাদের কাজ থেকে ফিরে আসে, চুপচাপ হাতমুখ ধুয়ে অল্প কিছু পেটে পুরে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়, এলোমেলো উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায় বহুক্ষণ। তারপর রাত্রে বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়া, ব্যস।

এ ভাবেই উদ্দেশ্যহীনভাবে এক সন্ধেবেলা কাদের ঘুরছিল আনমনে পার্কের ভেতর। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, একটা ফুটফুটে ছেলে কাঁদতে কাঁদতে তার 'আন্টি'কে খুঁজে বেড়াচ্ছে, ছেলেটির বয়স সাত কি আট। কাদের ছেলেটির হাত ধরে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে দিতে তার নামধাম জিগ্যেস করতে লাগল। এবং, ঠিক তখনই হাঁপাতে হাঁপাতে দুই ভদ্রমহিলার প্রবেশ। একজন অল্পবয়সী, সুন্দর দেখতে। অপরজন মাঝবয়সী। অল্পবয়সী মেয়েটি দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে ছেলেটাকে। ছেলেটাও জড়িয়ে ধরে তাকে। মেয়েটি বলল কাদেরকে, ধন্যবাদ আপনাকে। একে সারাটা পার্ক খুঁজে বেড়াচ্ছি কখন থেকে। বড্ড দুষ্টু, বেড়াতে এলেই একা একা এদিক ওদিক চলে যায়।

কাদের উঠে দাঁড়িয়ে হাসে। ছেলেটিকে জিগ্যেস করে, কি নাম তোমার? মেয়েটি জবাব দেয়, কিটু, আমার দিদির ছেলে। মাঝবয়সী মহিলাটি আলাপ করতে চান, জিগ্যেস করেন-তোমার নাম কী বাবা? কোথায় থাক? কাদের জবাব দেয় হাসিমুখে। মহিলা জিগ্যেস করলেন, বিয়ে থা করনি? কাদের অম্লানবদনে মিথ্যে বলে দিল, না। মহিলার মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অল্পবয়সী মেয়েটি বলল কাদেরকে, একদিন চলে আসুন সন্ধেয় চা খেতে আমাদের বাড়ি।

কাদের হেসে বলল, যাব। আপনাদের ঠিকানা? ভদ্রমহিলা হাতব্যাগ থেকে একটা ছাপানো কার্ড কাদেরের হাতে দিলেন। তাতে নাম লেখা মিসেস ফিরদৌসিয়া বেগম। যে অঞ্চলের ঠিকানা দেওয়া আছে, সে জায়গাটা শহরের প্রত্যন্ত সীমায়, কাদেরদের মডেল টাউন থেকে অনেক দূরে। ঐ সব অঞ্চলে সবে লোকবসতি শুরু হয়েছে। কাদের বিদায় নিয়ে নিজের গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি থেকেই হাত নাড়ল ওদের দিকে।

কাদের এখন আলাদা ঘরে একা শোয়। শুয়ে শুয়ে আজ তার চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছিল মেয়েটির সুন্দর মুখখানা। সে মনে মনে

ঠিক করল, যা হয় হবে, কাল যাবোই ওদের বাড়ি। চেহারায় ব্যবহারে যা মনে হয়, খুব ভদ্র পরিবার। –কাদের ভাবে।

পরের দিন সন্ধেয় অফিস থেকে ফিরে কাদের ভিজিটিং কার্ডটা সঙ্গে নিয়ে চলল নির্দিষ্ট ঠিকানায়। অনেক দূরের রাস্তা। কিছুটা রাস্তা কাঁচা এখনও। বেশ কিছুটা দূরে গাড়িটা রাখতে হল। বাড়িটা সুন্দর, ছিমছাম, ছোট। রুচির ছাপ আছে। কড়া নাড়তেই দরজা খুলল–কে আবার? সেই লাবণ্যময়ী সুন্দরীটি। সাজানো গোছানো ড্রইংরুম। মাঝবয়সী ভদ্রমহিলাটিই হচ্ছেন ফিরদৌসিয়া বেগম। কাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তাঁরা। মেয়েটি চা করে নিয়ে এল। কাদের কথা খুঁজে না পেয়ে জিগ্যেস করল, সেই কিটু কোথায়?

মেয়েটি গভীর চোখে তাকাল কাদেরের দিকে। বলল, আছে আশেপাশে কোথাও। এক্ষুণি এসে পড়বে। দিদির বাড়িও কাছাকাছি তো, হয়তো বাড়ি চলে গেছে। মেয়েটির নাম জানা গেল, সিতারা। চমৎকার নাম, কাদের ভাবল। কাদের নিজের সম্পর্কে বলল নানা কথা, নিজের ব্যবসার কথা, বাড়ির কথা। কিন্তু ভুলেও বলল না যে সে বিবাহিত। বেগম সাহেবাও নিজেদের গল্প বললেন। সিতারার বাবা তার ছোটবেলাতেই মারা যান। তিনিই এই বাড়িটা করে গেছেন। দেশে কিছু জমিজমা আছে, তার থেকে যে আয় হয়, দুই মা মেয়ের স্বচ্ছন্দে চলে যায়। সিতারার বড় বোনও বেশি দূরে থাকে না। তার বর নিয়মিত খোঁজখবর রাখে সিতারাদের। সিতারা বি.এ. পাশ করে বসে আছে, এবার একটা বিয়ে দিতে পারলেই তার মার চিন্তা দূর হয়। কাদেরদের স্ট্যাটাস এদের তুলনায় অনেক উঁচু। তবু কাদের মেয়েটির প্রেমে পড়ে গেল।

সলমার প্রতি কাদেরের শেষ যেটুকু টান ছিল, এবার তাও মুছে গেল। কাদের প্রতিদিন গাড়ি করে চলে আসে, শহরতলীর এই বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে। অনেকরাত অবধি সেখানে কাটায়, গল্পগুজব করে। ব্যবসার দিকেও কাদের আর তেমন মন দিতে পারে না।

একদিন কাদের সিতারার মাকে সত্যি কথাটা বলল। তার বিয়ে হয়ে গেছে এবং প্রথম বৌ–এর বাচ্চা হবে না বলে সে আরেকটা বিয়ে করতে ইচ্ছুক। কাদের জানত, সিতারা এখন তার হাতের মুঠোয়। হলও তাই। সিতারার মা একটু থমকে গেলেন ঠিকই, কিন্তু সামলে নিলেন তৎক্ষণাৎ। বললেন, তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই বাবা। কিন্তু তোমার ধনী বাবা–মা আমাদের গরিব ঘরের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে বোধ হয় কিছুতেই রাজী হবেন না। কাদের অভয় দেয়, বলে, আন্টি, আপনি ওসব নিয়ে একদম ভাববেন না। যদি কিছুতেই কিছু না হয়, আমরা কোর্টে গিয়ে বিয়ে করবো।

কিন্তু ...এক সন্ধেয় কাদের সিতারাদের বাড়ি থেকে ফিরে দেখে সলমা আর মা ওরই অপেক্ষায় বসে আছে। কী ব্যাপার? মা উঠে এসে কাদেরকে জড়িয়ে ধরলেন। সলমারও মুখচোখ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। মা জানালেন, আজই ডাক্তার জানিয়েছে সলমা মা হতে চলেছে এতদিন পর। কাদের খুশিতে হৈ চৈ শুরু করে দেবে, সবাই ভেবেছিল। কিন্তু কাদের গম্ভীর হয়ে গেল খবরটা শুনে। সে চুপচাপ চলে গেল নিজের ঘরে। সলমা এবং শাশুড়ি, দুজনেই চুপসে গেল একটু।

কাদের ভেবেছিল, দু'একদিনের মধ্যে সিতারাকে সে বিয়ে করবে এ কথাটা বাড়িতে জানিয়ে দেবে। সেটা এই নতুন পরিস্থিতিতে আর হয়ে উঠল না আপাতত। সারারাত কাদেরের চোখে ঘুম এল না। সে কেবলই ভাবে, ভাবতে থাকে। এবং নিশ্চিত হয় যে, সিতারাকে তার চাই–ই। বাচ্চাই কি সব? ভালোবাসা বলে একটা ব্যাপার আছে না?

পরের দিন বিকেলে কাদের সিতারাদের বাড়ি গেছে। ওর মুখচোখে একটা উদ্বেগের চিহ্ন দেখে ফিরদৌসিয়া বেগম জিগ্যেস করলেন, তোমার কি কিছু হয়েছে বাবা? খুব চিন্তায় পড়েছ মনে হচ্ছে। কাদের সবকিছু খুলে বলল। বেগম ও তার মেয়ে সিতারা সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেল। ওদের মুখচোখে অসন্তোষের ছাপ দেখে কাদের বলল, আন্টি আপনারা রাগ করবেন না। আমি কথা দিচ্ছি, সলমাকে ছাড়তে হয় তাও ভালো, সিতারাকে আমি বিয়ে করবোই।

বেগম রাগতস্বরে বললেন, না কাদের। শুধু সলমাকে নিয়ে আমার চিন্তা নয়। আমার চিন্তা হচ্ছে, ওর পেটের বাচ্চাটিকে নিয়ে। ব্যাপারটা অনেক ঘোরালো হয়ে উঠবে এবার। আমি জেনে–শুনে আমার আদরের মেয়েকে জলে ফেলে দিতে পারি না। নিরুপায় হয়ে কাদের জিগ্যেস করল, তাহলে কী করতে পারি বলুন। বেগম বললেন, সলমাকে মা হতে দেওয়া চলবে না।

কাদের স্তম্ভিত হয়ে গেল। বলল, কেন? তার সঙ্গে আমার ও সিতারার বিয়ের কী সম্পর্ক?

বেগম বুঝিয়ে বললেন, দেখ কাদের, বিয়েটাও একটা ব্যবসা ছাড়া কিছু নয়। তুমি এত বড় ব্যবসায়ী তোমার সেটা বোঝা উচিত। সলমার বাচ্চা তোমার সম্পত্তির আইনত উত্তরাধিকারী হবে, তাহলে আমার সিতারার ছেলেমেয়েদের কী হবে পরে? না, না, সলমাকে মা হতে দিলে তুমি সিতারাকে পাবে না।

কাদের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে। কিন্তু তখন সে সিতারার প্রেমে উন্মাদ। বুদ্ধি, বিচারশক্তি সব গুলিয়ে গেছে তার। চাপা গলায় সে বলল, বেশ, তাই হবে। আমি সলমাকে মা হতে দেব না।

বেগম কাদেরকে এক লেডি ডাক্তারের ঠিকানা দিলেন। সব শুনে সিতারার মুখেও ফুটে উঠল হাসি।

বাড়ি ফিরে কাদের দেখল সলমা উদগ্রীব হয়ে তার ফেরার অপেক্ষায় বসে আছে। সলমা কাছে এসে বলল, কী ব্যাপার? এতদিন বাচ্চা বাচ্চা করে আমার জীবন অতিষ্ঠ করে দিয়েছিলে আর এখন খবরটা শুনেও তোমার যে কোনো ভাবান্তর দেখছি না। কী চাও তুমি খুলে বল তো?

কাদেরের মনের মধ্যে তখন শয়তানী চিন্তা সে অভিনয় শুরু করে। সলমাকে কাছে টেনে নিয়ে চুমু খায়। ব্যস্, সলমা আবেগে ভেঙে পড়ে সলমার জীবন যেন শুরু হল নতুন ভাবে। সে স্বামীকে কিভাবে তোয়াজ করবে ভেবেই পায় না কাদের সলমাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, চল একবার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। চেক্–আপ করানো খুবই দরকার।

কাদেরের মিষ্টি মিষ্টি ভালোবাসার বুলিতে সলমার তখন ঘোর–লাগা অবস্থা। সে বরের সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যাবে বলে পোশাক বদলাতে শুরু করল। সলমার সুন্দর এবং উজ্জ্বল চেহারার দিকে তাকিয়ে কাদের কি একটুও থমকে গেল না? তার কি একবারও উদ্বেলিত হয়ে উঠল না হৃদয়? হয়তো হয়েছিল। কিন্তু কাদের তখন আর নিজের মধ্যে নেই। সে পুনরায় দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়। সিতারাকে পেতেই হবে।

নিজেকে সে সামলে নেয়। সলমার হাত ধরে ধরে গাড়িতে ওঠে। নিজে বসে ড্রাইভারের সিটে সলমাকে বসাল পাশে। পকেট থেকে বেগমের দেওয়া ডাক্তারের ঠিকানাটায় একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। সে কি খুনী? না, কাদের আবার মনে মনে বলে, ভালোবাসার জন্য সবকিছুই ত্যাগ করা যেতে পারে। সিতারাকে সে ভালোবাসে।

কাদেরের ভেতর অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমশ প্রখর হতে থাকে। বাবা হয়ে সে হত্যা করতে চলেছে নিজের সন্তানকে। গাড়ির স্পীড নিজের অজ্ঞাতেই বাড়াতে থাকে সে। সলমা ভয় পায়। স্বামীকে চেপে ধরে ফাঁকা রাজপথে কাদেরের গাড়ি ছুটতে থাকে তীব্র গতিতে।

হঠাৎ..., একটা ছোট্ট কুকুরের বাচ্চা রাস্তার মাঝখানে। কাদের দূর থেকেই গাড়ির স্পীড কমাতে চেষ্টা করে, কিন্তু বোধহয় বাঁচানো গেল না। রাস্তার মাঝখানে বাচ্চাটার কাছেই ওর মা–কুকুরটা কিছু চেটে চেটে খাচ্ছে। এক মুহূর্ত! মা–কুকুরটা তীব্র গতিতে তার ছোট্ট বাচ্চাটাকে সমস্ত শরীর দিয়ে রাস্তার একপাশে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারল না। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষেও কাদের এড়াতে পারল না দুর্ঘটনাটা। ওর গাড়ি পিছলে বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে একপেশে হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ি থেকে নেমে কাদের দৃশ্যটার দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকে। মা তার বাচ্চাটাকে বাঁচানোর জন্য কিভাবে প্রাণ দিল। কাদেরের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। গাড়ির ভেতর সলমা ভয়ে কাঁপছে।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে বাড়ির দিকে যেতে যেতে কাদের সলমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে–চলো, আজ আর ডাক্তারের কাছে গিয়ে কাজ নেই।

সুরজিৎ

আরামবাগের গান্ধী থেকে বাংলার গান্ধী

প্রফুল্ল সেন চলে গেলেন ; রেখে গেলেন এক অমলিন আদর্শ তাঁরই স্বরচিত জীবনকাহিনীর মধ্যে। এই প্রতিবেদন সেই কাহিনীরই পবিত্র নির্যাস।

তিনি যখন রাজ্যের মন্ত্রী এবং মুখ্য-মন্ত্রী, রাজনীতির বিচারে আমাদের মধ্যে শত্রুর সম্পর্ক। আমরা তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনেছি, এমন কি চরিত্র সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলেছি। আজ স্বীকার করছি আমরা তাঁর সম্পর্কে যে সব কথা বলেছিলাম তা ঠিক নয়। উপলব্ধিতে পরে এটা বুঝেছি, এই যে সে সময় স্টিফেন হাউস নিয়ে কি হৈ চৈ না হয়েছিল! আমরা বলেছিলাম, তিনিই স্টিফেন হাউসের মালিক। কিন্তু এসব কথা সত্যি নয়। চরিত্রের দিক থেকেও তিনি ছিলেন নিষ্কলঙ্ক। যদিও আমরা তাঁর সম্পর্কে অনেক কথাই সে সময় বলেছিলাম।

আজ রাজনীতিতে 'মূল্যবোধের' যে অভাব দেখা দিয়েছে সেখানে তিনি হতে পারেন একমাত্র আদর্শ। নিজে কানাকড়িও ব্যাংকে রাখেন নি। কলকাতায় কোন ফ্ল্যাট কেনেন নি। স্টিফেন হাউস কেনা এবং তাঁর সম্পর্কে অন্যান্য অভিযোগ-গুলো শুনে বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু তিনি জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন, তাঁর মত সৎ, আদর্শ, দেশপ্রেমিকের সংখ্যা অনেক কম। দীর্ঘদিন ক্ষমতার চূড়ায় ছিলেন। অঢেল সম্পত্তির মালিক হতে পারতেন। কিছুই করতে পারেন নি; আসলে কিছু করতে চান নি।

তাঁর সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আমাদের সহমত হয় দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর। দীর্ঘদিন পরে তাঁর কাছে যাই। সেটা ছিল বামপন্থী নেতাদের সঙ্গে তাঁর প্রথম বৈঠক। সেই বৈঠকে জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত, মাখন পালও গিয়েছিলেন। আমি পৌঁছাই সবার আগে। তিনি আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?' আমি বললাম, 'আপনি সবই জানেন'। এই শুনে তিনি মন্তব্য করলেন—রাজনীতির পথ ভিন্ন বলে কি ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখতে নেই? এই হলেন প্রফুল্লদা। সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রফুল্লচন্দ্র সেন।" —কথাগুলি বল-ছিলেন প্রবীণ বামপন্থী নেতা ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক অশোক ঘোষ।

১৯২০ সাল। পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে সবে এম এস সি ক্লাসে ভর্তি হয়েছেন প্রফুল্লচন্দ্র। কৃতী ছাত্র। চোখে অনেক স্বপ্ন। কিন্তু মন এগুলো না। ছাড়লেন বিজ্ঞান কলেজের পাঠ। অ্যাকাউন্ট্যান্সি পড়তে গেলেন একটি প্রতিষ্ঠিত অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্মে। ঠিক হলো ডিগ্রিটা তিনি বিদেশ থেকে আনবেন। লণ্ডন যাওয়ার পাসপোর্ট তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু বিলেতে তাঁর আর যাওয়া হলো না।

সারা দেশে তখন নেমেছে অসহযোগ আন্দো-লনের প্লাবন। স্কুল কলেজ থেকে দলে দলে ছাত্ররা বেরিয়ে আসছেন। কানে তাঁদের গান্ধীজীর ডাক-এডুকেশন ক্যান ওয়েট বাট স্বরাজ কান্ট। সে ডাক প্রফুল্লচন্দ্রেরও কাছে গেল। ছিঁড়ে ফেললেন বিলেত যাওয়ার পাসপোর্ট। লেখাপড়া অপেক্ষা করতে পারে, স্বরাজের পক্ষে তা সম্ভব নয়। সুতরাং সর্বাগ্রে স্বরাজ চাই। তারপর অন্য কিছু। গান্ধীজীর ডাকে সেই যে ঘর ছাড়লেন প্রফুল্লচন্দ্র, আর তিনি ঘরে ফেরেন নি।

১৯২১ সালের মার্চ মাস। হুগলিতে অসহযোগী ছাত্রদের নিয়ে বিদ্যামন্দিরে শিক্ষাকতা আরম্ভ কর-লেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। সঙ্গে সঙ্গে চলে কংগ্রেসের জন্যে প্রচার। হুগলির ব্রাঞ্চ স্কুল থেকে বহু ছাত্র অসহযোগ করে বেরিয়ে এলো। তাদের নিয়ে হুগলি বিদ্যামন্দির আরম্ভ হল। বিদ্যামন্দিরে দুতিন ঘন্টা পড়াতেন এবং বাকি সময় কংগ্রেসের কাজ করতেন। তখন হুগলি জেলায় তিনটি মহকুমা—সদর, শ্রীরামপুর ও আরামবাগ। সদর ও শ্রীরামপুর মহকুমায় অনেক কংগ্রেস কমিটি গঠিত হল। বহুকর্মীও যোগ দিলেন। কিন্তু আরাম-বাগ মহকুমায় কোন সাড়া নেই। গোটা আরামবাগ ম্যালেরিয়ায় জর্জরিত। পথঘাট বর্জিত। এক মাইলও পাকা রাস্তা নেই। বিদ্যামন্দিরের এক সভায় আরামবাগ নিয়ে আলোচনা হল—কে যাবেন আরামবাগ? কেউ রাজি হলেন না। অবশেষে প্রফুল্লচন্দ্র রাজি হয়ে গেলেন। ওই বছরই মে মাসে ট্রেনে করে তারকেশ্বর গেলেন। আরামবাগ শহরে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থার জন্যে হুগলির গভর্নমেন্ট প্লিডার রায় বাহাদুর সতীশ মুখোপাধ্যায় আরাম-বাগের তিনজন বিশিষ্ট উকিলকে চিঠি দিয়ে-ছিলেন গোপনে। সেই তিনজন বিশিষ্ট উকিলের কাছে গেলেন তিনি। তিনজনই ভদ্রভাবে খেতে বললেন কিন্তু থাকার ব্যাপারে রাজি হলেন না। পরে অতি কষ্টে একজনের মাটির বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। সেই দিন থেকেই আরামবাগের জনগণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তৈরি হল। এরপর আরামবাগের মাটিতে এক একটা আন্দোলনের জোয়ার এসেছে। তার পুরোধায় ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। ডিসেম্বর মাসে আমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনে গেলেন তিনি। গঠনমূলক কাজ ও আন্দোলন নিয়ে আলো-চনা হল। ফিরে এসে আবার আরামবাগ গেলেন। এরপর ১৯২২ সালে আরামবাগে প্রবল বন্যা। তিনি কর্মীদের নিয়ে এগিয়ে গেলেন বন্যা পীড়িত মানুষদের কাছে। এইভাবে আরামবাগই সেদিন হয়ে উঠেছিল প্রফুল্লচন্দ্রের সাধনক্ষেত্র। তাই আরামবাগের মানুষ তাঁকে আখ্যা দিলেন আরাম-বাগের গান্ধী।

পরাধীন ভারতে তিনি গান্ধীজীর আদর্শকে

অনুসরণ করেই ঝাঁপ দিয়েছিলেন মুক্তিসংগ্রামে। মাতৃভূমির স্বাধীনতা ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। ১৯২১ সালে প্রফুল্লচন্দ্রের প্রথম কারাবরণ শুরু, তারপর বারবার তিনি বৃটিশ কারাগারে বন্দী হয়েছেন। প্রায় বারো বছর তিনি কারাগারে ছিলেন। এর মধ্যে চার বছর ছিলেন থার্ড ক্লাস বন্দী। কারাগারের ডাণ্ডাবেড়ির সাজাও মাথা পেতে নিয়েছিলেন তিনি। আরামবাগ, হুগলি, হিজলি, দমদম, প্রেসিডেন্সি, আলিপুর জেলের পুরনো দলিলপত্রে বন্দিদের তালিকায় প্রফুল্লবাবুর নাম পাওয়া যায়। ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর ডাকে লবন আইন ভঙ্গ করে কারাবাস করেন কাঁথিতে। ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে খাজনা বন্ধ সংগঠিত করার অপরাধে আবার বন্দী হন। এবার দমদম স্পেশাল সেলে। হরিপদ চ্যাটার্জি এবং তিনি জেল কমিটির সম্পাদক ও সভাপতি। নানা কারণে খিটিমিটি চলছিলই। তা থেকে জেলারের সঙ্গে পুরোদস্তুর ঝগড়া বেধে গেল বন্দীদের। জেল কমিটি সমর্থন করল সহবন্দিদের। সাজা মিলে গেল হাতে হাতে। প্রেসিডেন্সি জেলে বদলি করে নিঃসঙ্গ বন্দীত্বের ব্যবস্থা হল তাঁদের দুজনের, সঙ্গে বর্ধমানের বিপ্লবী কালিকেশব ঘোষ।

৪৪ নং সেলের দু নম্বরের বন্দী প্রফুল্লচন্দ্র সেন। জুনের প্রচণ্ড গরম। তার ওপর, উত্তরমুখী ঘর। একখানি কম্বলের বিছানা, সকালে লপসি, দুপুরে মোটা চালের ভাতের সঙ্গে ঘ্যাঁট, সন্ধ্যায় দুটো রুটি। এই অবস্থায় প্রথম পনের দিন কাটল হাতে-পায়ে শিকলের ডাণ্ডাবেড়ি অবস্থায়। তারপর রোজ ৬০ গজ নারকেল ছোবড়ার তেপায়া দড়ি তৈরি। চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হতে যিনি বিলাত যাচ্ছিলেন সেই প্রফুল্লচন্দ্র এই করেই ক্ষান্ত হলেন না। খবর পেলেন, কালিকেশব দড়ি পাকাতে পারছেন না বলে তাঁর মাড়-ভাতের সাজা হয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্র স্বেচ্ছায় কালিকেশবের ভাগের ছোবড়ায় দাড়ি পাকিয়ে তাঁর সাজা রদের আয়োজন করলেন।

১৯৩৯-৪০ সালে আবার জেল। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে বম্বে গেলেন এ আই সি সি-র অধিবেশনে যোগ দিতে। 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবে সায় দিয়ে যখন ফেরার ট্রেনে চাপলেন তখন তাঁর মাথার ওপর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। সেটা বুঝতে পেরে ঘাটশিলা স্টেশনে নেমে আত্মগোপন করলেন তিনি। কয়েক মাস পরে ধরা পড়লেন কাশীতে। সেখানে গিয়েছিলেন বাবার বাৎসরিক ক্রিয়া করতে। গঙ্গায় স্নান সেরে উঠে দেখলেন সামনে সাদা পোশাকের পুলিশ। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ধরিয়ে দিল তাঁর হাতে। অবশ্য শ্রাদ্ধ শেষ করার পর জেলখানায় নেওয়া হল তাঁকে। কয়েক মাস পরে তাঁকে ফেরৎ পাঠানো হল কলকাতায় প্রেসিডেন্সি জেলে। ১৯৪৫ সালের শেষ ভাগে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের মত এমন মানুষ আজকের দিনে সত্যি দুর্লভ। তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন তাঁরা তাঁর মধ্যে এক রাজনৈতিক-সন্ন্যাসীর চরিত্র লক্ষ্য করেছেন। মানুষের সেবায় উৎস্বর্গীকৃত প্রাণ এই মানুষটি মনে করতেন-'সবার উপরে মানুষ সত্য'। ১৯৪৬ সালে কন্সটিটুয়েন্সি অ্যাসেমব্লির মেম্বার হলেন তিনি। এই বছরই পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হল। প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হলেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। সেবার তাঁর মন্ত্রী সভায় প্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রথম মন্ত্রী হন। পরে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রীসভায় তিনি খাদ্যমন্ত্রী হন। খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধীরা নানারকম কথা বলত। তিনি তাতে কখনও রাগ করতেন না। যে সব কথা হত তার উত্তর তিনি যুক্তিগ্রাহ্য ভাবে এবং পরিসংখ্যান দিয়ে দিতেন। ডাঃ রায়ের মৃত্যুর পর ১৯৬২ সালে প্রফুল্লবাবু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসলেন। সেই সময় তাঁর ব্যক্তিগত সততার প্রতি সবচেয়ে মারাত্মক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসক বামপন্থীরা। বামপন্থীরা অভিযোগ এনেছিলেন-মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লবাবু ডালহৌসির স্টিফেন হাউস কিনে নিয়েছেন। সেই অভিযোগ যে কত ভিত্তিহীন ছিল, তা প্রমাণ হয়ে যেত দেরি হয় নি। তাঁর নিজস্ব সম্বল বলতে ছিল কয়েকটি খদ্দরের জামাকাপড় এবং মহাত্মা গান্ধীর লেখা কিছু বই। সৎ জীবনযাপনের এক উজ্জ্বল উদাহরণ ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। দীর্ঘ দু দশক ধরে যিনি মন্ত্রীত্ব করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, তাঁর মত একজন মানুষের জীবনধারা যে কত অনাড়ম্বর হতে পারে, তা প্রফুল্লবাবুকে না দেখলে বোঝাই যায় না। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এমন দিন গিয়েছে তাঁর যেদিন বাড়িতে দাড়ি কামানোর সাবানটুকুও থাকত না। দুধ জোটানোর সাধ্য ছিল না বলে চা খেতেন দুধ ছাড়া। পোশাক পরিচ্ছদে, খাওয়া দাওয়ায় বাহুল্য তো দূরের কথা, প্রয়োজনটুকুও নামিয়ে এনেছিলেন নূন্যতম স্তরে। দিনের পর দিন মুড়ি খেয়ে দিন কেটেছে তাঁর। অথচ মুখ্যমন্ত্রীত্ব যাবার পরেও কোনওদিন কোন পেনশন বা সরকারি অর্থসাহায্য বা দাক্ষিণ্য তিনি গ্রহণ করেন নি।

১৯৬৭ সালে বিধানসভা নির্বাচনে আরামবাগে অজয় মুখার্জির কাছে ভোট হারার পর ১৯৬৯-এর অন্তর্বর্তী নির্বাচনে আরামবাগেই অজয়বাবুকে হারিয়েছিলেন তিনি। এরপরও ১৯৭১-৭২ দুবারই অন্তর্বর্তী নির্বাচনে প্রফুল্লবাবু জেতেন। '৭২ সালে সিদ্ধার্থ রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস রাজ্যে ক্ষমতায় আসে। কিন্তু কংগ্রেস তখন ভেঙে গিয়েছে। প্রফুল্লবাবু রইলেন সংগঠন কংগ্রেসে।

প্রফুল্লবাবুর রাজনৈতিক জীবনে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের সূচনা ঘটে ১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থার সময় থেকে। জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে দুঃসাহসিক প্রতিবাদ জানিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধীর সেই সময়ের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তি এতই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে তাঁর দীর্ঘদিনের সঙ্গী অতুল্য ঘোষ সেই সময় বিধান শিশু উদ্যানে ইন্দিরা গান্ধীকে এনেছিলেন বলে তিনি অতুল্যবাবুর উপরও ক্ষুব্ধ হন। রাজনৈতিক বিশ্বাসে প্রফুল্লবাবু ঘোরতর কমিউনিস্ট বিরোধী। ১৯৭৭ সালে লোকসভা নির্বাচনে তিনি বামপন্থীদের সঙ্গে সমঝোতা করে ভোটে লড়েন। তিনি তখন রাজ্য জনতা পার্টির সভাপতি। লোকসভা নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন বামপন্থীদের সঙ্গে আসন সমঝোতা ভেঙে গেল প্রফুল্লবাবুর অনমনীয় দৃঢ় মনোভাবে। ১৯৮০ সালের লোকসভা নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর বয়সের ভারে রাজনীতিতে আর সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি।

রাজনৈতিক জীবনে তিনি বিতর্কিত ছিলেন অনেক সময়েই বিনা কারণে বা তুচ্ছ কারণে তাঁকে ঘিরে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাঁর খোলামেলা মৃদুভাষী বন্ধুবৎসল ব্যক্তিত্ব ছাপিয়ে উঠেছিল যাবতীয় বিতর্ককে। যাঁরা তাঁর ঔদার্য ও মহানুভবতার সুযোগ নিয়ে নিজের আখের গুছিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরে হয়ে উঠেছিলেন কট্টর সমালোচক। কংগ্রেসের অন্যদের অনেক দোষ ত্রুটি এবং পদস্খলনের দায়িত্ব নির্দ্বিধায় ও নীরবে নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে নীলকণ্ঠ হয়ে বসেছিলেন তিনি।

তবু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রফুল্লবাবু রাজনৈতিক, সামাজিক ও গান্ধীবাদী কাজকর্মের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। মাত্র এক সপ্তাহ আগে মহালয়ার দিন তিনি নিজের হাতে গড় প্রাণের চেয়ে প্রিয় খাদি মণ্ডলে বসে খদ্দরের কাপড় বিক্রি করেছিলেন। বামফ্রন্টের অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গত ১২ সেপ্টেম্বর হুইল চেয়ারে বসে 'মহাকরণ অভিযান'-এ যোগ দিয়েছিলেন তিনি। বানতলা, বিরাটির ঘটনার বিরুদ্ধে ৯৪ বছর বয়সে অশক্ত শরীর নিয়ে তিনি গান্ধীমূর্তির নিচে অনশনে বসেছিলেন। ১৬ আগস্ট কলকাতাবন্ধের দিন সি পি এম ক্যাডারদের লাঠির আঘাতে গুরুতর আহত মমতা ব্যানার্জিকে দেখতে গিয়েছিলেন হাসপাতালে।

অকৃতদার এই মানুষটিকে অন্যদের বদান্যতার উপরে নির্ভর করেই জীবনের শেষ ২০টি বছর কাটিয়ে যেতে হয়েছে। নিজের মাথা গোঁজার ঠাঁই পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের স্নিগ্ধতা অম্লান ছিল তখনও। ২২ সেপ্টেম্বর হঠাৎ কিডনির অসুখে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ২৫ সেপ্টেম্বর কলকাতার বেলভিউ নার্সিং হোমে ৯৪ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি----বাংলার গান্ধী প্রফুল্লচন্দ্র সেন।

আজ সব স্তব্ধ। কর্মকাণ্ড সমাপ্ত। সারা জীবন গীতার আকাঙ্খাহীন কর্মবাদকে জীবনধর্ম করে তিনি কাজ করে গেছেন। সে কাজের কোন ফসলই তিনি কুড়িয়ে নেন নি। সে ফসলের সবটুকুই দেশবাসীকে নিবেদন করে আজ অনন্তের পথে যাত্রা করলেন তিনি। **অমিতবিক্রম রাণা**

ছবি: বীজেস সাহা

কাহিনীচুরির নেপথ্যে

হিন্দি ছবির ছায়ায় বাংলা ছবি

বাংলা সিনেমায় অন্য লেখকের কাহিনী চুরি করা নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্কের অন্তরালে গত কয়েক দশক ধরে যে বিখ্যাত কাহিনীগুলি চুরি করে বাংলা চলচ্চিত্রে সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের পদচিহ্ন সৃষ্টি করা হয়েছে তারই নেপথ্য কাহিনী।

আর পাঁচটা ছবিতে যেমন হয়, এ ছবিটিতে শ্যুটিং কভার করতে এসেছিলেন কলকাতার বিভিন্ন পত্রিকার কিছু সাংবাদিক। সংখ্যায় প্রায় সাত আটজন হবেন। এ ছাড়াও ছিলেন কিছু ফটোগ্রাফার। শ্যুটিং চলাকালীন তারা তাদের ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সাংবাদিকরা মনোযোগ দিয়ে দেখলেন শ্যুটিং। একটু আধটু কথা বললেন শিল্পীদের সঙ্গে।

পরিচালক ভদ্রলোক যে পরিচালক হিসাবে খুব যোগ্য এমন সুনাম তার নিকট বন্ধুজনও করতে পারবেন না। এমনি সময়ে ছবির কাজের ব্যাপারে ভদ্রলোক তেমন ভাবনা-চিন্তা না করলেও বা সক্ষম না হলেও সাংবাদিকদের সামনে উনি ক্যামেরার লুক থ্রু করা থেকে শুরু করে শিল্পীদের নির্দেশ দেওয়া সহ আরও নানান সক্রিয়তার পরিচয় দিতে লাগলেন।

এক অতি উৎসাহী সাংবাদিক এগিয়ে এসে পরিচালককে বললেন, দাদা আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

পরিচালক বিগলিত ভাবে বললেন, হ্যাঁ, বলব দাদা। এই শটটা নিয়েই লাঞ্চ ব্রেক হবে তখন খেতে খেতে কথা বলব।

বলাই বাহুল্য, সেদিন সকলেরই মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। খাবার সময় তাই কথা বলতে কারোরই আপত্তি ছিল না।

যথাসময়ে লাঞ্চ ব্রেক হল। চীনা খাবার সামনে নিয়ে শুরু হল সাংবাদিক সম্মেলন। কথায় কথায় এসে পড়ল ছবির কাহিনীর প্রসঙ্গ। এক সাংবাদিক পরিচালককে অনুরোধ করলেন, সংক্ষেপে গল্পটা বলার জন্য।

খাওয়া বন্ধ রেখে খুব যত্ন করে পরিচালক গল্পটা বলতে লাগলেন। অর্ধেক বলা হয়েছে কি হয় নি এক সাংবাদিক মাঝখান থেকে বলে উঠলেন, দাদা একটা কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না। আপনার কাহিনীর সঙ্গে ঠাকুর সিংহের (ছদ্মনাম) একটি ছবির গল্পের দারুণ মিল রয়েছে, ব্যাপারটা কি বলুন তো?

পরিচালক জবাব দেবার আগেই এক প্রবীণ সাংবাদিক বলে উঠলেন, হ্যাঁ, আমারও কেমন যেন শোনা শোনা মনে হচ্ছে। এ গল্প নিয়ে একটা হিন্দি ছবিও কিছু দিন আগেই আমি দেখেছি। দাঁড়ান নামটা বলছি। একটু সময় দিন ঠিক নামটা মনে পড়ে যাবে।

পরিচালক এক চামচ খাবার মুখে পুরে জড়ানো গলায় অবলীলায় বললেন, আপনারা যা বলতে চান আমি তা বুঝতে পারছি। আপনাদের নাম মনে করার কষ্ট করতে হবে না। আমিই হিন্দি ছবির নামটা বলে দিচ্ছি 'এ ওয়াদা রাহা'। ঋষি কাপুর, টিনা মুনিম ছিলেন মেন রোলে।

সেই প্রবীণ সাংবাদিক সহ সবার মুখই হাসিতে ভরে উঠল। এই ছবিটার গল্পের সঙ্গে নির্মীয়মান বাংলা ছবিটির অনেক মিলই সবার মনে পড়ে গেল।

নিজেকে ধরা দিয়ে কিন্তু পরিচালক ভদ্রলোক একটুও ঘাবড়ালেন না। খুবই সাধারণ ভঙ্গিতে খেতে খেতে বললেন, আপনারা সবাই নিশ্চয়ই ভাবছেন আমার এ কাহিনীটা বোধহয় 'এ ওয়াদা রাহা' থেকে নেওয়া। মোটেই তা নয়। আপনারা হয়ত জানেন না 'এ ওয়াদা রাহা'র গল্পটাও চুরি করা। আসলে আমাদের সবার কাহিনীর মূল উৎস কিন্তু বিখ্যাত ইংরাজি ছবি 'প্রমিস'।

কোন একটি ছবির প্রথম প্রদর্শনী শুরু হয়েছে দক্ষিণ কলকাতার উজ্জ্বলা প্রেক্ষাগৃহে। প্রচারের গুণে ছবিটার চাহিদা হয়েছিল খুব। বুধবার অগ্রিম টিকিট দেওয়ার আগে থেকেই হাউসের সামনে পড়েছিল লম্বা লাইন। বেলা হওয়ার আগেই প্রথম দু'দিনের সব টিকিট গিয়েছিল বিক্রি হয়ে। প্রথম দিন টিকিটের চোরাকারবারীরা বেশ চড়া দামেই বিক্রি করেছিল টিকিট। সব মিলিয়ে বাজার ছিল বেশ জমজমাট। যথাসময়ে ছবি শুরু হল। হলের মধ্যে এবং বাইরে ছবির সঙ্গে যুক্ত অনেকেই দুরু দুরু বক্ষে দর্শকদের রিপোর্টের প্রতীক্ষা করছিলেন। মিনিট কুড়ি ছবি দেখানো হয়েছে কি হয় নি, হলের মধ্যে শুরু হয়ে গেল গুঞ্জন। সামনের সারি থেকে এক দর্শক চিৎকার করে বলে উঠলেন, দূর এত একেবারে হিন্দি ছবি ঝাড়া গল্প রে!

অতঃপর কোন দৃশ্যের পর কি হবে, দর্শকরাই চিৎকার করে বলে দিতে লাগলেন। প্রমাদ গুনলেন প্রযোজক। বুঝলেন, এমন রিপোর্ট বাজারে বেরিয়ে গেলে এ ছবি দেখিয়ে ব্যবসা করা মুশকিল হয়ে পড়বে।

তাই পরের বিজ্ঞাপনেই উনি লিখলেন, প্রেমের কি কোন বয়স আছে? নেই। প্রেমের ছবিরও কোন বয়স নেই—সব প্রেমের ছবিই একরকম।

এক প্রযোজক এসেছিলেন ছবি করতে। শুরুতেই উনি সবাইকে বলে নিয়েছিলেন, আর পাঁচটা প্রযোজকের মত উনি আট মাসে ছবি শেষ করতে পারবেন না। টাকা পয়সার কিছু খামতি আছে, তাই বছর খানেক সময় লেগে যাবে ছবি শেষ

করতে। তাই প্রয়োজন সবার সাহায্য। ইউনিটের সবাই তাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

যথাসময়ে ছবির কাজ আরম্ভ হল। মাস তিনেক বাদে এক বিকালে ছবির মেকআপ ম্যান একরকম ছুটতে ছুটতে এলেন প্রযোজকের কাছে, অসময়ে মেকআপ ম্যানটিকে দেখে প্রযোজক অবাক। জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার আপনি এ সময়ে?

—আপনার কাছে আসব বলেই তো ছুটে ছুটে আসছি।

—কেন কি হয়েছে?

—আগে বলুন তো আপনার এ ছবির স্টোরি স্ক্রিপ্ট কার লেখা?

—কেন আমার পরিচালকের। এর জন্য পরিচালককে আমি প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছি। কেন কি হয়েছে?
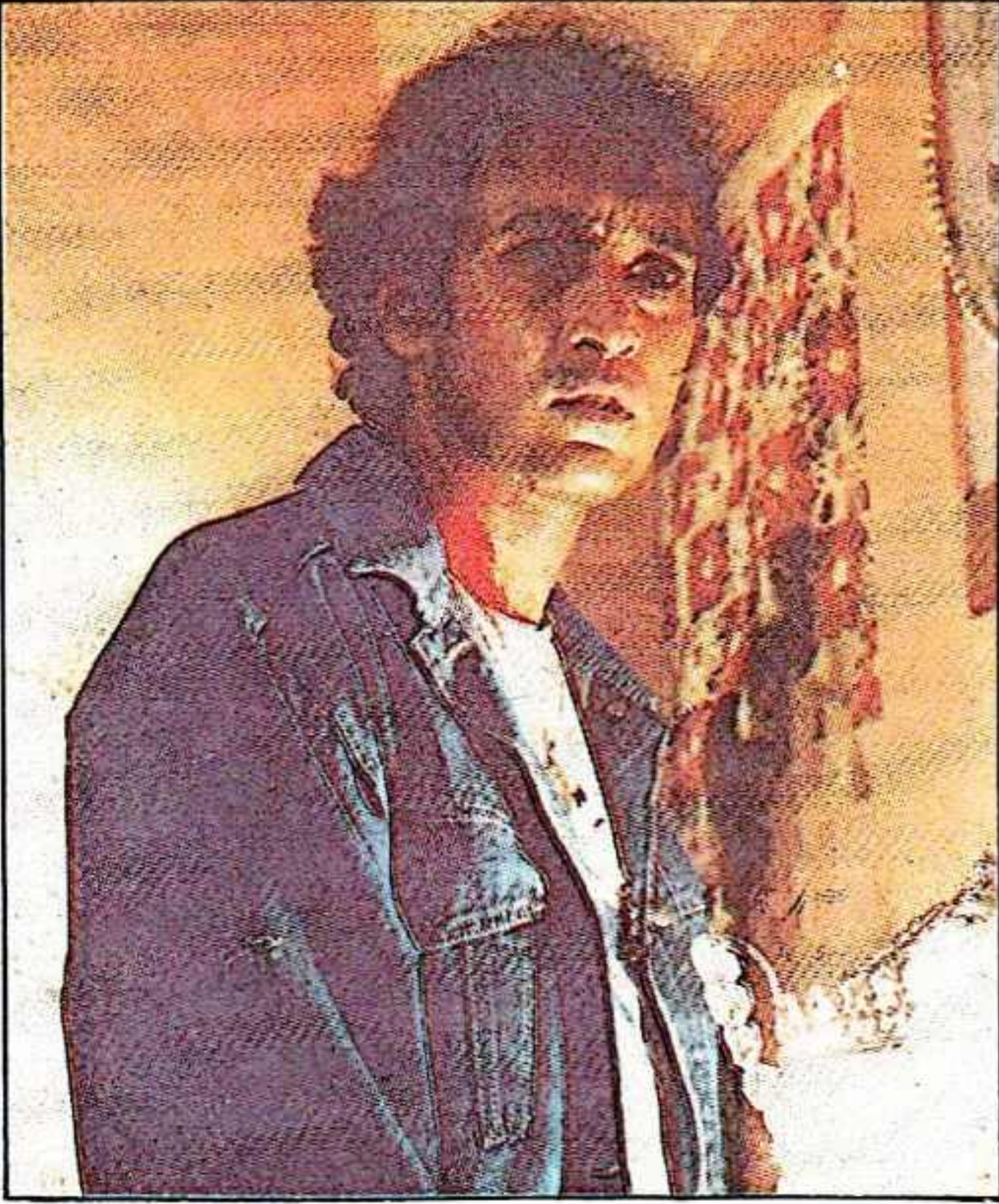
বম্বের আদলে 'আগুন'

—হয়েছে অনেক কিছু। আপনার ছবির গল্পের মত আর একটা ছবি এখন টালিগঞ্জে হচ্ছে। ও ছবির টাকার জোর আছে। আপনার অনেক আগেই ছবির কাজ শেষ হয়ে যাবে। আর ওই ছবির রিলিজ যদি আগে হয়ে যায় আপনার ছবি আর কেউ দেখবে না। এখন ভেবে দেখুন কি করবেন?

প্রযোজক ভদ্রলোকের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। উনি যাচ্ছিলেন এক ধরনের অংক কষে, এখন গেল সব পাল্টে। ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলোচনা সেরে ভদ্রলোক ছুটলেন টাকার ব্যবস্থা করতে। যে ভাবে হোক অপর ছবিটার আগে তার ছবিটাকে মুক্তি দিতে হবে। বেশ মোটা টাকা দিয়ে উনি ছবির রাইট কিনেছিলেন। গল্প শুনেই উনি বুঝেছিলেন এমন ছবি ব্যবসায় সফল হবেই। কিন্তু কাহিনীকার ভদ্রলোক যে অমন পুকুর চুরি করেছেন তা কে জানত? আগে জানলে নিশ্চয়ই এ কাহিনী নিয়ে উনি ছবি করতেন না। এখন তো আর পিছিয়ে আসার উপায় নেই। অনেক হিসেব করে চলেও মোটা টাকা ইতিমধ্যেই খরচ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় পিছিয়ে এলে সব যাবে। তার থেকে লড়াই করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু কি দিয়ে? যেভাবে খেপে খেপে টাকা জোগাড় করে শুটিং করার যে পরিকল্পনা উনি নিয়েছিলেন, তা করলে তো আর চলবে না।

এখন উপায়? শেষে ভদ্রলোক ঠিক করলেন, দ্রুত ছবি শেষ করার জন্য বাগুইহাটিতে ওনার যে আড়াই বিঘে জমি আছে সেটা বিক্রি করে দেবেন।

গত আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ের ঘটনা।

চিত্রজগতে অনেকদিন ধরে চালু ছিল একটি খবর তা হল অভিজিৎ সেন পরিচালিত 'দেবতা' ছবিটা নাকি বিখ্যাত হিন্দি ছবি 'দয়াবান' অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। কতটা অনুকরণ আর কতটা

এ ছবি কোথাকার!

মৌলিক তা নিয়ে পরে আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু ছবিটা রিলিজ হবার পর ওই গুজব বাজারে বেশ চাউর হয়ে গিয়েছিল।

সবে এক সপ্তাহ হয়েছে 'দেবতা' মুক্তি পেয়েছে। দর্শকেরা ছবিটাকে বেশ সহজ ভাবে গ্রহণ করেছেন। হলের সামনে দর্শকদের বেশ ভিড় হচ্ছে। এমন সময়েই শহর কলকাতার মানুষজনেরা অবাক হয়ে দেখলেন 'পাপী' ছবির পঞ্চম সপ্তাহের 'টু সিটার' পোস্টারের ক্যাপশানটি।

বেশ বড় বড় টাইপে লেখা হয়েছে: 'পাপী' দয়াবান দেবতা নয়, সে রক্ত মাংসের মানুষ। 'পাপী' এ সমাজের শিকার।

পাঠক লক্ষ্য করুন 'দয়াবান' শব্দটিকে কিরকম যত্ন করে ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়টিও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। 'দয়াবান দেবতা'র প্রয়োগ যে নিছক নয়, এর পিছনে অন্য কারণ কাজ করছে তা চিত্রজগতের সম্ভবত কাউকে বলে দিতে হয় নি। অনেকেই আশা করেছিলেন, 'দেবতা'র নির্মাতারা এ নিয়ে কি জবাব দেন তা জানার জন্য। অসুস্থ এই প্রতিযোগিতায় 'দেবতা' নাম লেখায় নি বলে অনেকেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।

বিচ্ছিন্ন ওই চারটি ঘটনা ঘটা এখন আর কারোর কাছেই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে না। কেননা গল্প চুরির ব্যাপারটা এ মুহূর্তে বাংলা ছবির অস্থিমজ্জায় মিশে আছে। কোন ছবি দেখলে বাঙালি দর্শকেরা এখন কাহিনী কি গানের সুর কোথা থেকে বিনা কৃতজ্ঞতায় আত্মসাৎ করেছে তা হিসাব করতে বসে যান।

প্রশ্ন উঠতে পারে কেন এই গল্প চুরি? কিসের লোভে?

এর সহজ সরল উত্তর হল, ব্যবসার নিশ্চয়তার জন্য। সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করবেন, যে কোন ছবি দাঁড়িয়ে থাকে ভাল কাহিনী ও চিত্রনাট্যের উপর। একটা সময়ে ভাল গান কি অভিনয়ও যে কোন ছবিকে টেনে নিয়ে যেতে পারত। একটা বাঁধা অংকের ব্যবসা সেইসব ছবিগুলো থেকে পাওয়া যেত।

আজ যখন সেই রাম নেই, রাম রাজত্বই বা থাকে কি করে? তা পেতে গেলে চাই ভাল গল্প, ভাল চিত্রনাট্য। কিন্তু তা পাওয়া যাবে কোথায়?

বাংলা সাহিত্যে রয়েছে অনেক ভাল গল্প, যার অনেকগুলি থেকেই ভাল ছবি তৈরি করা যায়। কিন্তু করবে কে? কোন ভাল কাহিনীর চিত্ররূপ দিতে গেলে তো চাই ভাল চিত্রনাট্য। আর তা করতে গেলে চাই যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যে বুদ্ধি। তা যাদের রয়েছে তারাও এ মুহূর্তে খুব অসহায়। কেননা যে হারে দর্শকরুচি নিম্নগামী হচ্ছে, তার সঙ্গে ওরা পারছেন না তাল রেখে চলতে।

আর যারা চাইছেন যেনতেন প্রকারেণ ব্যবসা

করতে তারা একটা নির্ভরতা খুঁজছেন। হিন্দি ছবিটা দর্শকেরা কয়েক বছর আগে দেখেছেন, তাদের ছবিটা ভাল লেগেছে। অতএব ওটাই মুক্তির একমাত্র উপায়। কোন রদবদল নেই, নেই এতটুকু পরিবর্তন, শুধু নাম আর স্থান বদলে দিলেই হল।

শোনা যায় এখনকার অনেক চিত্রনাট্যকারই বাড়িতে ভি সি আর চালিয়ে হিন্দি ছবির অনুবাদ কর্মের কাজ করে যান। হিন্দিতে যদি নায়ককে নায়িকা বলে, 'তুম বড়ি বুদ্ধু হো' তাহলে বাংলা ছবির নায়িকা বলে থাকেন 'তুমি খুবই বোকা'।

এ জাতীয় পুকুরচুরির খেলা এখন বাংলা ছবির সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে। যা শুধু অসুস্থই নয়, দর্শকদের রুচিবিকারও খুবই দ্রুত ঘটিয়ে চলছে। যার ফলাফল অবশ্যই সুদূরপ্রসারী। যারা এসবে মদত জুগিয়ে চলছেন তারা বুঝেও বুঝতে চাইছেন না, তারা আগামী প্রজন্মকে কতই না কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন।

অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, গল্প চুরির ব্যাপারটা কি আগে ছিল না? যখন ছিল বাংলা ছবির স্বর্ণযুগ? যখন উত্তমকুমার সুচিত্রা সেন পর্দা আলোকিত করে রাখতেন? যখন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, নিতাই ভট্টাচার্য কি বিনয় চট্টোপাধ্যায় লিখতেন বাংলা ছবির চিত্রনাট্য? যখন বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত রচনাগুলি নিয়ে পরিচালকেরা চিন্তা-ভাবনা করতেন। যখন দর্শকেরা বাংলা-ছবি দেখতে বসে এতটুকু অস্বস্তিবোধ করতেন না, বাঙালিয়ানায় ভরপুর শুদ্ধবাতাস বুক ভর্তি নিয়ে খুশি মনে বাড়ি ফিরতেন।

তখন কি হত?

তখনও গল্প চুরি হত। তবে এখনকার মত হিন্দি ছবি থেকে সরাসরি আত্মসাৎ করতেন না তারা। বরং হিন্দিওয়ালারা বাংলা ছবির সাফল্যের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতেন। কোন বাংলা ছবি হিট্ করলেই বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তার হিন্দি সংস্করণ বেরিয়ে যেত। আমাদের দুর্ভাগ্য এখন খেলাটা গেছে পাল্টে। ওরা আমাদের সুস্থ সফল ছবিগুলো নিয়ে অনেক মাল-মশলা মিশিয়ে দর্শকদের কাছে পেশ করতেন, যার মধ্যে থাকত রুচি বা সাংস্কৃতিক ছাপ। আর আমরা তৃতীয় শ্রেণীর অসফল ছবির অনুবাদ করে বাঙালিয়ানা মুছে ফেলে দর্শকদের কাছে তুলে ধরছি। যার মধ্যে বাঙালিয়ানা তো নেই, রয়েছে রুচিবিকারের চূড়ান্ত উদাহরণ।

পঞ্চাশ আর ষাট দশকে বাংলা ছবির স্বর্ণযুগের সময়ে অনেক নামী লেখক যেমন বাংলা ছবির চিত্রনাট্য লেখা কি পরিচালনার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন, তেমনি শুধু চিত্রনাট্য লেখায় দক্ষ কি নির্দেশনায় পারঙ্গম অনেক গুণী মানুষ ছিলেন চিত্রজগত আলো করে। তারা সব সময়েই চাইতেন বৈচিত্র্য, চিরাচরিত একপথে তারা হাঁটতেন না। তবে সব সময় যে তারা সফল হতেন এমন কথা বলা যায় না। তবে অসফল হলেও কেউ হাল ছেড়ে দিতেন না, সস্তায় বাজিমাৎ করার চেষ্টাও করতেন না।

প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র করেছিলেন কয়েকটি ছবি। বলাইবাহুল্য সবই ছিল স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্যে পরিচালিত ছবি। প্রথমদিককার ছবিগুলি ভাল ব্যবসা করলেও শেষ দিকের ছবিগুলি একদমই চলে নি। তাঁর শেষ ছবিটি হল 'চুপি চুপি আসে, রহস্য কাহিনী। তবে কাহিনীটি মোটেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের নিজস্ব ছিল না। ওটি আগাথা ক্রিস্টির বিখ্যাত 'মাউসট্রাপ' অবলম্বনে তৈরি হয়েছিল। ক্রিস্টির কাহিনী হলেও প্রেমেন্দ্রবাবু গোটা ছবিটাকে সাজিয়েছিলেন পুরোপুরি বাঙালি ঘরানায়। যার দরুন ছবিটা পেয়েছিল অন্য মাত্রা।

এই একই সময়ে তৈরি অজয় কর পরিচালিত 'জিঘাংসা' ছবিটা যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। স্বীকৃতি না থাকলেও ছবির কাহিনীটি ছিল স্যার আর্থার কোনান ডোয়ালের বিখ্যাত উপন্যাস 'দি হাউণ্ড অফ দি বাস্কারভিল' থেকে বেমালুম চুরি করা। তবে এক্ষেত্রেও অজয়বাবু ছবিটাকে সাজিয়েছিলেন বাঙালি ঢঙে। যার দরুন বাঙালি দর্শকেরা 'জিঘাংসা'কে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। ষাট দশকে এই একই কাহিনী নিয়ে সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তৈরি করেছিলেন বিখ্যাত 'বিশ সাল বাদ'। এ ছবিতেও মূল কাহিনীর কোন স্বীকৃতি ছিল না।
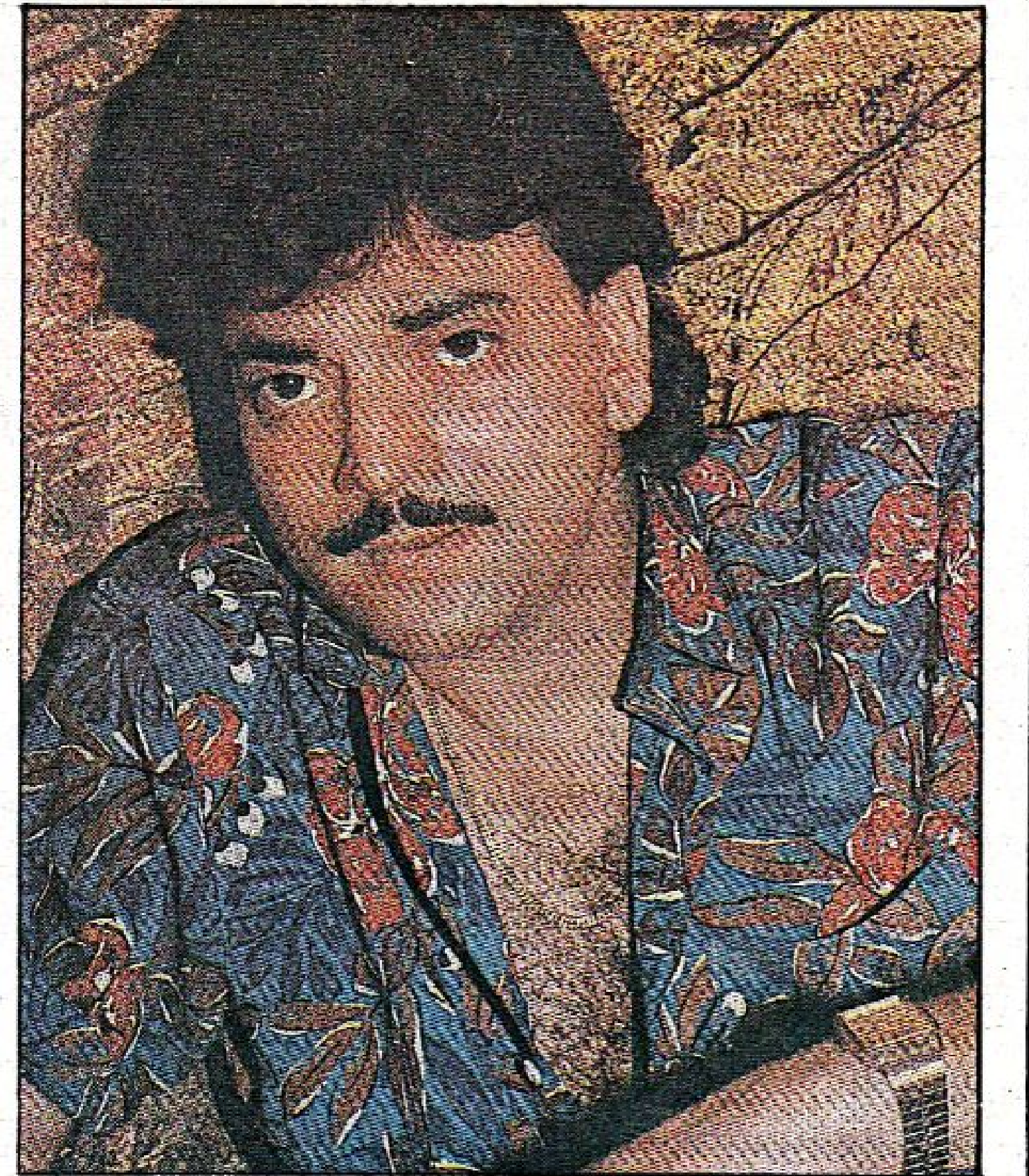
উত্তমকুমার সুচিত্রা সেন জুটির অন্যতম হিট্ ছবি হল 'হারানো সুর'। এটি বিখ্যাত ইংরাজি ছবি 'র‍্যাণ্ডাম হার্ভেস্ট' অবলম্বনে তৈরি হয়েছিল। যদিও চিত্রনাট্যকার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় নিজ গুণেই ওই প্রভাব কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়েছিলেন। যার দরুন ছবিটার ভাগ্যে জুটেছিল আশাতীত জনপ্রিয়তা।

ওই একই সময়ে পর পর কয়েকটি ছবি হয়েছিল ওই একই ভাবে। এবং উল্লেখযোগ্য হল সবগুলি ছবিই কম বেশি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

এ তালিকায় রয়েছে 'সূর্যতোরণ' (রেজ ইন হেভেন), 'ইন্দ্রধনু' (অ্যান অ্যাফেয়ার টু রিমেম্বার), 'সাগরিকা' (ম্যাগনিফিসেন্ট অবশেসন), 'সবার ওপরে' (বিয়ণ্ড দিস প্লেস) প্রভৃতি। এর মধ্যে শেষের ছবিটির সফলতায় এর একটি হিন্দি অনুকরণও তৈরি হয়েছিল। 'সবার ওপরে'র হিন্দি সংস্করণটির নাম ছিল 'কালাপানি'।

'চেজ এ ক্রুকেড শ্যাডো' নামে একটি ফরাসী ছবি ষাট দশকে এদেশে মুক্তি পেয়ে যথেষ্ট

৯১ পৃষ্ঠায় দেখুন

বাংলা ছবিতে এখন আসছেন হিন্দি ছবির নায়কনায়িকারাও

চিরঞ্জিৎ বম্বে মার্কা বাঙালি নায়ক

সেই চিঠি : জগন্ময় মিত্রের হালহকিকৎ

কাজী নজরুল, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য সঙ্গিতশিল্পী জগন্ময় মিত্র তামাম বাঙালির হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন 'চিঠি' গানের দৌলতে। বন্ধুবর হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত জগন্ময়কে জনপ্রিয়তায় ছুঁতে পারেননি। সেই মানুষটির ক্ষোভ দুঃখ অভিমানের অন্তরঙ্গ বার্তালাপ।

'কিছু ঠিক করেছিস কি গাইবি?' 'আমি দু'একটা গান লিখে সুর করেছি।' 'আচ্ছা শোনা।'

'যদি বাসনা মনে দিবে দহন জ্বালা
তবে মনের কোণে কেন বাসিলে ভাল'

এবারের শ্রোতা মানুষটি একটু সময়ের জন্য নীরবতা অবলম্বন করলেন। তারপর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমাতেই উৎসাহ দিতে দিতে গায়ককে বললেন––'দেখ্, কমার্শিয়াল লাইন তো, তাই একটু সতর্ক হয়ে গান বাছতে হবে। তোর লেখা মন্দ হয়নি––সুরটা কিন্তু অতি উত্তম। কাজে কাজেই একটা কাজ কর, আমি বরং তোর ওই সুরের ওপরই একটা গান লিখে দি।'

কাঁচুমাচু মুখে ২০ বছরের তরুণ যুবক বলে,––'কাজীদা, আমি এই গানটা লিখেছিলাম শুধু সুরটাকে ধরে রাখব বলে। সুরটা যদি পছন্দ করেন তাহলে ওই সুরের উপর আপনিই গানটা লিখে দিন।'

উপরের সংলাপগুলি থেকে কারুরই বুঝতে বাকি থাকবে না কাজীদা হলেন প্রিয় কবি কাজী নজরুল। আর এইচ·এম·ভি· রেকর্ড কোম্পানির নলিন সরকার স্ট্রিটের রেকর্ড রুমে যে যুবকটিকে তিনি সেদিন দরদভরে গান লিখে দিয়েছিলেন তিনি হলেন আজকের বাংলা গানের অগ্রগণ্য শিল্পী সুরসাগর জগন্ময় মিত্র। যুবা জগন্ময়কে নজরুল যে গানটি সেদিন কয়েক মুহূর্তে অবলীলায় লিখে দিয়েছিলেন তা'হল––

শাওন রাতে যদি
স্মরণে আসে মোরে
বাহিরে ঝড় বহে
নয়নে বারি ঝরে।

'শাওন রাতে যদি' গানটি দিয়ে যে শিল্পী তাঁর সঙ্গীত যাত্রা শুরু করেছিলেন, অসীম নিষ্ঠায় সেই গতিকে তিনি আজও আয়ত্তে রেখেছেন। জীবনে শোক বলতে গেলে তুফান চালিয়ে গেছে তার উপর দিয়ে। ক্ষতবিক্ষত শিল্পী তবু গানের নাওটিকে কোনমতেই লক্ষ্যপথের বাইরে যেতে দেন নি। ভারতীয় সঙ্গীতের বিচিত্র ধারায় অবাধ বিচরণ করেছেন, স্বদেশে বিদেশে যশ, প্রতিপত্তি, সম্মান আর প্রশংসা পেয়েছেন, পেয়েছেন সঙ্গীতপ্রেমী অসংখ্য মানুষের ভালবাসা। বহু গুণী মানুষের কাছে এসেছেন, বাংলা গানের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনার ক্ষেত্রেও তিনি এক অগ্রগণ্য নাম। অসাধারণ ব্যক্তিত্বময় উন্নত চেহারা ভাবগম্ভীর বুদ্ধিদীপ্ত দুই চোখ, দেখলেই শ্রদ্ধাভরে অবনত হয়ে আসে অনুরাগীদের মস্তক। সঙ্গীত যাঁকে অবলম্বন করে বিশেষিত হয়েছে সেই সঙ্গীতময় জগন্ময় নিজেই একটি যুগের ভাস্বর প্রতীক।

জগন্ময়ের জগন্ময় হয়ে ওঠার কাহিনীটি মোটেই আভিজাত্যপূর্ণ নয়, বরং বলা উচিত জীবনপণ লড়াই। জগন্ময় তখন মায়ের গর্ভে। মা এসে আছেন তাঁর চেতলার পিত্রালয়ে। মা বাপের বাড়িতে আসার এক মাসের মধ্যেই জগন্ময়ের পিতা শ্রী যতীন্দ্র নাথ মিত্রের প্রবল পেটের যন্ত্রণা শুরু হল। আছাড়ি বিছাড়ি যন্ত্রণা। বাধ্য হয়ে ভর্তি করাতে হল হাসপাতালে। ডাক্তাররা বললেন, অবস্ট্রাকশন অব ইনটেসটাইন। অপারেশন করতে

হল। অপারেশনের সময়ে উপস্থিত ছিলেন জগন্ময়ের জ্যাঠামশায় সেকালের বিখ্যাত ডাক্তার ডি·এন· মিত্র। কিন্তু চিকিৎসার সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে মাত্র ২৪ বছরে যতীন্দ্রনাথকে ছেড়ে চলে যেতে হল সুন্দর পৃথিবীর যাবতীয় রূপ রস। অবশ্য এখবর দেওয়া হল না সন্তানসম্ভবা মাকে। একমাস পরে জগন্ময়ের মা যখন পুত্র সন্তানকে জন্ম দেবার পর সূতিকা গৃহ থেকে বেরিয়ে এলেন, শাঁখা, সিঁদুর আর শাড়ির পরিবর্তে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল থান ধুতি। পিতৃহারা নবজাতকের নামকরণ নিয়ে অনেক আলোচনার পর স্থির করা হল, নাম দেওয়া হবে জগন্ময়। দেওয়াও হল। কিন্তু আজও তিনি উপলব্ধি করে উঠতে পারেন না, কেনই বা তাঁর জন্মের আগে থেকেই এ সুন্দর পৃথিবী কৃপণ হয়ে রূপ রস গন্ধ, স্পর্শ তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সূর্যোদয়ের প্রভাতী সুরের পরিবর্তে সূর্যাস্তের পূরবী রাগের মূর্চ্ছনা ঝংকৃত করল আকাশে বাতাসে। ৬ সেপ্টেম্বর ১৯১৮ সালটি জগন্ময়ের জন্মলগ্ন ঠিক করল বটে তবু এই দিনটি থেকেই জীবনে এসে ভর করল বিষাদঘন একটা শোকভার বহনের অলিখিত দায়িত্ব।

জীবনের উপলগ্নটি মাতুলালয়ে মাতামহ ভূতনাথ ঘোষ, মাতামহী ও মামা, মামীদের স্নেহচ্ছায়ে কাটলেও পরে জগন্ময়কে চলে আসতে হয় বালিগঞ্জে। ততদিনে জগন্ময়কে ভর্তি করা হল বালিগঞ্জের জগবন্ধু ইনস্টিটিউশনে। সেই শিশুকালেই জগন্ময়ের কাছে বাড়ির সাঙ্গীতিক পরিমণ্ডলটি খুবই প্রিয় ছিল। জগন্ময়ের কাকা পঞ্চানন মিত্র এবং পিতামহ বিধুভূষণ মিত্র ছিলেন সঙ্গীতের খুবই অনুরাগী। কাকা কয়েকজন ওস্তাদের কাছে রাগরাগিনী শিক্ষা করতেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন, মির্জাসাহেব, জমিরুদ্দিন খাঁ, মস্তান গামা প্রমুখ। তবলার তালিম দিতে আসতেন গোলাম আলি খাঁ। কাকার অনুপস্থিতিতে কিশোর জগন্ময় প্রায়ই ঢুকে পড়তেন ঘরে। গোপনে শুরু হল রাগরাগিনী আর তবলা বাদনের শিক্ষা। ওস্তাদের গুরুদক্ষিণা বলতে জগন্ময় মাঝে মাঝে এনে দিতেন দু একটি সিগারেট। ওস্তাদরাও মহানন্দে আগ্রহী কিশোরটিকে শিক্ষা দিতেন।

ইতিমধ্যে জগন্ময় চেতলা বয়েজ এইচ·ই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করলেন। এবার একটু স্বাধীনতা পেলেন বাড়ি থেকে। মায়ের সঙ্গে লুকোচুরি করে জগন্ময় গোপনে কেশব মুখোপাধ্যায়ের কাছে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী শিখতে লাগলেন। মার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াতে হাতে থাকত একটি খাতা। জিজ্ঞাসা করলেই চটজলদি উত্তর—পড়তে যাচ্ছি। অথচ খাতায় ভরা থাকত সা-রে-গা-মা। এমনি করেই কাটল কিছুদিন। হঠাৎই একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল জগন্ময়ের। ইচ্ছে হল অলবেঙ্গল মিউজিক কমপিটিশনে যোগ দেবেন। গুরুশ্রী কেশব মুখোপাধ্যায়ের কাছে নিজের ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। উৎসাহ নিয়ে গুরুও শিক্ষা দিলেন ছাত্রকে। ১৯৩৮-এর জানুয়ারি মাসে কমপিটিশন হল। আশাতিরিক্ত ফল হল। ধ্রুপদ, টপ্পা, ঠুমরী, বাউল, কীর্তন ও রাগপ্রধান গানের প্রতিটিতে প্রথমস্থান অধিকার করে বছরের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগির সম্মান পেলেন। আধুনিক বাংলা গানে তৃতীয় স্থান। এরপর নিয়মিত একটা করে প্রতিযোগিতা হয় আর খবরের কাগজে জগন্ময়ের নাম ছাপা হতে শুরু করে। খবর পৌঁছে গেল মায়ের কাছে ২৪ পরগণার ডায়মণ্ডহারবার ডিভিশনের মালাগ্রামে। কাগজের কাটিংপত্র গুছিয়ে মায়ের সামনে দাখিল করলেন, স্বয়ং জগন্ময়ের কাকা। বললেন, বৌদি, দেখ, ছেলেটা তোমার বরবাদ হয়ে গেল। মা যে তখন ছেলেকে ঘিরে কোন স্বপ্ন দেখছিলেন কে জানে! মায়ের তখনকার মনোভাব ও জবাব ঠিকভাবে
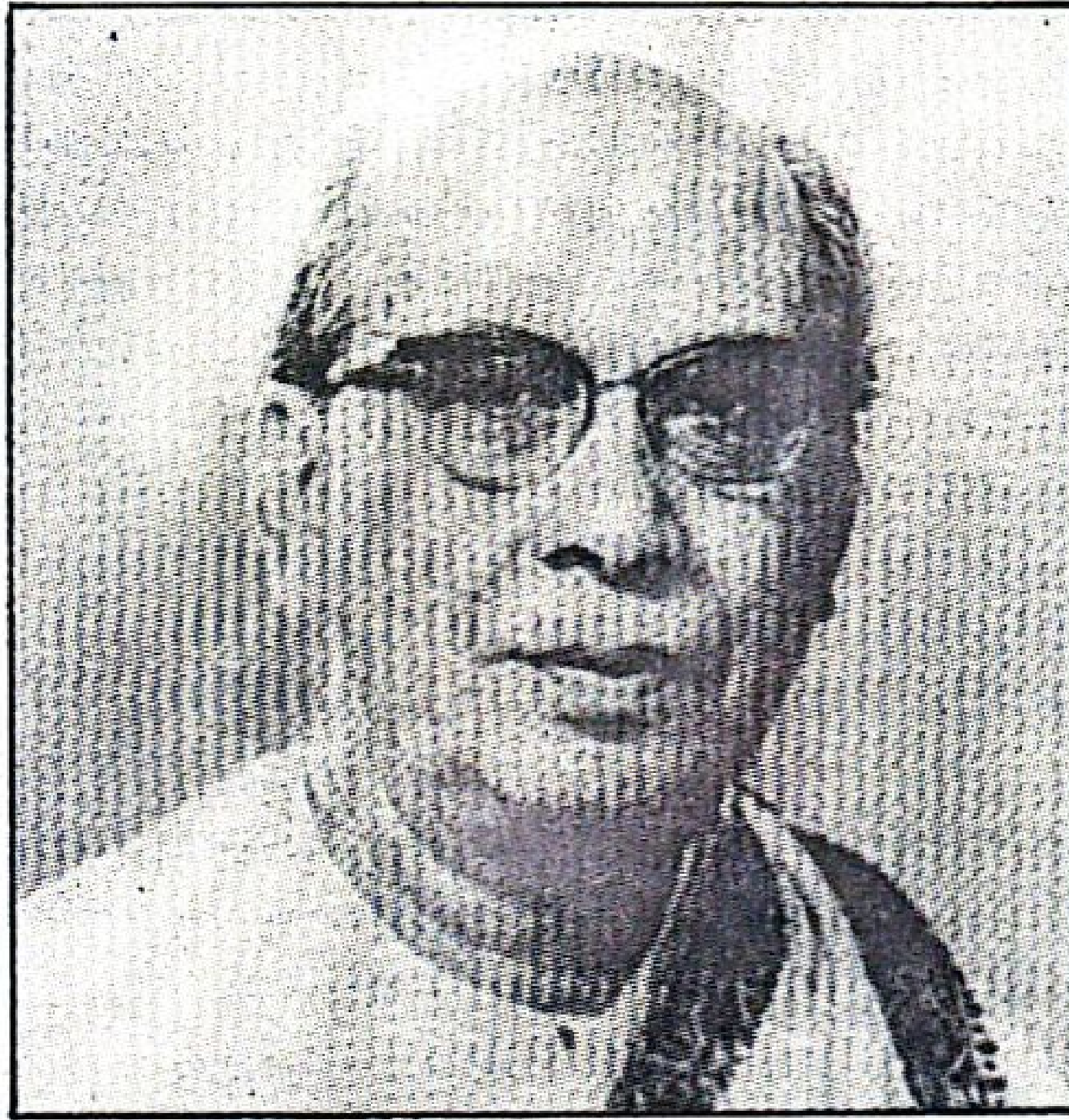
জগন্ময়, পরিণত বয়সে

জানা যায় নি। পরে জ্যাঠামশাই ডি·এন· মিত্র যখন পরোক্ষে জগন্ময়ের প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিলেন তখন আর ভাবনা রইল না কিছু। সুরের বিহঙ্গম ডানা মেললেন। সুরের সাগর পাড়ি দেবার যাত্রাপথ নির্দিষ্ট হয়ে গেল।

দীর্ঘ সঙ্গীতযাত্রার সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কাণ্ডারী হয়ে এলেন বহু গুণী শিল্পী। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপকুমার রায় ওরফে মন্টুদা এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে জগন্ময়ের গান শুনে অভিভূত হলেন। বললেন, 'খোকা তোমার কণ্ঠটি ভারী মিষ্টি——আমার কাছে গান শিখবে?' মন প্রাণ দিয়ে গান শিখলেন জগন্ময়। হঠাৎই মন্টুদাকে চলে যেতে হল পণ্ডিচেরিতে। যাবার আগে একদিন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের সামনে জগন্ময়কে ডেকে আনলেন তিনি। তারপর ভীষ্মদেবকে বললেন, 'দেখ ভীষ্ম, এই ছেলেটির সঙ্গীতের একটা জন্মগত ট্যালেন্ট আছে। একে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম—একে একটু দেখো।' ভীষ্মদেব নতুন শিষ্যকে সমান আগ্রহ নিয়ে গান শেখালেন। ফিল্ম কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার ফিল্ম কোম্পানির সঙ্গীত পরিচালক পদ গ্রহণ করার পর হিন্দি ছবি 'গরীবী'তে নিজের করা সুরে একটি গান গাওয়ালেন জগন্ময়কে দিয়ে।

এরপর জগন্ময়ের দুর্বার অগ্রগমনের ইতিহাস। যেখানেই গেছেন, প্রশংসা আর প্রশংসা। সুরবিবশ সরীসৃপের মত অনুরাগী ভক্তরা নিশ্চুপ হয়ে শুনেছে শিল্পীর গান। তখনও অবশ্য রেকর্ড হয়নি গানের। আকাশবাণীতে অবশ্য বেশ কয়েকবার প্রোগ্রাম করেছেন জগন্ময়। শেষে ১৯৩৮—এ জগন্ময় ডাক পেলেন এইচ·এম·ভি· থেকে। কাজী নজরুলের 'শাওন রাতে যদি' দিয়ে রেকর্ডিং—এ জগন্ময়ের অভিষেক।

এইচ·এম·ভি থেকে জগন্ময়ের রেকর্ড বার হবার পর বাংলা গানের অনুরাগীদের মধ্যে আলোড়ন শুরু হল। হু হু করে বিক্রি হতে লাগল জগন্ময়ের রেকর্ড। রেকর্ডও বেরোতে লাগল একের পর এক। কাজী নজরুল, অজয় ভট্টাচার্য, প্রণব রায়, শৈলেন রায়, সুবোধ পুরকায়স্থ, হরেন ঘটক, মোহিনী চৌধুরী প্রভৃতি গীতিকারের কথায় কমল দাশগুপ্ত, হিমাংশু দত্ত, সুবল দাশগুপ্ত, কখনও বা নিজের সুরে গান করলেন জগন্ময়। শুধু গানের রেকর্ডই করা নয়, জগন্ময় বাংলা বহু ছবির প্লে ব্যাক করলেন। বাংলা আধুনিক গানেই সীমাবদ্ধ নয় জগন্ময়ের সঙ্গীতমালা। তিনি বহু হিন্দি গীত ও গজল গেয়েছেন। সারা ভারতে সঙ্গীত পরিক্রমার সময়ে প্রান্তে প্রান্তে এই সব গান ও গজল শুনিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করেছেন। জগন্ময়ের গান শুনে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী, লোকনায়ক জয় প্রকাশ নারায়ণ, ঋষি অরবিন্দ প্রমুখ বিশিষ্ট মনীষী প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের গান রেকর্ডিং করার আগে একটি ঘটনা ঘটল। একদিন এইচ·এম·ভি-র তৎকালীন রেকর্ডিং—এর দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রী হেমচন্দ্র সোম নিয়ে গেলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কাছে। সেটা ১৯৪০ সাল। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে হেমবাবু গুরুদেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন জগন্ময়কে দিয়ে গুরুদেবের গান রেকর্ড করাতে চান। হিট গানের প্রুফ কপি বা স্যাম্পেল কপি দিলেন, 'ছিন্নপাতার সাজাই তরণী একা একা করি খেলা'। অন্যটি 'একদা তুমি প্রিয়ে'। দ্বিতীয় গানটির অনুমতি দিতে গিয়ে বললেন, 'দেখ বাপু, এই গানটি একটু ভালোবেসে গেও।' পরে রেকর্ড শুনে গুরুদেব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন, 'জগন্ময় অপূর্ব গেয়েছে!' স্বয়ং গুরুদেবের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের হাতেখড়ি নিয়ে জগন্ময় আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলেন সেদিন। এর পরেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড করিয়েছেন জগন্ময়। কিন্তু প্রথম ঘটনাটি জগন্ময়ের জীবনে আশ্চর্যরকম সুষমামণ্ডিত হয়ে আছে।

ধ্রুপদ থেকে ঠুমরী, রাগপ্রধান থেকে আধুনিক, সঙ্গীতের বহুমুখী ধারায় সচ্ছন্দ বিচরণ করলেও জগন্ময় যে রেকর্ডটির জন্য বাঙালির কাছে সব চাইতে বেশি জনপ্রিয় তা হল——চিঠি। 'তুমি আজ কত দূরে'——গানটি আজ গ্রামবাংলার পথে

প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়। এই রেকর্ডটি লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে। অভিন্নহৃদয় বন্ধু হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তাকেও এক সময় ছাপিয়ে গিয়েছিলেন জগন্ময় শুধু এই রেকর্ডের জন্যই। দুই শিল্পীই যে যার ক্ষেত্রে অপ্রতিরোধ্য। বাংলার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যেমন সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে হেমন্তকুমার তেমনি জগন্ময় পরিচিত জগমোহন বলে। ভারতের প্রান্ত থেকে প্রত্যন্তে জগন্ময় প্রেমের গানের গায়ক বলে রীতিমত জনপ্রিয়।

'চিঠি' রেকর্ডটি বার হবার পর জগন্ময়কে কম ঝামেলার মুখোমুখি হতে হয় নি। সকলে ঠাওরালেন, পত্নী বিয়োগ ঘটেছে বলে জগন্ময় এ ধরনের গান গাইছেন। কেউ কেউ যেচে বিবাহের প্রস্তাবও আনলেন। যেখানেই যান, একই প্রসঙ্গ। আহা, এই বয়েসে বউ মরলো! মানুষের এই সাহনুভূতি আর সমবেদনায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল শিল্পী জীবন। বলতে বলতে হাসছিলেন এই শিল্পী তাপস--'তখনও তো আমার বিয়েই হয় নি। আর একটা কথা বলি, লোকে আমার সমালোচনা করতেও ছাড়েনি কিন্তু। বলেছে প্রেমের পাগল গায়ক বটে জগন্ময়। প্রেম, বিরহ, নদী, ফুল, আর চাঁদ নিয়েই তার গান। আরে বাবা, আধুনিক গান করলেও আমি সঙ্গীতের অনেকগুলি দিকই জানি। ধ্রুপদ থেকে আধুনিক সব রকম গানের ক্ষেত্রেই আমি সাদৃশ্য অনুভব করি।'

প্রেমের গান যে শুধুমাত্র ম্যাড়মেড়ে হবে আর নদী, ফুল সবর্স্ব হবে তার কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে বলে বিশ্বাস করেন না জগন্ময়। সুরসাগর শিল্পী গীতিকার মোহিনী চৌধুরীকে অনুরোধ করেছিলেন ভিন্নস্বাদের একটি গান লিখে দেবার জন্য। মোহিনীবাবু লিখেও দিয়েছিলেন--

আমি দুরন্ত বৈশাখী ঝড়,
তুমি যে বহ্নিশিখা
মরণের ভালে এঁকে যাই মোরা
জীবনের জয়টীকা।

এ গানটিও সুপার হিট হল। জগন্ময়ের সুরের সাগরটি আরও বেশি চঞ্চল হয়ে উঠল গানের উর্মিল ছন্দে। কিন্তু শোক আবার ছারখার করে দিয়ে গেল জগন্ময়কে। জগন্ময় তখন বিদেশে। সেই ৮০-র দশকের প্রথম বছর। বিদেশের মানুষ যখন প্রাণের আনন্দে জগন্ময়কে সম্মান প্রশস্তি দিয়ে চলেছেন তখন স্ত্রীর ফোন গেল। মা নেই। জীবনে যাঁর কাছ থেকে পিতার এবং মাতার যুগবৎ আশ্রয় পেয়েছেন, আশ্রয় হারিয়ে জগন্ময় মুষড়ে পড়লেন। সেই অসহায় পরিস্থিতি সামাল দিতে না দিতেই আবার শোক। বোম্বের বাড়ি থেকে জগন্ময় এসেছিলেন কলকাতায়। হঠাৎই মেয়ের ফোন, 'চলে এস, মা'কে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।' ফিরে গিয়ে শুনলেন স্ত্রীর ব্লাড ক্যানসার। প্রিয়তমা পত্নীকেও শেষ পর্যন্ত হারাতে হল জগন্ময়কে। সবাক্ কণ্ঠ কেমন যেন ঝিমিয়ে গেল। জীবনের সব ঝড়-ঝঞ্ঝা যিনি একক হাতে সামাল দিতেন তাঁকে হারিয়ে এক অসীম শূন্যতার ধারে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

সুরসাগর জগন্ময় মানুষের কাছে পেয়েছেন অসীম প্রশংসা তবু আজ জীবনের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসেও এক নিরাশার দোলায় দোলেন। আজও যে সঙ্গীতের যথাযথ বিচার হল না। কে জানে আধুনিক শিল্পীরা আজ কোন পথে নিজের শিল্পধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। শিল্পীর সংকল্প আজ যে আদপেই তপস্যার ধ্যানাসনটিতে বসতে পারছে না। স্মৃতিচারণার 'শাওন রাতে যদি'—বইটিতে বারংবার একই কথার অনুরণিত হয়েছে। তাঁর মুখে আজও একই কথা। আজও শিল্পীর যথার্থ মূল্যায়ন করার মাপকাঠিটি নির্ণয় করা হয়ে উঠতে পারে নি। দিকপাল মনীষী নজরুল, কবি রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য জগন্ময় জীবন মন পরমকারুণিকের পায়ে সমর্পণ করে আজও মনে মনে গেয়ে ওঠেন—'খেলা শেষ হল, শেষ হয় নাই বেলা।' এক লহমায় সূর্যের মরা রোদ তাঁর গম্ভীর মুখটিকে আরও বেশি ঘন ও মূর্ত করে তোলে। বলেন, 'ও পারের ডাক শুনতে বোধহয় বড় দেরি নেই আর!' **গুরুপ্রসাদ মহান্তি**

(ছবি: স্বতীশ চক্রবর্তীর সৌজন্যে)
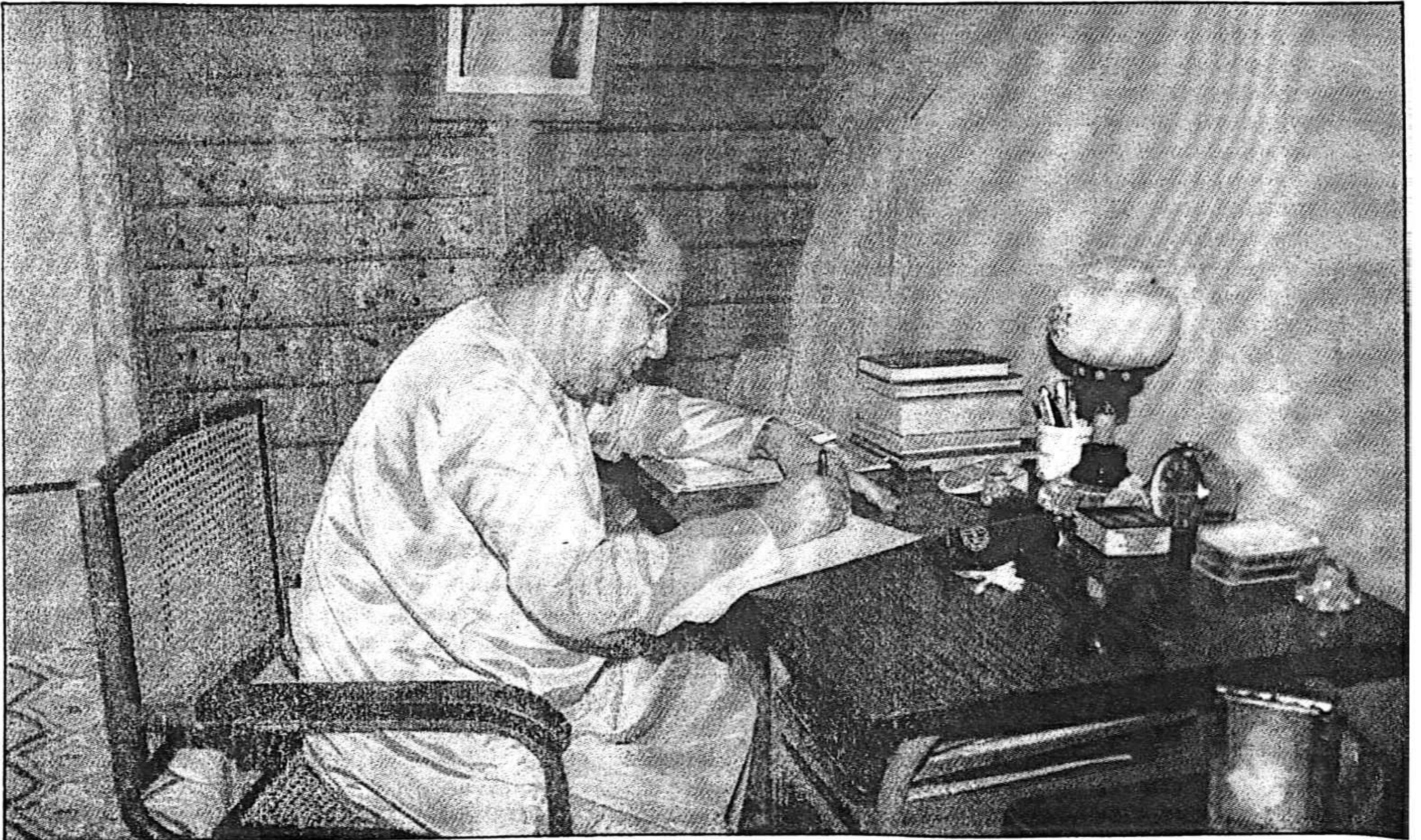
শরীরের কলকব্জার বাজার : কিডনি, লিভার, চোখ ও চামড়ার কেনাবেচা

কলকাতা, দিল্লি, বম্বে, মাদ্রাজ ও ভেলোরের প্রথিতযশা হাসপাতালগুলিকে কেন্দ্র করে ভারতের হতদরিদ্র বস্তি ও টোলাগুলিতে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গোপন বাজারের রমরমা অগ্রগতিতে শঙ্কাগ্রস্ত কেন্দ্রিয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক সম্প্রতি লোকসভার মাননীয় সাংসদের উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রির পেক্ষাপটে চিকিৎসা দুনিয়ায় ঘটে চলা এক অমানবিক ব্যবসার উপর তথ্যসমৃদ্ধ আলোকপাত, সঙ্গে ক্রেতা, বিক্রেতা ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সাক্ষাৎকার।

রক্তের কেনাবেচা

জমি বিক্রি, বাড়ি বিক্রি অথবা আসবাব বিক্রির মত এখন মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রির ব্যবসাও ভারতের কসমোপলিটন শহর এবং তার কাছাকাছি শহরতলিগুলিতে রমরম করে চলছে। গত সেপ্টেম্বর মাসের অধিবেশনে লোকসভা জুড়ে এ ব্যাপারে সরব আলোচনা এবং সম্পর্কবিহীন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রিতে আইনীবাধা দেওয়ার জন্য বিল আনার দাবী ভারতীয় জনজীবনের এই সাম্প্রতিক সমস্যাটিকে জনমানসে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। সেই আলোড়ন কিডনি, চোখ এবং রক্ত বিক্রির মত ব্যাপক ব্যবসায়িক দিকটিকে নাড়া দিলেও এই ব্যবসার নেপথ্যে এই তিনটি বিকিকিনিই শেষ কথা নয়। এখন তো চামড়া, ভ্রূণ, কংকাল এমন কি মাথার চুলও সেই কেনাবেচার পসরায় শরীক হয়ে বসে আছে। দেশব্যাপী ওই অতি প্রয়োজনীয় আলোড়নের প্রেক্ষাপটে আলোকপাত প্রয়াস নিয়েছে ওইসব অমানবিক ব্যবসাচক্রের হালহকিকতটি তথ্যসমৃদ্ধ ভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরার।

অঙ্গ বাজারের সাম্প্রতিক সংযোজন হল ভ্রূণ বিক্রি। ডাঃ সুভাষ মুখার্জি এবং ডাঃ বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীকৃত সফল টেস্টটিউব বেবি তৈরি হওয়ার পর ভ্রূণের চাহিদা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। বন্ধ্যা–রমণীদের বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়ে জননী হতে গেলে একটি ভ্রূণ সংস্থাপিত হওয়া দরকার। সেই ভ্রূণটির পাওয়া না পাওয়া নিয়ে এখন উঠেছে ব্যবসায়িক লেনদেনের অভিযোগ। কিন্তু এই অভিযোগের গুরুত্ব অনেক বেশি হলেও ক্ষেত্র তত ব্যাপক নয়; বরং খুবই অল্পপরিসর।
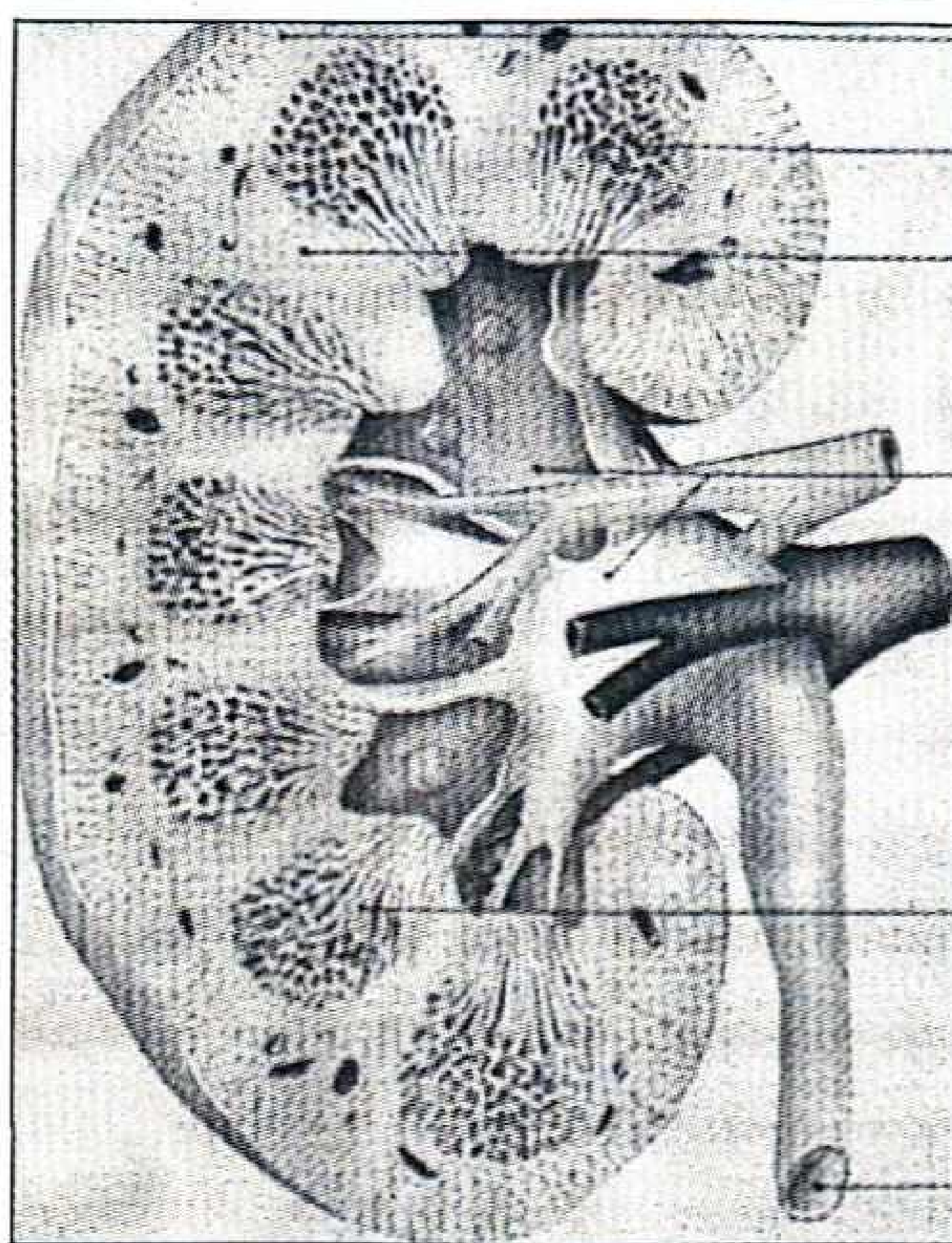
কিডনি প্রতিস্থাপন এখন লাভজনক ব্যবসা

শুধু ভ্রূণই নয়, ভারতের নামকরা শহরগুলিতে আজ মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাওয়া যায় যার দাম আগে থেকেই নির্দ্ধারিত হয়ে আছে দেখলে ঠিক মাংসের বাজারের মতই মনে হবে ৩০ হাজার টাকায় একটি কিডনি, ৮০ হাজার টাকায় একটি জীবন্ত কর্নিয়া, এক ফালি চামড়া ১ হাজার টাকায়, একটি মৃতদেহ ৬ হাজার টাকায় এবং একটি সম্পূর্ণ কংকাল পাওয়া যায় ১০ হাজার টাকায়। যদিও এইভাবে জীবন্ত অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ কেনা–বেচা সরকারি আইন বহির্ভূত কাজ। কিন্তু

ভ্রূণও কি ব্যবসায়ের অঙ্গীভূত ?

সালয়ের নেফ্রলজি ডিপার্টমেন্টের চারপাশে কিডনি বিক্রি চক্রের দালালরা যে ঘোরাফেরা করে সে কথা বলাবাহুল্য। হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণীর কিছু কর্মীর সঙ্গে এদের একটা বিশেষ যোগসাজস আছে। এই চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের কাছ থেকে কিডনি কেনা-বেচার খবর এরা সংগ্রহ করে। তারপর প্রয়োজন অনুযায়ী দরদাম ঠিক করে যথাসময়ে হাজির হয়। তাছাড়া প্রথিতযশা শল্য-চিকিৎসক ডাঃ এস কে আগরওয়ালের বক্তব্য মোতাবেক জানা গেছে যে ক্যালকাটা হসপিটাল, বেলভিউ নার্সিংহোমের নেফ্রলজি বিভাগে ডোনার-দের নামের তালিকা নাকি থাকে। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে পূর্ব ভারতে প্রথম কিডনি প্রতিস্থাপনের সফল অপারেশন হয়েছিল ক্যালকাটা হসপিটালের শল্য চিকিৎসক এই ডঃ এস কে আগরওয়ালের নেতৃত্বেই। সেবারের কিডনি প্রতিস্থাপক সেই
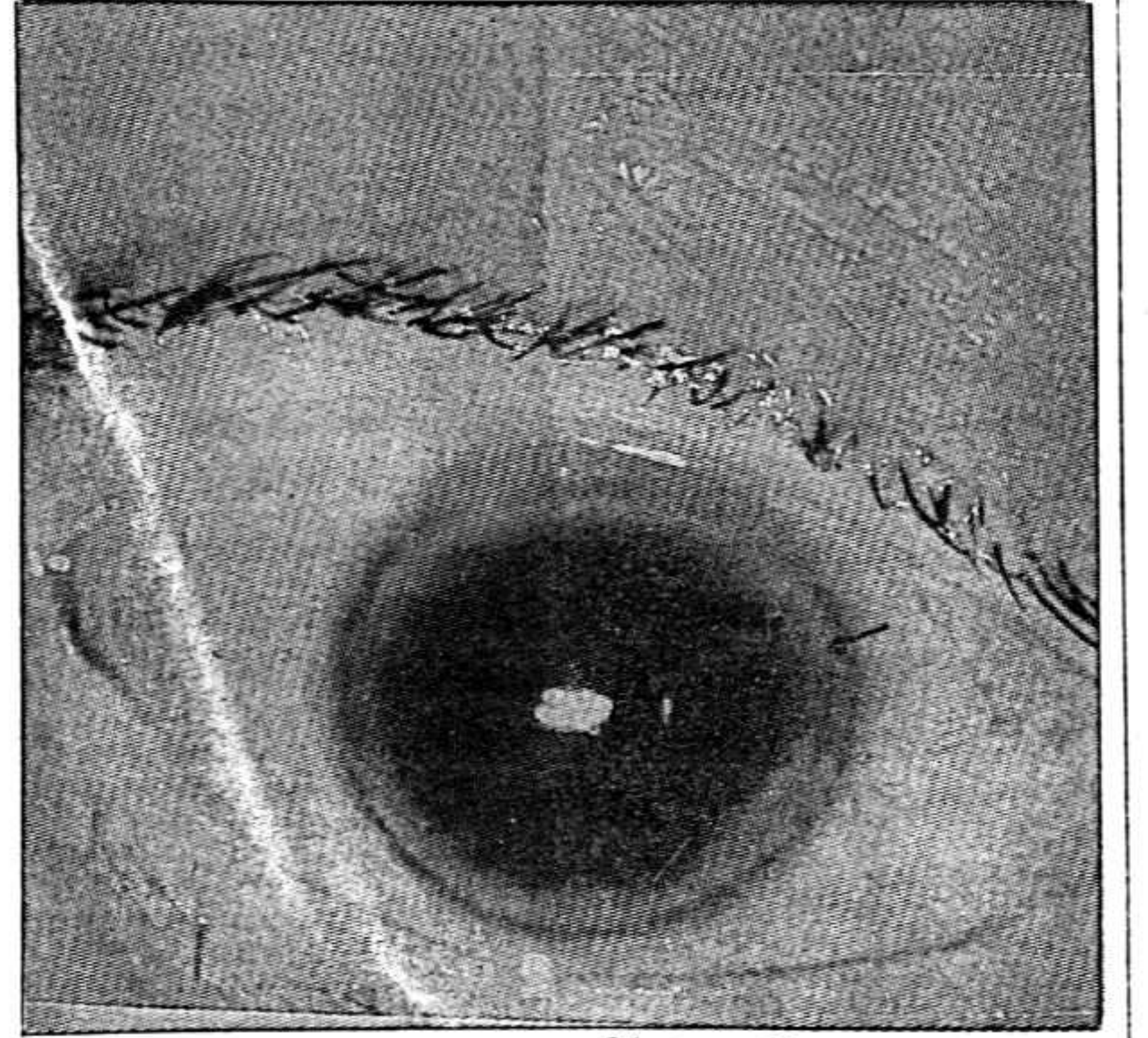
কর্ণিয়া গ্রাফটিং, লাভজনক পেশা

ভদ্রমহিলা এখনও সুস্থ শরীরে বেঁচে আছেন। স্বেচ্ছায় যে কোন ব্যক্তি তার দেহের যে কোন অংশ দান করতে পারে রক্তের সম্পর্কাধীন কাউকে। কিন্তু আগস্ট '৯০ মাসের লোকসভা অধিবেশনে কংগ্রেসী সাংসদরা দাবী তুললেন যেখানে টাকার লোভ দেখিয়ে গরীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধনীর স্বার্থে ব্যবহৃত হয় সেখানে কড়া সরকারি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। শুধুমাত্র টাকার জন্যে মানুষ বাধ্য হয় তা করতে। এটাকেই জেনেভাকেন্দ্রিক ইন্টার ন্যাশনল কমিশন অব হেলথ্ প্রফেশনার্স নীচ, শোচনীয়, নিন্দনীয় বলে ঘোষণা করেছে।

কিডনি কেনা-বেচার এই ব্যবসা আজ দক্ষিণ ভারতের বাঙ্গালোর, মহীশূর, মাদুরাই, পশ্চিম ভারতের পুণে, জয়পুর এবং পূর্ব ভারতের পুরী, ভুবনেশ্বর, হাওড়া, আগরতলা, গৌহাটি, শিলচরের মত ছোট শহরগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছে। কেন্দ্রিয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রাপ্ত হিসেব মোতাবেক এই সমস্ত

কঙ্কালের চাহিদাও যোগানের তুলনায় কম

মানুষের প্রয়োজনের তীব্রতা যে সরকারি আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে এই ব্যবসাকে চালিয়ে যেতে দিচ্ছে তার প্রমাণ মিলবে নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানে। প্রত্যেক বছর সারা ভারতে জীবন্ত কিডনি বিক্রির মোট সংখ্যা দু হাজার। ১৯৮৫ তে এই বিক্রির সংখ্যা ছিল ৫০০-র কিছু বেশি। ১৯৮৩ তে ছিল ৫০-এর মত। কিন্তু কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের হাসপাতালগুলিতে ইদানিং প্রোফেশনাল কিডনি সংগ্রহ নিষিদ্ধ হওয়াতে এই ব্যবসা এখন ঢুকে পড়েছে মেট্রোপলিটন শহরের চারপাশের বৃহদাকার নার্সিংহোম বা প্রাইভেট হসপিটালগুলিতে। যেখানে সাজানো আত্মীয়তার আড়ালে দান করার বণ্ড লিখিয়ে আইনসম্মত ভাবে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে কিডনি। কলকাতার কয়েকটি নামকরা চিকিৎ-

অপারেশনের পর, কিডনি

শহরের বিভিন্ন সংস্থা কিডনি বিক্রি করে দালালি বাবদ বছরে ৪০ কোটি টাকার মত আয় করে, আর যারা নিজেদের শরীর থেকে কিডনি কেটে বিক্রি করে দিচ্ছেন তারা পাচ্ছেন সমস্ত মুনাফার এক দশমাংশ। বছরে এদের প্রাপ্তি ১০ কোটি টাকার নিচে। দাতার শরীর থেকে কিডনি নিয়ে গ্রহীতার শরীরে প্রবেশ করানোর মধ্যে শল্যবিদ্যা অনুযায়ী সময় লাগে ৪৫ মিনিটের মত। বিশেষ ক্ষেত্রে কিডনি প্রতিস্থাপনের পরিবর্তে ব্লাড ইউরিয়া কমাতে ডায়ালিসিসও করা যায়—কৃত্রিম কিডনির মধ্যে দিয়ে রক্তের সমস্ত দূষিত পদার্থ বার করে দেয়। সপ্তাহে দু দিন ডায়ালিসিস করানো দরকার। ৫/৬ ঘন্টার এই ডায়ালিসিসে প্রতিক্ষেপে খরচ ৪০০ টাকার মত। ভারতে মোট ৬৫০টি ডায়ালিসিস ইউনিট রয়েছে। কলকাতার সরকারি হাসপাতালগুলির মধ্যে একমাত্র শেঠ সুখলাল করনানি মেমোরিয়াল হাসপাতালে এই ব্যবস্থা আছে। বেসরকারি প্রচেষ্টায় বেলভিউ নার্সিং হোম এবং ক্যালকাটা হসপিটালেই এই ব্যবস্থা রয়েছে।

কিডনি বিক্রেতাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক মহিলাও আছে। অর্ধাহারে, অনাহারে থাকতে থাকতে এদের কাছে শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রি করাটা কোন ব্যাপারই না। অবশ্য আত্মসম্মান বজায় রাখতে এছাড়া এদের কোন পথও নেই। কেন্দ্রিয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকে জমাপড়া তথ্যে এমনই এক কিডনি বিক্রেতার কথা নথিবদ্ধ রয়েছে। দুটি বাচ্চার মা-উদয়া অমৃবি। স্বামীর টি ভি মেকানিক্সের কাজ চলে গেলে উদয়া ঠিক করলেন নিজের একটা কিডনি বিক্রি করবেন। যে দেশে ১০ শতাংশ মানুষ কিডনির অসুখে ভুগছেন, যে দেশের সত্তর শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য হতাশায় জর্জরিত, সে দেশে এরকম ঘটনা খুবই স্বাভাবিক। দুঃখ দুর্দশা দৈহিক অঙ্গ বিক্রির প্রয়োজনীয়তাকে কতখানি তীব্র করে তোলে তার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল জি বালান। মাদ্রাজের উপকণ্ঠে একটি সিনেমা হলের রক্ষী সে। একমাত্র বোনের বিয়ে দিতে গিয়ে কপর্দক শূন্য হয়ে পড়ে। তার ওপরে আবার নিজের বিয়েতেও তার বেশ কিছু ধার-কর্জ হয়। মাস গেলে ২০০ টাকা বেতন। নুন আনতে পান্তা ফুরনোর দশা। শেষ পর্যন্ত নিজের দারিদ্র্য মোচনের উপায় স্বরূপ কিডনি বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয়। একটি কিডনি বিক্রি করতে পারলে হাজার তিরিশের মত আয় হবে। কম কি? এজেন্টের কথা বালান লুফে নেয়। ওই টাকায় সে ঋণ শোধ করেছে। পরে আরও টাকার প্রয়োজন হলে স্ত্রীর কিডনিও বিক্রি করে। একে একে সমস্ত ধার পরিশোধের পর বালান বাড়ি ওঠালো। একেবারে পাকা ইঁটের গাঁথনি। আস্তে আস্তে সংসারের একটি দুটি জিনিস করল। তার অনেকদিনের শখ একটি সাইকেল কেনার। অবশেষে সে ইচ্ছাও পূরণ হল। শুধু

বালান নয় মাদ্রাজের কাছাকাছি এই সীমান্ত এলাকা ভিল্লিভাকরাম গ্রামের অনেকের কাছেই দুটো পয়সা উপায়ের পন্থা রয়েছে কিডনি বিক্রি। জি বালানের মত অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোরের বাসিন্দা শঙ্কর ভেলায়ুধন, মাদ্রাজের রাজকুমার ও লক্ষ্মী নটরাজন স্রেফ পয়সার জন্য কিডনি বেচে দিয়েছে। ওদের কথামতন আমরা একেবারে মরিয়া হয়ে গিয়েছিলাম। কিডনি বিক্রি না করলে আমাদের মাদক দ্রব্যের বেআইনি কারবার করতে হত কিংবা স্থানীয় দাদাদের ধরে চোরাচালানের কালোবাজারি করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় থাকত না। এখন শঙ্কর কিডনি বিক্রির টাকায় চায়ের দোকান খুলেছে। যথার্থ মূল্য পেলে একটি চোখও সে বিক্রি করতে প্রস্তুত। মাদ্রাজের অনুকরণীয় চিত্র একটু ঘাঁটলেই নজরে পড়ে যাবে কলকাতার কাছের শহরতলী পিলখানা, কলাবাগানের মত বড় বস্তিগুলিতে। বম্বের দারাভি বস্তিতেও ছবিটি বিরাজমান।
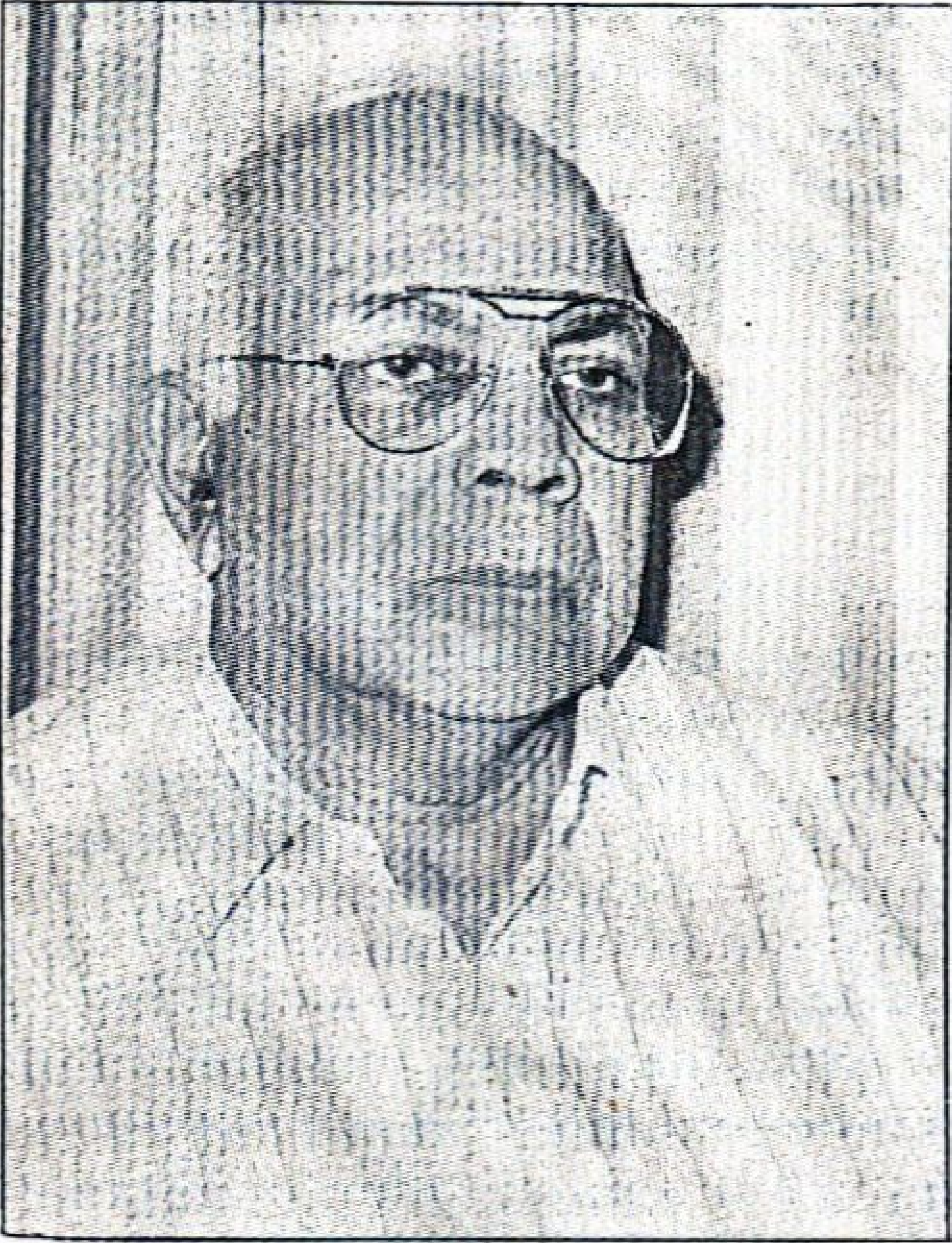
প্লাস্টিক সার্জন: ডাঃ এইচ আর পি সিনহা

একটি কিডনি কেনা যথেষ্ট খরচ সাপেক্ষ। তবু গ্রাহকের জীবন এই একটি কিডনি একেবারে নাটকীয়ভাবে বদলে দিতে পারে। এক্ষেত্রে কিডনিদাতাকে ৩০ হাজার টাকা দেওয়া ছাড়াও একজন রোগীর ৫০ হাজার টাকা এজেন্ট খরচা এবং আরও ৭০ হাজার টাকা অপারেশন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচের জন্য দরকার। দক্ষিণ ভারতে মোটামুটি দেড় লাখ টাকা নিয়ে কিডনি ট্রান্সপ্লানটেশনের কাজে নামতে হয়। বম্বেতে এর পরিমাণ দু লক্ষ টাকা এবং কলকাতায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এছাড়াও এক বছর প্রতি মাসে সংক্রমণ প্রতিরোধক ওষুধের জন্য রোগীর লাগে আরও ৩ হাজার টাকা যা বিদেশ থেকে আমদানি করা ওষুধ। কাজেই সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে কিডনি অপারেশন করানো খুবই দুঃসাধ্য। বোম্বাইয়ের যশলোক, ব্রিচক্যান্ডি, মাদ্রাজের এ্যাপোলো হাসপাতাল ও ভেলোরের ক্রিশ্চিয়ান মেডিকেল কলেজ, কলকাতার ক্যালকাটা হসপিট্যাল সহ বিভিন্ন প্রধান হাসপাতালগুলিতে রোগীর কেনা কিডনি নিয়েই প্রতিস্থাপন করা হয়। কারণ রোগীর আত্মীয়স্বজন কিডনি দিতে ইচ্ছুক না হলে এছাড়া অন্য কোন পথও নেই। তাই দেখা যায় কিডনি ব্যবসার ক্ষেত্রে বড় বড় শহরের হাসপাতালগুলির চারপাশে দালালরা ঘোরাফেরা করে। কিডনির অসুখে আক্রান্ত কোন রোগী এলে এরা তাদের ব্লাড গ্রুপ জিজ্ঞেস করে। এজেন্ট তখন একটি তালিকা দেখে ওই নির্দিষ্ট গ্রুপের কোন ডোনারের নাম তালিকায় আছে কি না দেখে। তারপর রফা হয়। অন্তত ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা ক্রেতাকে দিতে হয় শুধু কিডনি বাবদ। তাছাড়াও এক সপ্তাহ হাসপাতালে থাকার খরচ। কিডনিদাতাও রোগীর সঙ্গে একই হাসাপাতালে ভর্তি হয়। মাত্র ৪৫ মিনিটের মধ্যে দাতা–গ্রহীতার মধ্যে দেওয়া নেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়। 'আমি তো এইরকম কিডনি কেনার ব্যাপারে কোন অসঙ্গতিই দেখি না। নিজের সন্তানের ভালো কে না চায়? বিশেষ করে যে দেশে প্রতি দশ হাজারে এক হাজার জন কিডনির অসুখে ভুগছে, সে দেশে সরকারের তরফ থেকে কিডনি কেনার ব্যাপারে সুস্পষ্ট আইন করা দরকার।' এই অভিমত ক্যালকাটা হসপিটালের বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক ডঃ এস কে আগরওয়ালের। তাঁর মতে ভারতীয় হিন্দুদের গোঁড়ামিই এ ব্যাপারে একটি প্রধান অন্তরায়। তা না হলে এ্যাকসিডেন্ট কিংবা অন্য দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে কিডনি নিয়ে অনায়াসে ট্রান্সপ্লানটেশনের কাজে লাগান যায়।

ক্যালকাটা হসপিটালের প্লাসটিক সার্জন ডঃ এইচ আর পি সিন্‌হাও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। তাঁর অভিমতটি অবশ্য অঙ্গ বাজারের সাম্প্রতিকতম সংযোজন চামড়া বিক্রি তথা স্কিন সংগ্রহের ব্যাপারে। এখন ছেঁড়াফাটা পোড়া জায়গা মেরামত করতে প্রতি স্কোয়ার ইঞ্চ ৩০০ টাকার ভিত্তিতে চামড়া কেনার ব্যবসাও শুরু হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে স্কিন গ্রাফটিং করা হয়। আর এ ব্যাপারে এখনও কলকাতাই ভারতের মধ্যে সেরা। চিকিৎসার সাফল্য কলকাতায় বেশি হলেও চামড়া সংগ্রহ বেশ সমস্যার। আত্মীয়স্বজনরা না দিলে কেনা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এবং সেখানেও ভরসা গরীব মানুষজনকে টাকায় প্রলোভিত করে জানুদেশের নরম চামড়া কিনে নেওয়া। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, চামড়া বিক্রি অবশ্য কিডনি বিক্রির মত লার্জ স্কেলে করা হয় না। কারণ তত প্রয়োজন নেই।

কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশনের ক্ষেত্রে সফলতার হার অনেক বেশি যা কর্ণিয়া প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে এখনও তেমন ভাবে হয় নি। তাছাড়া চোখ কিনতে চাওয়া বা কর্ণিয়ার চাহিদার ক্ষেত্রে ওয়েটিং লিস্টে এত রোগীর নাম তালিকাভুক্ত হচ্ছে যে শুধু দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স এবং কলকাতার ইন্ডিয়ান পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল রিসার্চ ইন্সটিটিউটের এই কাজ করতে কম করেও দু'বছর পেরিয়ে যাবে।

কিডনি ভ্রূণের মত চোখ বিক্রিও আজকের চিকিৎসাজগতকে উঁচু আসন থেকে টেনে নামাচ্ছে। জাতীয় ইংরাজি পাক্ষিক 'ইন্ডিয়া টুডে'র প্রকাশিত তথ্য মতে এখন একটি জীবন্ত চোখের দাম ৮০ হাজার টাকা। তবে চোখ কেনা–বেচা সরকারি হাসপাতালগুলির তুলনায় বেসরকারি চিকিৎসালয়গুলিতেই সংগঠিত হয় বেশি। আর সুবিধা শুধুমাত্র ভোগ করেন বৃহৎ ব্যবসাদার এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা। এই কেনা–বেচা কাগজে কলমে নিকটাত্মীয়ের 'চক্ষুদান' হিসেবে দেখানো হয়ে থাকে। যার ফলে চলিত আইন দিয়ে অপরাধীটিকে কিছুতেই চিহ্নিত করা সম্ভবপর হয় না।

চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ অনুতোষ দত্ত

কলকাতায় এ পর্যন্ত বেসরকারি আই ব্যাংকের সংখ্যা দুটি। ১) ইন্টারন্যাশনাল আই ব্যাংক ২) মুক্ত আই ব্যাংক। এ পর্যন্ত ইন্টারন্যাশনাল আই ব্যাংক পশ্চিমবঙ্গে মোট সত্তর জোড়া চোখ সংগ্রহ করতে সক্ষম হচ্ছে। এর মধ্যে গত জুন মাসে দশ জোড়া চোখ এই ব্যাংকে জমা পড়ে। এ পর্যন্ত কলকাতায় কর্ণিয়া গ্রাফটিং হয়েছে ৪০ জনের। ১৮,০০০–এর মত প্লেজ কার্ড ডোনারদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হলেও দাতাদের কাছ থেকে কর্ণিয়া সংগ্রহের ব্যাপারে বেশ কিছু টেকনিক্যাল অসুবিধা রয়েছে। প্রথমত যারা কর্ণিয়া সংগ্রহ করবেন তারা বিভিন্ন

প্র · চ্ছ · দ · প্র · তি · বে · দ · ন

হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত, এদের সময় মত পাওয়া যায় না। যদি বা পাওয়া যায় সংরক্ষণের ব্যাপারে যে সমস্ত পদ্ধতি নেওয়া প্রয়োজন–নির্দিষ্ট তাপ-মাত্রা, ব্যাকটোরিয়লজিক্যাল কালচার এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রিজার-ভেশনের অভাবে কর্ণিয়া গ্রাফটিং-এর প্রগতির ক্ষেত্রে নানা ধরনের বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ ধারণাগত তত্ত্ব হিসেবে এইসব অসুবিধার কথাকে সর-কার স্বীকার করে না। দ্বিতীয়ত যে সমস্ত দাতারা কর্ণিয়া দান করার ব্যাপারে অঙ্গীকার করেছেন তাদের মৃত্যুর সময় হয়ত বাড়ির লোকেরা আই ব্যাংকে খবর দিতে পারল না কিংবা দাতা এমন জায়গায় মারা গেলেন যার কাছাকাছি কোন আই ব্যাংক নেই। সেক্ষেত্রে মৃতব্যক্তির কর্ণিয়া সংরক্ষণের কোন প্রশ্নই উঠছে না। আই ডোনেট করার পর ব্যক্তি টিবি, ডায়াবেটিস, জন্ডিস ইত্যাদি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হলে ওই ব্যক্তির কর্ণিয়া কোন কাজে আসে না। কলকাতায় সরকারি প্রচেষ্টায় একমাত্র মেডিকেল কলেজ এ্যান্ড হসপিটালে আই ব্যাংক আছে। বেহালার বালানন্দ হাসপাতালের ডঃ অনুতোষ দত্তের মতে, জীবন্ত কর্ণিয়া বিক্রির খবর ভারতের কোন কোন শহরে থাকলেও কলকাতায় অন্তত নেই। কলকাতার নামকরা চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ রণবীর মুখার্জির মতে একটি জীবন্ত কর্ণিয়ার দাম কখনও আর্থিক মূল্যে নির্ধারিত হতে পারে না। তা মহামূল্যবান। তবে আমাদের অর্থকরী সমাজ ব্যবস্থায় দরিদ্রের অনেক কিছুই ধনী অর্থমূল্যে খরিদ করে নিতে পারে। শ্রীলংকা, বাংলাদেশ এবং নেপালের মত তৃতীয় বিশ্বের অনগ্রসর দেশগুলি বিদেশে মোটা মূল্যের বিনিময়ে চোখ রপ্তানি করলেও সেক্ষেত্রে প্যাকেজিং-এর ও প্রিজারভেশনের চার্জটুকুই তারা নিচ্ছে বলে নথিভুক্ত হয়। প্রায় সফল চক্ষু-রোগ বিশেষজ্ঞর মতেই যে কোন মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে কর্ণিয়া সংগ্রহের তুলনায় একজন জীবিত ব্যক্তির কর্ণিয়ার সফলতার হার দ্বিগুণ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মৃত্যুর দু'ঘন্টার মধ্যে কর্ণিয়া সংগ্রহ না করলে তা কোন কাজেই লাগে না।

রক্তের কেনাবেচাটাই বোধহয় ভারতের সব রাজ্যে সর্বসমক্ষে হয়। কলকাতায় তো মেডিকেল কলেজ, পিজি হাসপাতাল, ক্যালকাটা হসপিটাল, আর জি কর, এন আর এস হাসপাতালের সামনে সব সময় দালালদেরকে খুব সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের সদর শহরের সরকারি হাসপাতা-তালগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। এর উপর কাছে পিঠে কোথাও বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটলে তো আর কথাই নেই। দালালরা নিজে থেকে এসেই যোগাযোগ করবে। কিছু নার্সিংহোমে রক্তবিক্রেতার নামের লিস্ট পাওয়া যায়। সেই তালিকা ধরে তাদের ব্লাডগ্রুপ অনুযায়ী আনা হয়। কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের পেশাদার রক্ত বিক্রেতাদের সচিত্র প্রতিবেদন প্রথিতযশা বাংলা দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় একাধিকবার প্রকাশ করা হয়েছে। রক্ত কেনা-বেচার ক্ষেত্রে ভারতে বছরে পেশাদার রক্ত বিক্রেতাদের কাছ থেকে ৫ মিলিয়ন লিটারের ওপর রক্ত কেনা হয়। দেশের ব্লাড ব্যাংকগুলিতে রক্তের লেনদেন ১০০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। সম্ভবত এটাই বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বড় লেনদেন। ৭৯ তালতলা বাজার লেনের বাসিন্দা এম এ রহমান সাহেব তাঁর এক আত্মীয়র জন্য রক্ত কেনার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বললেন–দেখুন কাগজে কলমে হয়তো রক্তের দাম বোতল পিছু (অর্থাৎ ২৫০ মিলি লিটার) ৮০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত বাঁধা থাকে। কিন্তু দুর্লভ গ্রুপ যেমন বি নেগেটিভ গ্রুপের রক্ত এর থেকে ৫ গুণ দামে কিনতে হয়। কারণ দালালদের খাতায় এখন পর্যন্ত ওই গ্রুপের পেশাদার রক্তদাতার নাম বরানগর ও যাদবপুরে মাত্র একজন করে পাওয়া গেছে। 'ও' গ্রুপের রক্তের দামও প্রয়োজন মোতাবেক বেড়ে যায়। 'আলোকপাত'–এর অনুসন্ধানী টিম তার এক সপ্তাহ ব্যাপী অনুসন্ধানে শহর কলকাতার দুজন এবং হাওড়ার একজন পেশাদার রক্ত-দাতার নাম পেয়েছে। ১৩ নং গোবিন্দ ঘটক রোডের বাসিন্দা সুকুমার হালদার এবং ২০ নং মেহন্দী বাগান লেনের বাসিন্দা বখতিয়ার আলি 'আলোকপাতকে' জানালেন–'পেট চালাতে রক্ত বিক্রি করতে হয় বাবু। পেটের দায় যে বড় দায়। চাকরি বাকরি নেই, তাই রক্ত বেচেই এখন সংসার চালাই।' প্রায় একই রকমের বক্তব্য সালকিয়ার জীবন মালিকের। কারখানা লক

আউট হওয়ার পর সংসার চালাতে রক্ত বিক্রি ছাড়া আর কোন সুস্থ পথ তার সামনে খোলা ছিল না। রক্ত বিক্রির দুনিয়ায় অধিকাংশ চালচিত্র এই বয়ানেরই।

শারীরিক অঙ্গের আরও অনেক কিছুই এদেশে বিক্রি হয় এখন। যেমন, প্ল্যাসেন্টার টিস্যু নিয়মিত সংগ্রহ করা হয় গাইনোকলজিক্যাল ওয়ার্ড থেকে। আর এই সমস্ত টিস্যু রক্তজাত দ্রব্য তৈরির জন্য বিক্রি হয় ফার্মাসিউটিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিগুলিতে। ব্যবসায়িক থাবা এখানেও জব্বর আড়ত খুলেছে টিস্যু কেনার। মৃত মানুষের কংকাল বিক্রি বোধকরি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেনাবেচার জগতে সর্বাধিক রোম-

চামড়া বিকিকিনি ও স্কিন গ্রাফটিং

জামা কাপড়ের কোন জায়গা খুব বেশি ছিঁড়ে গেলে যেমন রিপু করার কোন উপায় থাকে না, অন্য কাপড়ের তালি মারতে হয়, টুটাফাটা চামড়া মেরামতির ক্ষেত্রে স্কিন গ্রাফটিংও অনেকটা সেইরকম। সাধারণভাবে থাই থেকে এই চামড়া নেওয়া হয় কেননা এখান থেকে চামড়া নেওয়া যেমন সহজ তেমনি শরীরের এই অংশটি ঢাকা থাকার জন্য লোক–চক্ষুর দৃষ্টিতে পড়ে না। সাংঘাতিক পোড়া ঘা, কিংবা পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়ে শরীরের কোন অংশের চামড়া খুলে গিয়ে ঝুলে পড়লে স্কিন গ্রাফটিং এর সাহায্যে চামড়া জুড়ে দেওয়ার দরকার হয়। স্কিন গ্রাফটিং–এর খুঁটিনাটি দিক সংক্রান্ত কথা হল পি জি হাসপাতালে প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ মিসেস এস রায় চৌধুরীর সঙ্গে। জানালেন নন স্ট্যাণ্ডিং আলসার, ক্রনিক আলসারের ক্ষেত্রেও স্কিন গ্রাফটিং–এর প্রয়োজন হয়। স্কিন গ্রাফটিং দুভাবে করা হয় ১) নিজের শরীর থেকে নেওয়া চামড়ার সাহায্যে স্কিন গ্রাফটিং। ডাক্তারি পরিভাষায় যাকে বলে অটোগ্রাফ। ২) যখন এই চামড়া অন্যের শরীর থেকে নেওয়া হয়, তখন এটি হোমোগ্রাফ নামে পরিচিত। হোমোগ্রাফের জন্য যে স্কিন তাই নিয়েই চলে কেনাবেচার বাজার। থাই থেকে চামড়া নেওয়া হলেও রোগীর নিম্নাংশ মারাত্মক পুড়ে গেলে পিঠ, পেট, নিতম্ব ও বাহু থেকে ত্বক সংগ্রহ করাহয়। বার্ন পেশেন্টদের ক্ষেত্রে প্রথমেই দেখতে হবে রোগীর শরীরের ক্ষত কতটা গভীর। সুপারফিসিয়াল বার্নের ক্ষেত্রে এ্যান্টিবায়োটিক ওষুধই যথেষ্ট কিন্তু সেকেণ্ড ডিগ্রি বার্নের সময় এপিডারমিস ও ডারমিসের সামান্য অংশ পুড়লে সুপারফিসিয়াল বার্নের চেয়ে তা সারতে বেশি সময় লাগে। কোন কোন সময় এ ধরনের ঘা না শুকোলে স্কিন জোড়া দেওয়ার দরকার। থার্ড ডিগ্রি বার্নের সময় প্রোটিন , ইলেকট্রোলাইট, ওয়াটার লসের ফলে কিডনি, লিভার, হার্ট এর ক্ষেত্রেও নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। আর তখনই হোমোগ্রাফ স্কিনের প্রয়োজন হয় কারণ রোগীর শারীরিক অবস্থা তখন এতটা সঙ্গীন হয়ে পড়ে যে তার দেহ থেকে চামড়া নেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এক্ষেত্রে অন্যের শরীর থেকে অর্থের বিনিময়ে চামড়া নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় জুড়ে দেওয়া হয়। তিন সপ্তাহ পর্যন্ত ওই চামড়ার আয়ু। এরপর রোগীর শরীর থেকে অটোগ্রাফ স্কিন নিয়ে পুনরায় প্লেটিং করা হয়। সেম রিলেশান ও সেম ব্লাডের ব্যক্তির শরীর থেকে চামড়া নিয়ে পেশেন্টকে হোমোগ্রাফ করার পর অনেক সময় অটোগ্রাফের আর কোন প্রয়োজন হয় না। যে কোন ব্যক্তির জন্য যে কেউ চামড়া দিতে পারে এক্ষেত্রে রক্তের গ্রুপ এক হওয়ার কোন দরকার নেই। সম্প্রতি আমাদের দেশেও স্কিন ব্যাংকের কথা ভাবা হচ্ছে। এক্ষেত্রে মৃতের দেহ থেকে চামড়া নিয়ে ডিপ ফ্রিজে স্টোর করে রাখা হয়। বায়োলজিক্যাল ড্রেসিং–এর সময় এই স্কিন বিশেষ ভাবে দরকার হয়। আমাদের দেশের প্রচলিত আইন এ ব্যাপারে একটি বিরাট প্রতিবন্ধক। তাছাড়া, সংস্কারের সেন্টিমেন্ট তো আছেই। মৃতকে একবার ছুঁলেই যেখানে স্নান ইত্যাদি নানা উপাচারের মধ্যে দিয়ে দেহকে শুদ্ধ করতে হয় সেখানে মৃতের শরীরের চামড়া জীবিতের শরীরে প্রতিস্থাপন কত দুঃসাধ্য কাজ তা ভারতীয় হিন্দুদের সংস্পর্শে যারা আসেন নি তারা ভাবতেও পারবেন না। একমাত্র গ্রেট ব্রটেনেই মৃতের শরীর থেকে ত্বক নেওয়া আইনসিদ্ধ কাজ। যে কোন জীবিত মানুষের শরীর থেকে চামড়া নিয়েও গ্রাফটিং চলে–এক্ষেত্রে ওই চামড়া ডিপ ফ্রিজে ১০ দিন থেকে ২ সপ্তাহ পর্যন্ত রাখতে হয়। এই পদ্ধতিকে বিশেষ ভাবে কাজে লাগাচ্ছে দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা যাদের কাছে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মূলধনস্বরূপ। সেখানে স্কিন কিনতে লাগছে প্রতি স্কোয়ার ইঞ্চি ৩০০ টাকা। এর বেশি একফালি হলে লাগছে ১০০০ টাকা। তবে পোড়া ও আঘাতজনিত কারণে চামড়া ক্ষতির কাজ যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে 'স্কিন কালচার' এর চিন্তা ভাবনা আমাদের দেশেও শুরু হয়েছে। কলকাতার দু একটি হাসপাতালে তা হয়েছে ও হচ্ছে। স্কিন কালচারে এক ইঞ্চির স্কিনকে চার ইঞ্চিতে বাড়ান হয়। কিছুদিন আগে ক্যালকাটা হসপিটালে ডঃ এইচ আর পি সিন্হার নেতৃত্বে ১৮ ইঞ্চি স্কিনকে ৭২ ইঞ্চিতে বাড়িয়ে দেহের আশি শতাংশ পোড়া এক পেশেন্টের সার্জারি হল। নিঃসন্দেহে এটি জনপ্রিয় কাজ। বিদেশে পোর স্কিনগ্রাফ করে স্কিন গ্রাফটিং করা হয়। পোর স্কিনগ্রাফে জীবন্ত জন্তুর শরীর থেকে চামড়া নেওয়া হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শূকরের শরীর থেকে চামড়া নেওয়া হয়।

আলো চৌধুরী

একমাত্র গ্রেট ব্রটেনেই মৃতের শরীর থেকে ত্বক নেওয়া আইনসিদ্ধ কাজ। যে কোন জীবিত মানুষের শরীর থেকে চামড়া নিয়েও গ্রাফটিং চলে–এক্ষেত্রে ওই চামড়া ডিপ ফ্রিজে ১০ দিন থেকে ২ সপ্তাহ পর্যন্ত রাখতে হয়। এই পদ্ধতিকে বিশেষ ভাবে কাজে লাগাচ্ছে দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা যাদের কাছে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মূলধনস্বরূপ। সেখানে স্কিন কিনতে লাগছে প্রতি স্কোয়ার ইঞ্চি ৩০০ টাকা।

হর্ষক ব্যাপার। এখানে বিকিকিনির আওতা থেকে জীবিত তো বটেই মৃতকেও রেহাই দেওয়া হয় নি। অভিযোগে প্রকাশ কিছু প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ চোরাগোপ্তাভাবে সরকারি হাসপাতালের বেওয়ারিশ লাশ কেনে ও সেগুলি চোরা পথে ব্যবহৃত হয়। সরকারি হিসেবে প্রতি বছর প্রায় ১০ হাজার কংকাল এদেশ থেকে বাইরে পাঠানো হয়। স্কেলিটন রপ্তানির দিক থেকে ভারতের ভূমিকা বিশাল। এক একটি সম্পূর্ণ কংকালের চালু বাজার দর হল ১০ হাজার টাকা। করোটিসহ হাফ বার্স্ট কংকালের মূল্য ১৭০ থেকে ক্ষেত্র বিশেষ ১,০০০ টাকা। শুধু করোটি কলকাতায় কিনতে পাওয়া যায় ৬০ থেকে ১০০ টাকায়। এবারে আলাদা আলাদা ভাবে ল্যামন বোন প্রতিটি ২৫ টাকা করে এবং কোমরসহ জাইগোমেটিক বোন পাওয়া যায় ৪০ থেকে ৫০ টাকার মধ্যে।

এখানেই শেষ নয়, ডাক্তারি পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর জন্য মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সব কিছু অংশই কিনতে পাওয়া যায়। যেমন মৃতের লিভারের দাম ৭০ টাকা, হার্ট ১০০ টাকা। ভিসেরা এবং মস্তিষ্কও এই কেনা-বেচার আওতায়। মোট কথা মানবশরীরের সব কিছুই অর্থমূল্যে পাওয়া যেতে পারে। তবে ঠিকমত কিনতে হলে একটি যোগ্য দালালের সন্ধান করে নেওয়া একান্তই আবশ্যক। তবে মৃত্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেনাবেচার চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক জীবিত মানুষদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে ব্যবসা করা। আর এই ব্যবসা যদি এভাবে বিনা বাধায় চলতেই থাকে তবে একদিন অতি সহজেই মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ফার্ম গড়ে তোলার যে ব্যবসায়িক বিভীষিকা তা অচিরেই বাস্তবে রূপ পেয়ে যাবে। মানবিকতার দায়িত্বে এর বিরুদ্ধে এখুনি সরকারি হস্তক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে গণ প্রতিরোধ গড়ে তোলা দরকার। দরকার জাতীয় সরকারি স্বাস্থ্য নীতি ঘোষণার।

রমা প্রসাদ ঘোষাল

তথ্য ও সাক্ষাৎকার : আলো চৌধুরী
তথ্য : কাজী আব্দুল মোহিত
ছবি : কাজী আব্দুল মোহিত ও তপন সর্বাধিকারী

কিডনি কাহিনী

কিডনি দেখতে আমের মতন। ওজনেও একরকম। কিন্তু এর মধ্যে লক্ষ লক্ষ নলাকৃতি ফিল্টার থাকে। এদের নেফ্রন বলে। এই ফিল্টার রক্তের সংবহনে দূষিত উপাদানগুলি পরিশ্রুত করে। কিডনির এমন ক্ষমতা যে যদি কারো একটা কিডনি ব্যর্থ হয় কিংবা শরীর থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে অন্য একটি মাত্র কিডনিই শরীরের যাবতীয় কাজ পুরোপুরি করতে পারে। এই বিস্ময়কর ক্ষমতাকে লক্ষ্য করেই 'অঙ্গ প্রতিস্থাপনে'র ধারণা এসেছে। গোড়ার দিকে প্রতিস্থাপন ব্যর্থ হওয়ার কারণ হল শরীরের ইমিউন সিস্টেমে বাইরের কারও থেকে নেওয়া প্রতিস্থাপিত অঙ্গকে বাতিল করবার প্রবণতা। যখন পারিবারিক সম্পর্কযুক্ত কারো কাছ থেকে কিডনি নিয়ে রোগীর শরীরে বসানো হয় সেখানে সফলতা অধিক। এখনও এই আশির দশকের শেষ পর্যায়েও যখন বিদেশ থেকে কেনা শক্তিশালী সংক্রমণ দমনকারী ওষুধ ব্যবহৃত হচ্ছে তখনও সম্পর্কহীন দাতাদের কিডনি প্রতিস্থাপনের সফলতার হার অপেক্ষাকৃত কম।

কিডনি প্রতিস্থাপনে দাতা এবং রোগী দু-জনকেই অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসক দাতার বুকের খাঁচার কাছে নাভির সমান্তরালের কিছু অংশ চিরে ফেলেন। কেটে ফেলার পরে পেটের পেশি ভেদ করে লাল রঙের আম আকৃতির কিডনিটিকে বিশেষ চিমটির সাহায্যে ওপরে তুলে আনা হয়। রেনাল আর্টারি ও অন্যান্য ভেন থেকে বিচ্ছিন্ন করে কিডনি আনা হয়। রোগীর অসুস্থ কিডনি খুব কমই বের করে ফেলা হয়। দাতার কিডনিটি কুঁচকির কাছে স্থাপন করা হয়। এরপর রোগীর প্রধান ধমনী এবং শিরার সঙ্গে নতুন কিডনিকে সংযুক্ত করা হয়। আর্টারি টিউবটি রোগীর ব্লাডারের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়। অপারেশনের সেকেন্ডের মধ্যে নতুন কিডনি কাজ করতে থাকে। দু'জনের পুরোপুরি সুস্থ হতে সময় লাগে দু' থেকে তিন সপ্তাহ। যদিও রোগীকে বহু বছর আমদানিকৃত সংক্রমণদমনকারী ওষুধ খেয়ে যেতে হয়।

দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় মাঝে মধ্যেই বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে রুগীর আত্মীয় স্বজনেরা মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে কিডনি কিনতে চাইছেন। সে অঙ্ক কখনও পঁচিশ হাজারের, কখনও বা পঞ্চাশ হাজারের। রোগীর আত্মীয়রা প্রিয়জনের প্রাণ বাঁচাতে অর্থের মায়া না করলেও, দরিদ্র এক শ্রেণীর মানুষ চোখ ধাঁধানো টাকার অঙ্কের লোভে নিজেদের দুর্লভ অঙ্গের একটি অংশ বেচে দেন। মাদ্রাজের সীমান্ত এলাকার বস্তি মতন একটি অঞ্চলের বেকার যুবকেরা অনেকেই কিডনি বেচে সংসারে স্বাচ্ছন্দ আনার পক্ষপাতী। কিডনি ক্রেতাদের কাছে খবরটি প্রাণদায়ী ওষুধের মত মূল্যবান হলেও শুধুমাত্র দারিদ্র ঘোচাবার জন্য শরীরের অমূল্য অঙ্গটির বিকিকিনি করা মানবিক দিক থেকে বোধহয় কখনোই মেনে নেওয়া যায় না।

শুধু কিডনি কেন, এখন বিভিন্ন উন্নতশীল দেশে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়ের প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে। কিন্তু ভারতবর্ষে আজও কিডনি তো বটেই, কর্ণিয়া, স্কিন গ্রাফটিং এবং হাড়ের মজ্জার প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে নানা বাধ্যবাধকতা আরোপ করা আছে।

বিশেষ প্রতিনিধি

কিডনি প্রতিস্থাপনে দাতা এবং রোগী দু-জনকেই অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসক দাতার বুকের খাঁচার কাছে নাভির সমান্তরালের কিছু অংশ চিরে ফেলেন। কেটে ফেলার পরে পেটের পেশি ভেদ করে লাল রঙের আম আকৃতির কিডনিটিকে বিশেষ চিমটির সাহায্যে ওপরে তুলে আনা হয়।

১৭ পৃষ্ঠার পর

কলকাতার প্রাচীন ইতিহাস–কথায় অনেক দেবদেবীরই উল্লেখ আছে। তবে কালীর মত এত জাঁকজমক, এত হাঁকডাক যে আর কোন হিন্দু দেবদেবীর নেই সে কথা অনস্বীকার্য। তবে কালীঘাটের কালী কিংবা চিত্তেশ্বরীকে ঘিরে যে কিংবদন্তীর সমারোহ, কলকাতার সব কালীই সেই প্রাচীনতা বা মাহাত্ম্যের অধিকারী নয়। এই দুই কালীর অস্তিত্বের ইতিহাস আছে কলকাতা সৃষ্টিপর্বের বহু আগে থেকেই। অন্যান্য কালীমন্দির এদের তুলনায় বয়সে অনেক নবীন।

কালীঘাটের কালীই কলকাতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। উত্তর ভারতের মানুষের কাছে ইনি 'কালী কলকাত্তাওয়ালী' নামে পরিচিত। জোব চার্নক তখনও পা রাখেন নি কলকাতার মাটিতে, তখনও বিকিয়ে যায় নি সিরাজের বাংলা, মোঘল সুবাদারির দাপটে যখন কাঁপছে বাংলার মাটি সেই সময়ও ছিল কালীঘাট। একান্ন পীঠের অন্যতম এই কালীঘাট বর্তমানে আদি গঙ্গার তীরেই অবস্থিত।

ভক্তি–আপ্লুত হাজার হাজার পুণ্যার্থী, আগে পিছে পায়ে পায়ে হেঁটে আসে প্রতিদিন এই মহাতীর্থের মহিমার টানে। ঘটি, গামছা নিয়ে নেমে পড়ে পুণ্যসঞ্চয়ী মানুষ মজে আসা আদি গঙ্গার ঘোলা জলে। স্নান সেরে চলে আসে ডালার দোকানে। সেখান থেকেই নিতে হয় মায়ের পুজোর চিনিসার মিষ্টি আর টকটকে লাল জবা। তারপর রেলিং বারান্দা পেরিয়ে ভিড় ঠেলে ঢুকে পড়া খুপরির মধ্যে। মাতৃদর্শনের পর বেরিয়ে আসে ধীরে ধীরে। পেছনে তখন হাত পাতা কালীঘাটের বাঙালি।

সময়ের স্রোতে কলকাতার পরিবর্তনের সাথে সাথে কালীঘাটও যেন বদলে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত প্রফুল্ল ভট্টাচার্য। বয়স আশির উর্দ্ধে। বিগত ষাট বছর তিনি এই মন্দিরে পৌরহিত্য করেন। কালীঘাটের সাম্প্রতিক অবস্থার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন–মন্দিরের অবস্থা এখন আর আগের মত নেই। সেই পবিত্রতা নেই, সেই আন্তরিকতাও নেই। এখন পালা বেচা কেনা হয়। মায়ের সেবাও বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। আগে মায়ের ভোগ, নৈবেদ্য যেত যত্ন সহকারে, আড়ম্বর করে, আর আজ গলা শসা, পচা কলা এই সব দিয়ে দায়সারা ভাবে তৈরি হচ্ছে মায়ের নৈবেদ্য।

স্থানীয় লোকদের অভিযোগ যে তীর্থের উপরে জুলুম হচ্ছে এখানে। আগে অনেক জায়গায় হত কিন্তু এখানে হত না। মন্দির কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নানারকম দুর্নীতির অভিযোগ করেন কর্মচারীরা। মন্দিরের বিগত ২৪ বছরের যাবতীয় খরচের কোন হিসেব নেই। কর্মচারীরা বেতন পায় না যথাযথ। মায়ের গায়ের অনেক গহনা নয় ছয় হয়ে গেছে নানাভাবে। দর্শনার্থীদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নেই এখানে। পাণ্ডা থেকে শুরু করে অনেক দুষ্কৃতকারীদের হাতে নানাভাবে বিপর্যস্ত হয় পুণ্যার্থী মানুষ। তবু যেন কালীক্ষেত্র কালীঘাট সব কিছুকে পাশ কাটিয়ে কলকাতার মাটিতে আজও স্ব–মহিমায় উজ্জ্বল। রুচিবদল, ধারাবদল, পালা বদলের কলকাতা কালীঘাটের মহিমাকে এতটুকু ম্লান করতে পারে নি।

বাগবাজারে গঙ্গার ধারে চিৎপুরের বিখ্যাত চিত্রেশ্বরী মন্দির। ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে মনোহর ঘোষ ওরফে মহাদেব ঘোষ এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। চিত্রেশ্বরীদেবী চিতে ডাকাতের প্রতিষ্ঠিত কালী–মন্দির বলে প্রচলিত হয়ে এসেছে বরাবর।

কলকাতার গোড়াপত্তনের সেই আদি পর্ব থেকে আজকের আধুনিক কলকাতার গৌড়পর্ব পর্যন্ত বহু কিংবদন্তীর শাখা–প্রশাখায় আরত হয়ে হেঁটে এসেছেন চিতে ডাকাতের আরাধ্য চিত্রেশ্বরী। এখন তার চারপাশ ঘিরে নেই আদিপর্বের সেই জন–মানবহীন দুর্গম অরণ্য। মানুষের কলরব এখন তার চারদিকেই। মন্দিরের পিছনে এসে ঠেকেছে বস্তিবাড়ির চালা। গোলা বারুদের কারখানা 'গান এণ্ড সেল ফ্যাক্টরি 'র চৌহদ্দি ঘিরে গড়ে ওঠা ভিন্ন মেজাজের মানুষজনের মধ্যে কোন রকমে অস্তিত্ব রাখা চিত্রেশ্বরী মন্দিরকে দেখলে মনে হবে কলকাতার আদিপর্ব থেকেই তার সহযাত্রী এই চিত্রেশ্বরীকে কলকাতা যেন বড় উপেক্ষা করছে আজ।

পুরনো কলকাতার অনেক কালীমন্দিরই এখনও বিদ্যমান আছে স্ব–মহিমায়। তাদের মধ্যে নিমতলায় আনন্দময়ীর মন্দির, ঠনঠনিয়ায় সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, বৌবাজারের ফিরিঙ্গী কালী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে প্রতিষ্ঠিত হয় বাগবাজার সিদ্ধেশ্বরী কালী। পুরনো মূর্তিটি ছিল পাথরের তৈরি। বর্তমান মূর্তিটি মাটির তৈরি ও উচ্চতায় ৭ ফুট। মন্দিরটি দালান রীতিতে গঠিত ও অনেক পরে নির্মিত হয়েছিল। কলকাতার ফিরিঙ্গী কালীর ঠিকানা ২৪৪ বৌবাজার স্ট্রিট। এক ডাকেই চেনেন তাঁকে কলকাতার ভক্তজন। এই অঞ্চলের ফিরিঙ্গী বাসিন্দাদের মধ্যে তিনি খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাই এই কালীর নাম হয় ফিরিঙ্গী কালী। প্রায় ২৭৪ বছর আগে জলা–জঙ্গল অধ্যুষিত অঞ্চলে তৈরি হয়েছিল ঠনঠনের সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির। কালী মন্দিরের পাশেই আটচালা শিব মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শংকর ঘোষ মহাশয়। তারপর থেকে মূলগড়ন পাল্টানোর মত তেমন বড়সড় কোন সংস্কার হয় নি। তবু প্রাচীন চেহারার পোশাক পাল্টে মন্দির এখন সম্পূর্ণ আধুনিক। নিমতলার আনন্দময়ীকে শ্মশান কালী বলা হয়, কেননা এক সময় এটা শ্মশানের মধ্যেই অবস্থিত ছিল। কালো পাথরের তৈরি মা আনন্দময়ীর মূর্তি, উচ্চতায় দু'ফুট। রাস্তা উঁচু হওয়ায় মূর্তিটি এখন অনেক নীচে নেমে গেছে। বহু চেষ্টা করেও মূর্তিটিকে উপরে তোলা সম্ভব হয় নি। তারাসুন্দরী পার্ক আর গণেশটকির মাঝামাঝি স্থানে অনন্য মহিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কলকাতার পুঁটে কালী মন্দির। দেবী দক্ষিণা কালী। দেবীর মূর্তির কাছে সাদা পাথরের তৈরি একটি শীতলার মূর্তিও আছে। দেবীর বেদীও পাথরের তৈরি, অষ্টদল পদ্মদ্বারা অলংকৃত।

রাণী রাসমণির স্বপ্নে প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণী মন্দিরের পুরনো মানচিত্র অনেকটাই বদলে গেছে আজ। সেই ঝাউতলা, আস্তাবল কিংবা গোশালার অস্তিত্ব এখন আর নেই। মন্দির চত্বরে ঢুকলেই দেখা যাবে মাছি ভনভনে মিষ্টির দোকান আর খুচরো হোটেলের লোকজনের খদ্দের পাবার আকুতি মিনতি। প্রসাদের ডালি ও ফুল বেলপাতা বিক্রির দোকান পাশাপাশি গজিয়ে উঠেছে ব্যাঙের ছাতার মত। বেঁচে থাকার প্রশ্নে একই ধরনের দোকানগুলিতে রেশারেশি চলে প্রচণ্ড মাত্রায়। ফলশ্রুতি স্বরূপ নানা ধরনের ঝামেলা পোহাতে হয় পূণ্যার্থীদের। রামকৃষ্ণের বড় সাধের ফুলের বাগান, সেই মল্লিকা, গুলচী আর মাধবী ফুল আজ নেই। সেখানে সি এম ডি এ কর্তৃক সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে আধুনিক ঢঙের তৈরি বাগানে শোভা পাচ্ছে সিজিন ফ্লাওয়ার, ড্যান্থাস, পপি, ক্যালেণ্ডুলা।

ম্যালেরিয়া, জলা–জঙ্গল–জোঁকওয়ালা দক্ষিণেশ্বর আজ নিয়ন আর হ্যালোজেনের বর্ণমালায় সুসজ্জিত। তবু আজও দেখেছি দক্ষিণেশ্বরকে –ভোরের আলো তখনও মাটি ছোঁয় নি। অন্ধকার লুকিয়ে ছিল ঝোপে ঝাড়ে, পাতার ফাঁকে, গাছের ডালে। স্নিগ্ধ পবিত্রতার খোঁজে দক্ষিণেশ্বরে এসেই মনে হয়েছিল, কলকাতার বুকে মফঃস্বল দক্ষিণেশ্বর স্মৃতিতে ভাবনায় অনেকটাই মফঃস্বল তবে কিছুটা কলকাতা। আর সেই কিছুটাই যেন আজও অধরা রহস্যময়ী।

হিন্দুদের মত কলকাতায় মুসলমানদেরও মসজিদের ছড়াছড়ি। প্রায় প্রতি রাস্তায় ও মুসলমান পাড়ার অলিতে গলিতে দেখতে পাওয়া যায় মসজিদ। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সিদ্দিকি সমীক্ষা করে দেখেন যে কলকাতায় প্রায় ৭০০ মসজিদ আছে। মসজিদ ছাড়া কলকাতায় ১৩টি পীরের দরগা ও ছয়টি খানকা আছে। পীরের দরগাগুলির মধ্যে চিৎপুর-বাগবাজার খালপুলের উত্তরে অবস্থিত ঘোর সাহেবের আস্তানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে হিন্দু –মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই পুজো দেয়।

কলকাতার সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদটি গান ফাউণ্ডারি রোডের পূর্বপ্রান্তে, রাস্তার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। নাখোদা মসজিদের উত্তরে সিঁদুরিয়াপটির হাফিজ জালাউদ্দিনের মসজিদও খুব প্রাচীন।

নাখোদা মসজিদকেই এখন কলকাতার বড় মসজিদ বলা হয়। ১৯২৬ সালের দাঙ্গার সময় স্থাপিত হয় এই নাখোদা মসজিদ। চিৎপুরের

শিবমন্দির বির্তক

জানবাজার শিব মন্দির সম্প্রতি একটি নোংরা রাজনীতির স্বীকার। এই মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিশ্রি দলাদলির সৃষ্টি হয়। বর্তমান মন্দিরটি যে স্থানে গড়ে উঠেছে, আগে সেখানে কর্পোরেশনের একটি খাটা পায়খানা ছিল। পরে তারই পাশে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপিত হয়। স্থানীয় লোকেরা পরবর্তী কালে তার সংস্কার করে সেখানে একটি মন্দির তৈরি করেন। কিন্তু পূর্ববর্তী মেয়র কমল বসু রাস্তার উপর মন্দির তৈরির অনুমতি না দেওয়ায় প্রশাসনের সাহায্যে ৬ ডিসেম্বর বুলডোজার দিয়ে মন্দিরটি ভেঙে ফেলা হয়। ফলে একটি প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। কংগ্রেসী নেতারা মন্দির তৈরির সমর্থনে স্থানীয় মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। ভেঙে ফেলার পর ওইখানেই আবার নতুন করে তৈরি হয়েছে মন্দিরটি। ওই শিবমন্দির সুরক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিমাই ঘোষ বলেন যে এই সরকার কারও সাথে কোন কথাবার্তা না বলেই মন্দিরটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও মর্যাদার উপর আঘাত হানছে এই সরকার। তবে মানুষের বিশ্বাসকে ভেঙে ফেলার মত ক্ষমতা এই সরকারের নেই।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে চুরি

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি দেবত্র সম্পত্তির অন্তর্গত। নির্বাচিত কিছু সদস্যের ট্রাস্টি দেখাশোনা করে এই কালীমন্দির। গত ১৫ আগস্ট রাত্রে মন্দিরের সব কয়টি তালা ভেঙে, মায়ের গা থেকে প্রায় ১২০ ভরি গহনা চুরি হয়ে যায়। এর থেকে বড় দুঃখজনক ঘটনা আর কি হতে পারে? পুলিশ মন্দিরের বেশ কিছু কর্মচারীকে গ্রেফতার করে। ভোরবেলা এই ঘটনার খবর পাওয়ার পরও ট্রাস্টির লোকেরা ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছান বেলা ২ টোর পর। কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন না করার জন্যই এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটা সম্ভব। বাগান পাহারার জন্য ৪জন লোক নিযুক্ত করা। অথচ মন্দির প্রাঙ্গণে মাত্র দু'জন নিরস্ত্র দারোয়ান-লাল বাহাদুর এবং যুদ্ধ বাহাদুর পালা করে পাহারা দেয়। চুরির পর পুলিশ এদের দু'জনকেই গ্রেফতার করেছে। মন্দিরের সেক্রেটারি কুশল চৌধুরী আগে প্রায়ই আসতেন মন্দিরে। কিন্তু উক্ত ঘটনার পর থেকে দিন ১৫র মধ্যে মাত্র একদিন এসেছেন ঘটনাস্থলে। আজ থেকে ৫৭ বছর আগেও একবার চুরি হয়েছিল এই মন্দিরে। তবে ১৪ দিনের মাথায় সমস্ত সম্পত্তি উদ্ধার হয়েছিল। সেই সময়কার ট্রাস্টি প্রশাসনকে মন্দিরের কর্মচারীদের উপর কোনরকম জোর জুলুম করতে বারণ করে। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে মন্দিরের কর্মচারীরা কেউ ওইভাবে চুরি করতে পারে না। কিন্তু আজকের ট্রাস্টি এই বিষয়ে চুপচাপ।
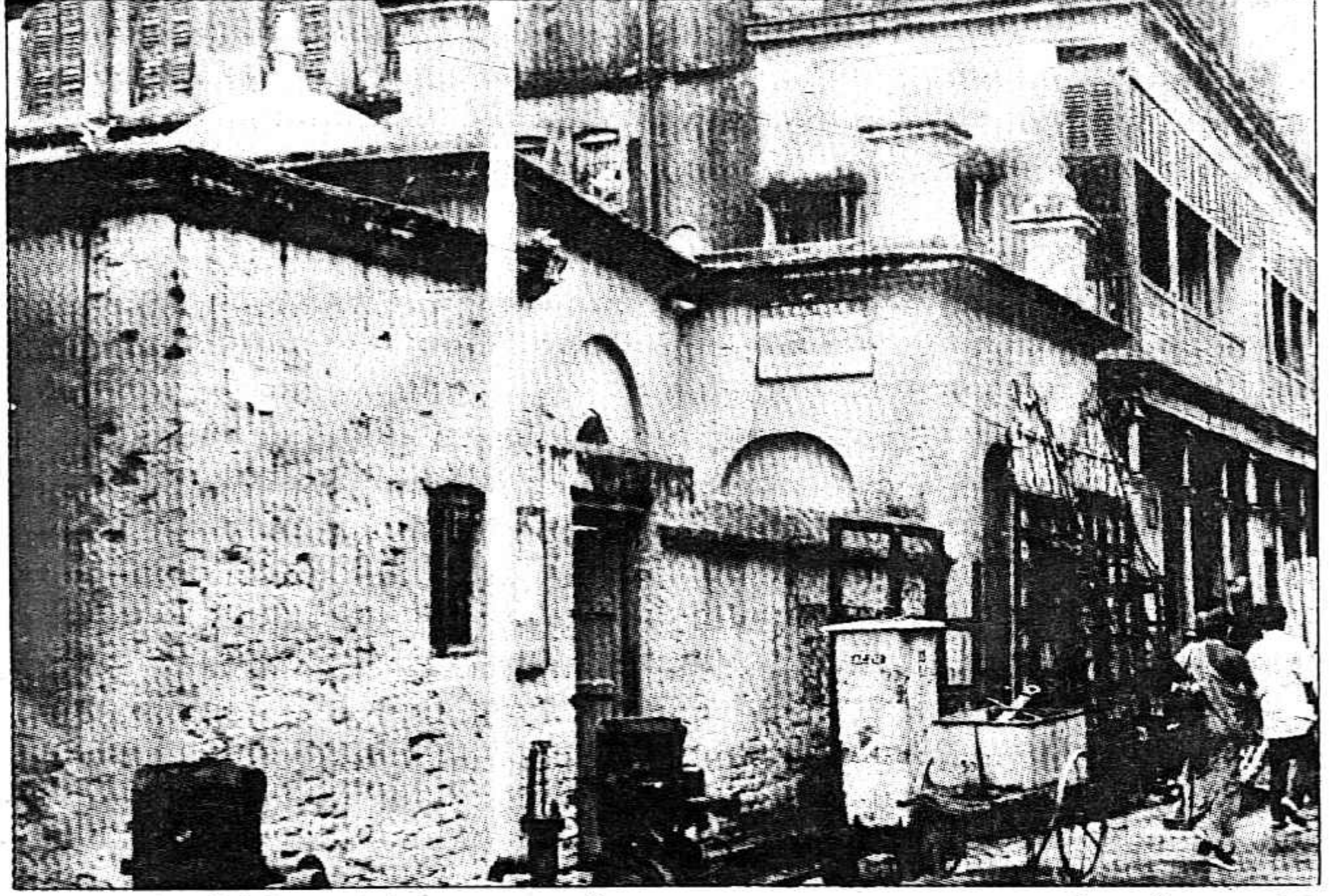
তালতলা অগ্রগামী অধিকৃত ডক্টরস লেনের মসজিদ

ছবি : কাজী আব্দুল মোহিত

নানান জায়গা থেকেই নজরে পড়ে এই উঁচু মসজিদ-টির গম্বুজ। আগেকার ছোট মসজিদটি ভেঙে ১৯২৬ সালে সেইখানেই এখনকার বড় মসজিদটি তৈরি করা হয়। বর্তমানে প্রায় ৪/৫ হাজার লোক এখানে প্রত্যহ নামাজ পড়ে। রমজান বা ঈদে এই সংখ্যা ৬০–৭০ হাজারও ছাপিয়ে যায়।

টিপু সুলতানের পুত্র, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ কলকাতার বিখ্যাত টিপু সুলতান মসজিদ বা ধর্মতলা মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা। সেই সময় এই মসজিদের পাশে একটি বেশ বড় ধরনের পুকুর ছিল। সেই পুকুরটির নাম 'এসপ্লানেড ট্যাংক'। পুকুরের জলে মসজিদের ছায়া ভাসত। সময়ের স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যায় সব কিছু। মসজিদের চারপাশের চেহারা বদলে গেছে অনেক। তার ভরাট বুকের উপর দিয়ে ছুটে গেছে চওড়া রাজপথ। কলকাতার ভিড় বাড়ছে প্রতিদিন। দোকানপাটেরও সংখ্যা বাড়ছে। মসজিদের বাইরের চত্বরে সারি দিয়ে গড়ে উঠেছে দোকান, ঘিঞ্জি বসতি।

পার্ক সার্কাস, বেকবাগান, ওয়েলেসলি, তপ্‌-শিয়া, রাজাবাজার, কলাবাগান, নারকেলডাঙা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর মসজিদ দেখতে পাওয়া যায়। শিয়ালদার কুতুবুদ্দিন সরকারের মসজিদ, চিৎপুরে ডোঁসরি শাহের মসজিদ ও দরগা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের মানিক পীরের দরগা, ক্লাইভ স্ট্রিটের জুম্মা পীরের দরগা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এসব ছাড়াও কলকাতা এবং শহরতলীতে কমপক্ষে একশটি মসজিদ অমুসলমানদের দ্বারা বেদখল হয়ে পড়ে আছে দীর্ঘদিন। 'ওয়েস্টবেঙ্গল সোসাইটি ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অব মস্ক' নামক একটি সংস্থা এই সমস্ত অধিকৃত মসজিদগুলি উদ্ধার করে সেখানে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করছেন। এই সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি এবং বর্তমান সহ-সভাপতি মহম্মদ সফী লায়েক এই প্রসঙ্গে জানান যে, দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুরাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জবরদখল করে রেখেছে এই সব মসজিদ। কেউ ব্যবসা করছে, কোথাও চলছে চোলাই মদের কারবার। স্থানীয় ছেলেরা কোথাও আবার ক্লাব তৈরি করেছে, সেখানে বহালতবিয়তে চলছে হৈ-হল্লোড়, নাটকের মহড়া। কেউ কেউ বাসগৃহ বানিয়েছে এইসব মসজিদকে। প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে এই সংস্থা সুষ্ঠ ও ন্যায়সঙ্গত উপায়েই মসজিদগুলি উদ্ধার কার্য করে চলেছে। এ যাবৎকাল তারা ৭টি মসজিদ উদ্ধার করে সেখানে নামাজ পাঠের ব্যবস্থা করেছে। স্বাধীনতার পর ১৯৭৮ সালের ২ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম ডাক্তার লেনের মসজিদটি উদ্ধার হয়। তবে এই মসজিদের একাংশ এখনও 'তালতলা অগ্রণী ক্লাবের' অধিকৃত হয়ে রয়েছে। এইরকম বেলেঘাটা মেন রোডে আলো-ছায়া সিনেমা হলের দক্ষিণের মসজিদ, নিমতলা শ্মশান ঘাটের উত্তরে বেনিয়াটোলা স্ট্রিটের মসজিদ, রাজাবাজার সাইন্স কলেজের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে বিদ্যাসাগর স্ট্রিটের মসজিদ, টালিগঞ্জে বাবুরাম ঘোষ রোডের মসজিদগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

পুরনো কলকাতা নতুন হয়ে যাচ্ছে বড় তাড়াতাড়ি। বাইরের কাঠামো বজায় রেখে ভেতরে চলছে আধুনিক হওয়ার তুমুল তোড়জোড়। যন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সভ্যতা ছুটছে দ্রুত তালে। এসব সত্ত্বেও ধর্মপ্রাণ কলকাতার মানুষের দৈনিক জীবন যাত্রার সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে মন্দির মসজিদের ঐতিহ্য।

সব্যসাচী বসু

রেখার স্বামী মুকেশের আত্মহত্যা

অন্তরালের ঘটনাক্রম
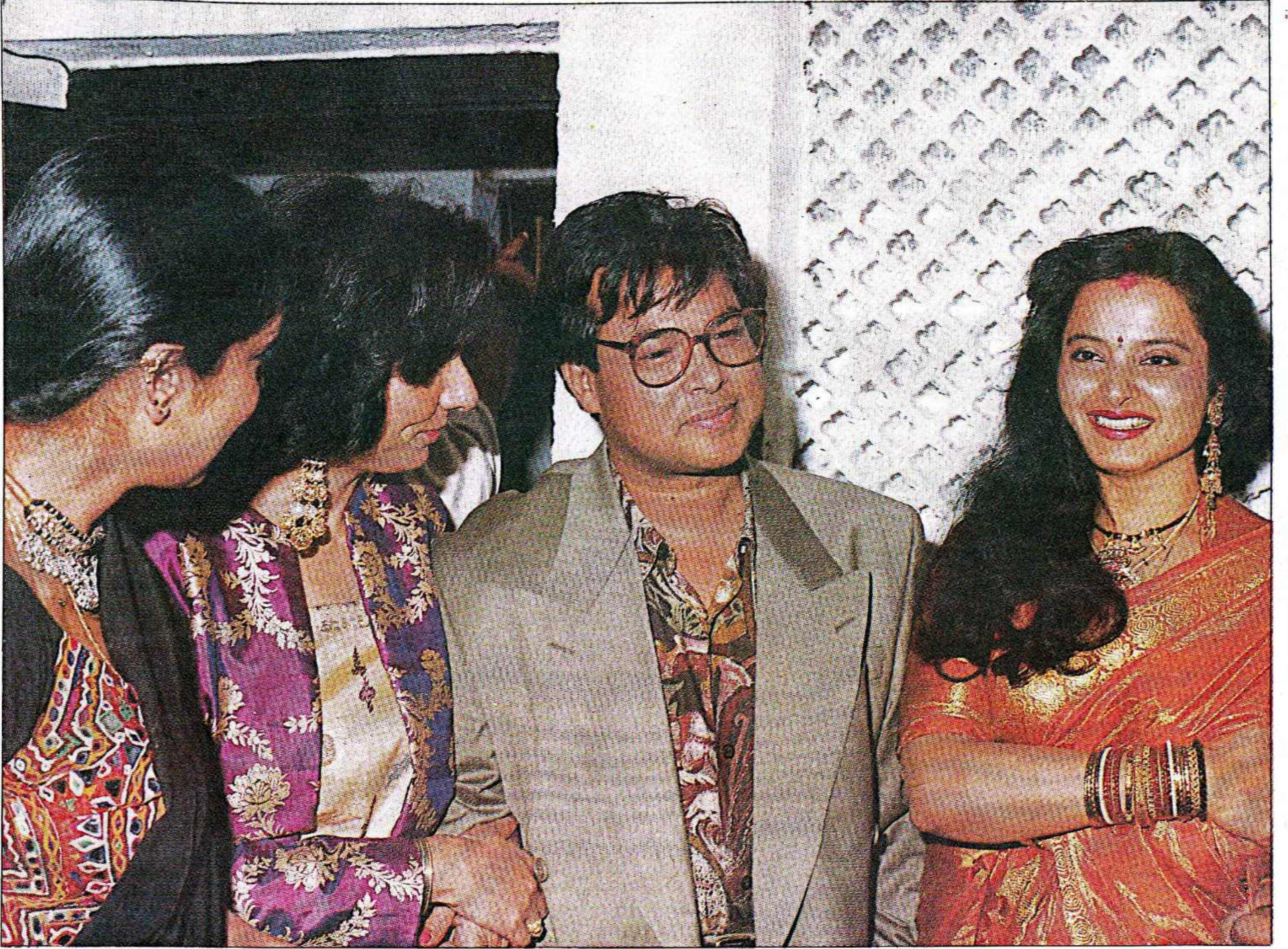
বিয়ের পরে, রেখা ও মুকেশ

বহু আপাত–রহস্যের নায়িকা, চিত্রতারকা রেখা যখন আচমকাই দিল্লির এক নব্যব্যবসায়ী মুকেশ আগরওয়ালকে বিয়ে করে বসলেন–তখন তাছিল এক আশ্চর্যজনক ঘটনা। কিন্তু আরও আশ্চর্য বোধহয় অপেক্ষা করে ছিল , যার পরিণতি মুকেশের আত্মহত্যায় !

এবার আর অভিনয় নয়, সম্পূর্ণ বাস্তব জীবনবৃত্তে ধরা দিলেন রূপালী পর্দার নায়িকা। সেক্স, ভায়োলেন্স আর রহস্য–রোমাঞ্চের বুনোটে হিন্দি চলচ্চিত্র জগৎ যে রেখার কাল্পনিক কেরামতি এতদিন হাজারো দর্শকের সামনে তুলে ধরেছে আজ সেই নায়িকার বাস্তব-জীবন তারও চেয়ে এক ভয়ঙ্কর সত্যকে আমাদের সামনে পেশ করলো। এই কাহিনীর শুরু প্রায় দু'বছর আগের একদিন, সেদিন রেখার প্রথম দেখা হয় মুকেশ আগরওয়ালের সঙ্গে। উপলক্ষ্য ছিল হাই ফ্যাশান বুটিকের কর্ত্রী বীণা রমানির পার্টি। কিন্তু সেই উপলক্ষ্য যে এত দ্রুত অমোঘ নিয়তির লক্ষ্যে বদলে যাবে সে কথা কেই বা ভাবতে পেরেছিল ! যেমন করে মুকেশ আগর-

ওয়ালও ভাবতে পারেননি তাঁর ব্যবসার প্রথম দিনে, তিনি একদিন বড় শিল্পপতি হবেন। কিংবা রেখা তার স্কুল জীবনে, বছরের পর বছর যার একই কক্ষে কেটে গেছে বইপত্রের পাতা ওল্টানোর অবকাশ না রেখে। সেই যেন কেমন করে হঠাৎই একদিন চিত্র জগতের প্রথম সারির অবিসংবাদিত তারকা হয়ে উঠলো এই কাহিনী অল্পবিস্তর সকলেরই জানা কিন্তু যে ইতিহাস আজও প্রায় অজ্ঞাত সেখানেই এই কাহিনীর মূলসুরটি ধরা আছে। সুতরাং সেই মুকেশ আগরওয়ালের প্রসঙ্গেই আবার ফিরে আসা যাক।

একজন সাধারণ মানুষের মতই মুকেশের কেরিয়ার জীবন শুরু হয়েছিল। দিল্লির বাঙালি মার্কেটে একখানা ভাড়ার ঘর আর চাঁদনী চকে একটা ছোট্ট দোকান–সেখানেই তাঁর ছোটখাটো বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ব্যবসা। এরই মাঝখানে অনু শর্মা নামে এক মহিলা সাংবাদিকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব যার সূত্রে কিট্টু মালকানি মুকেশের সমৃদ্ধি আর ঐশ্বর্যের দরজা খুলে দিতে এগিয়ে এসেছিল অন্য এক বন্ধুত্বের বিনিময়ে। এই বন্ধুত্ব কি ছিল উচ্চবিত্ত মহিলাদের মনোরঞ্জনের, যাকে আখ্যায় 'প্লেবয়শিপ'ও বলা যায়! সন্দেহটা নানান কারণেই অমূলক নয়। আর সম্ভবত এইসব কারণেই তাঁর মা শান্তিদেবী ভীষণ রকম অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু এই সিঁড়ি বেয়ে 'হটলাইন' গ্যাসস্টোভ ও পরে টেলিভিশনে নির্মাণের প্রগতি মুকেশের জীবনে নিয়ে এলো শিল্পপতির সম্মানজনক আখ্যা। মুকেশের এখানেই বোধহয় সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ ছিল। কিন্তু কাহিনী তখন অন্য ধারায় বাঁক নিয়েছে, কিট্টু তখন মুকেশকে ছেড়ে

শোকাহত পরিচিতবর্গ: একদম ডাইনে বীণা রামানী, মাঝে দীপ্তি নাভাল

রেখা: গৃহিনীর বাস্তব ভূমিকায় মানানসই নন!

৯০ পৃষ্ঠায় দেখুন

সারধানার বেগম

ইতিহাসের উজান বেয়ে আমরা পৌঁছে যাই এমন একটা সময়ে, যখন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়নি। সে সময়ের এক বেগমের কাহিনী, যিনি ছিলেন এক জার্মান সেনাধ্যক্ষের স্ত্রী এবং ইতিহাসের এক বৈচিত্র্যময় অধ্যায়ের নায়িকা।

যে বাসটায় আমরা সারধানা গিয়েছিলাম সেটা বলতে গেলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের। চারদিক জোড়াতালি মারা। নাট বোল্টের বিকট শব্দ আর নড়বড়ে চ্যাসিস দেখে আমার কিপলিং–এর 'দ্য শিপ দ্যাট ফাউণ্ড হারসেল্ফ' গল্পটা মনে পড়ে গিয়েছিলো। বাসের প্রত্যেকটা অংশই যেন জীবন্ত এবং প্রতিবাদ-মুখর। কণ্ডাকটর এক যাত্রীর সীটের তলা থেকে ক্র্যাঙ্ক হ্যাণ্ডেল বার করে ইঞ্জিনে লাগিয়েছিলো। রোদ্দুরে নাকাল হয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে এক সময় ইঞ্জিন প্রাণ পেয়ে গর্জে উঠলো। বাস চলতে লাগলো আপন খেয়ালে আর তখনই সময় পেয়ে কণ্ডাকটর আমাদের ভাড়া নিয়েছিলো। যাত্রীরা বেশির ভাগই ছিলো গ্রামীণ মানুষ। তারা চলন্ত বাসের মধ্যে বিড়ি ফুঁকছিলো আর পান চিবিয়ে পিচ পিচ পিক ফেলছিলো জানলা দিয়ে। আমার হাতে ঘড়ি দেখে, দু'এক মিনিট ছাড়া ছাড়াই টাইম জানতে চাইছিলো তারা।

সারধানা বাসস্টপে নেমেই দেখলাম চারদিকে প্যাচপেচে কাদা। একটা চা-দোকান ছিলো। আর ডাঁই করা আবর্জনার ওপর অনেকগুলো কুকুর আর শূকরের খেঁকামেকি। চার্চে যাওয়ার জন্যে একটা রিক্সা নিয়েছিলাম আমরা।

সারধানা চার্চটি তৈরি হয়েছিলো বেগম সমরুর খরচে। তৈরি করেছিলেন এক ইটালিয়ান স্থপতি। স্বামীর মৃত্যুর পর বেগম সমরু ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা নেন এবং পোপের কাছ থেকে 'জোয়ানা নোবিলিস' খেতাব পান। দিল্লির বাদশা যুদ্ধক্ষেত্রে বেগম সমরুর অবদানের জন্যে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে একটি উপাধি দেন–'জেবউনিসা' বৃদ্ধা হবার আগে পর্যন্ত তিনি প্রেম-ভালোবাসা, অবৈধ প্রণয় এবং কিছু যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে ছিলেন। অবশ্যই তাঁর জীবন একঘেয়ে ছিলো না। তাঁর মধ্যে এমন কিছু গুণ ছিলো নিশ্চয়ই যাতে পুরুষেরা আকৃষ্ট হতেন। তিনি কম বয়সে সুন্দরী ছিলেন,

সারধানার চার্চ, আজো তেমনি সুন্দর

মধ্যবয়সে হয়ে উঠেছিলেন আরও সুন্দরী। তিনি ছিলেন উৎসাহী মহিলা। যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার পথে তিনি তাঁর সৈন্যদলের অগ্রভাগে থাকতেন–তাঁর আগে বা পরে খুব অল্প মহিলাই এ কাজটি করেছেন। কিন্তু, আমাদের শুরু করতে হবে একেবারে গোড়া থেকে।

বেগম সমরুর স্বামী সোমব্রের আসল নাম ছিলো ওয়াল্টার রেইনহার্ডট কিন্তু অজানিত নানা কারণে তিনি নাম নেন সোমব্রে যেটা অচিরেই এদেশিয় হিন্দুস্থানি ভাষায় সমরু হয়ে দাঁড়ায়। তিনি ছিলেন ডাকাবুকো প্রকৃতির মানুষ। এবং এটা প্রকাশিত হয় যখন তিনি বাংলার নবাব কাশিম আলির অধীনে চাকরি করতেন। কাশিম আলি ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি পাটনায় ইংরেজদের আক্রমণ করেন এবং বিরাট সংখ্যার ইংরেজদের ঘরবাড়ি অধিকার করে নেন। তারপর হুকুম দেন ওই ইংরেজদের হত্যা করার।

কাশিম আলির দেশিয় অফিসাররা তাঁর হুকুম পালন করতে এগিয়ে আসেননি। এগিয়ে এসেছিলেন সোমব্রে। তাঁরই নেতৃত্বে ঘটেছিলো ১৪৮ জন ইউরোপিয়ানের অমানুষিক হত্যাকাণ্ড। সে হত্যাকাণ্ডের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হয়েছিলো বার্ষিক বিবরণীর খাতায়।

এই ঘটনার প্রতিশোধ নেবার জন্যে এক ব্রিটিশ সৈন্যদল তাঁকে বন্দী করার আগেই তিনি কাশিম আলির চাকরি ছেড়ে দেন। তিনি মোট বারো থেকে চোদ্দ জনের অধীনে চাকরি করেন। তাঁর সর্বশেষ চাকরি দিল্লির বাদশা শাহ আলমের অধীনে। শাহ আলম তাঁকে চাকরির জন্যে ৬৫,০০০ টাকা এবং দু'ব্যাটেলিয়ান সৈন্য দিতে রাজি হয়েছিলেন। দিল্লি কোর্টে চাকরি কালে সোমব্রে দিল্লি থেকে চল্লিশ কিলোমিটার উত্তরে সারধানাতে একটি জায়গীর লাভ করেন। সেখানে বাড়িঘর বানিয়ে বসবাস শুরু করেন। তিনি এদেশিয় পোশাক পরতে শুরু করেন আর তৎকালীন ধনীদের দেশিয় প্রথানুসারে একটি হারেম রাখেন।

এই সারধানাতেই বসবাসকালে তিনি এক সুন্দরী মহিলার প্রেমে পড়েন। একজন ঐতিহাসিকের অনুমান, সেই মহিলা ছিলেন এক অভিজাত মুঘল পরিবারের মেয়ে। অপর একজনের অনুমান, তিনি ছিলেন একজন কাশ্মিরী নর্তকী আর একজন বলেছেন, তিনি ছিলেন খোদ মহম্মদের বংশের মেয়ে। যাই হোক, পরবর্তীকালে তিনি হন সোমব্রের বেগম।

১৭৭৮ সালের ৪ মে ৫৮ বছর বয়েসে সোমব্রে আগ্রায় মারা যান।

সোমব্রের মৃত্যুর পর তাঁর সৈন্যদল এবং সারধানার জায়গীর ইত্যাদির সব কিছুরই মালিকানা বর্তায় তাঁর বেগমের। এরপর বেগম খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নেন। এবং রোমান ক্যাথলিক অনুগ্রহে তিনি 'জোয়ানা নোবিলিস' খেতাব পান তিনি তাঁর দায়িত্ব ঠিকমতই পালন করেছিলেন কিন্তু নিজের অফিসারদের কাছ থেকে তিনি ভালো ব্যবহার পাননি। কেবলমাত্র বেশির ভাগ দুর্নীতিপূর্ণ অফিসার তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছিলো এবং তাদের দুর্ব্যবহার সৈন্যদলে বিদ্রোহের ইন্ধন যুগিয়েছিল। বেগম তাঁর সৈন্যদল পরিচালনার

বেগম সমরু, ডান হাতে সারধানার জায়গীর প্রাপ্তির বাদশাহী ফরমান
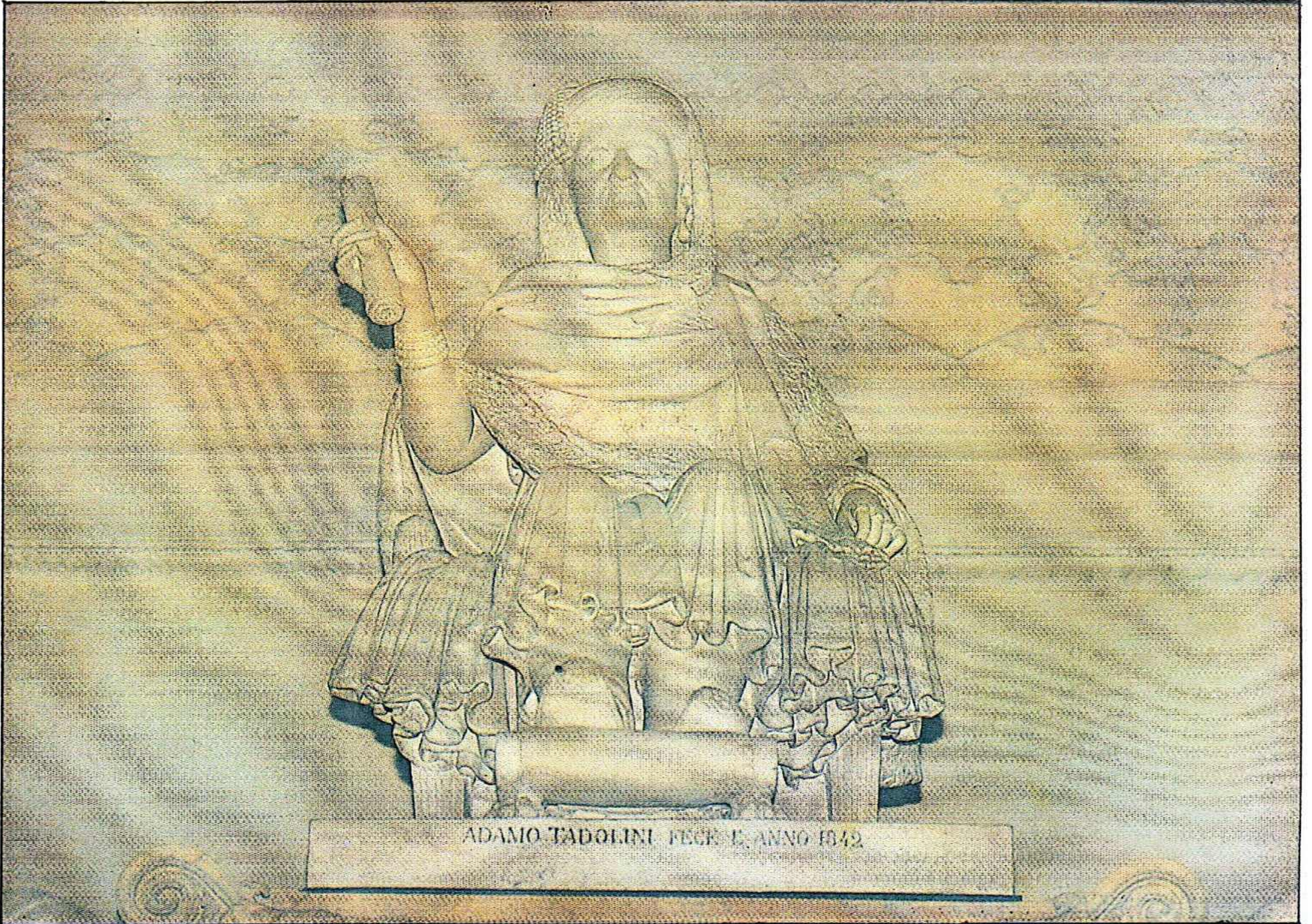
দায়িত্ব দিয়েছিলেন পাউলি নামের এক জার্মানকে। হতে পারে পাউলি তাঁর স্বামীর দেশের লোক ছিলো তাই কিন্তু পাউলিকে দায়িত্ব দেবার পেছনে এ ছাড়াও বহু গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিলো। পাউলি নৃশংসভাবে খুন হয়েছিলেন ১৭৮৩ খৃস্টাব্দে, আর যারা তাকে খুন করেছিলো তারাও বেশিদিন বেগমের আজ্ঞাবহ রইলো না।

এই সময় বেগম সমরুর সৈন্যবাহিনীতে জর্জ থমাস নামের এক আইরিশ ভদ্রলোক গুরুত্ব পান। বেগম সমরু থমাসকে দেখেই পছন্দ করেছিলেন এবং তাঁর হাতে সৈন্যদলের পরিচালনার ভার তুলে দিয়েছিলেন। থমাসের ব্যবহার ছিলো মধুর। তিনি ছিলেন লম্বা, সুপুরুষ। অন্যান্য যে সব ইউরোপিয়ান বেগমের অধীনে চাকরি করতেন তাদের মধ্যে শারীরিকভাবে সবেচেয় সুন্দর ছিলেন পাউলি। কতোদিন পাউলি বেগমের কৃপাধন্য ছিলেন? মাত্র কয়েক মাসের জন্যে পাউলি ছিলেন বেগমের বিশ্বস্ত অফিসার এবং প্রেমিক। তারপর বেগম অন্য একজনকে খুঁজে নিয়েছিলেন তাঁর প্রেমিক হিসেবে। নিছক একাকিত্বের মুহূর্তে ডাক পড়তো থমাসের।

এই ব্যবস্থায় থমাসও অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বেগমের প্রেমে পড়ার মতো ভুল না করে ভালোবাসা চালিয়ে যেতে লাগলেন। বেগম তাঁকে যেভাবে ব্যবহার করতেন তিনি বেগমকে সেভাবে ব্যবহার করতেন। তিনি কখনই বেগমের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি, বেগম কিন্তু তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন।

এর বহুবছর পরে–থমাস যখন বেগমের চাকরি ছেড়ে পানিপথ এবং কারনালের যুদ্ধে নিজের দক্ষতা প্রমাণিত করেছেন, বেগম সমরু এক সিপাহী বিদ্রোহের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং সাহায্যের জন্যে থমাসের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। বেগম থমাসের চরিত্র খুব ভালোভাবেই জানতেন। তিনি জানতেন তাঁর জায়গীরে তিনি বন্দী হয়ে আছেন জানলে অন্য সকলে সাহায্যের বদলে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবে। কিন্তু থমাস তাঁর মতো সুন্দরীর সাহায্যে এগিয়ে আসবেনই।

তখন বেগম–এর বয়স ছিলো পঁয়তাল্লিশ, যদিও বয়সের ছাপ পড়েছিলো মুখে, কিন্তু গায়ের চামড়া ছিলো তখনও মসৃণ ও সুন্দর, চোখ দুটো ছিলো আয়ত, কৃষ্ণকায় ও সজীব। সারধানাতে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিলো তার কারণ ছিলো ভ্যাসল্ট নামক এক ফরাসীকে তাঁর নতুন স্বামী হিসেবে গ্রহণ করা।

থমাসের মতো ভ্যাসল্টের তেমন বন্ধুবান্ধব ছিলো না। আর প্রকৃতপক্ষে লে ভ্যাসল্ট কিছু সুযোগ সুবিধা পাবার জন্যে বেগমকে সাত তাড়াতাড়ি বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক, কিন্তু তাঁর চরিত্রেই ছিলো মানুষজনের কাছ থেকে দূরে সরে থাকা। ফলে মানুষের অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তিনি। বেমগকে বিয়ে করার পর তিনি সৈন্যদের সঙ্গে থাকা বা তাদের সমগোত্রীয় ভাবতে অস্বীকার করতে শুরু করেন। এর ফলে সৈন্যরা এবং অফিসাররা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তারা বেগমকে হটিয়ে দিয়ে সোমব্রের প্রথম পত্নীর ছেলে বালথাজার সোমব্রেকে আনার পরিকল্পনা করেন। সোমব্রের প্রথম পত্নী তখন জীবিত ছিলেন (তিনি ১৮৩৮ সালে প্রায় একশো বছর বয়েসে মারা যান)।

জর্জ থমাসের এক বন্ধু লেগোইস হরিয়ানায় থমাসের এলাকা আক্রমণ করায় বেগমকে বিরত করার চেষ্টা করেছিলেন, ফলে লে ভ্যাসল্ট তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিলেন। সে কারণেই লেগোইস-এর অনুগত সৈন্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলো। তখন বাধ্য হয়ে বেগম ও তাঁর নতুন স্বামী উত্তর ভারতের অনুপশর–এ পালিয়ে গিয়েছিলেন। ব্রিটিশ আধিপত্যের বাইরে উত্তর ভারতের শেষ সীমানায়।

দিল্লি থেকে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন তাঁদের ধরার জন্যে। লে ভ্যাসল্ট এবং বেগম দুজনেই পালিয়ে যান। কিন্তু অচিরেই ধরা পড়েন। তখন দুজনেই ঠিক করেন বিদ্রোহীদের হাতে মৃত্যুর চেয়ে বরংচ আত্মহত্যাকেই বরণ করবেন। যখন সৈন্যরা তাঁদের ঘিরে ফেলেছিলো তখন বেগম ছুরি বের করে নিজের বুকে বসিয়ে দেন। আর নিজের পিস্তলের নল মুখে ঢুকিয়ে ট্রিগার টিপে দেন লে ভ্যাসল্ট। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তাঁর মৃতদেহ সে ভাবেই ফেলে রেখে চলে যায় সৈন্যরা।

বেগম কিন্তু বেঁচে যান। তাঁকে সারধানাতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ফাঁকা মাঠে দুটো কামানের মাঝে চেন দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। বেগমের ঝি লুকিয়ে তাঁকে যেটুকু খাবার দিত তাই খেয়ে কোনোরকমে বেঁচে থাকেন তিনি। থমাস তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন এবং বিদ্রোহ দমন করেন।

এরপর বেগমের সৈন্যবাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় কর্নেল স্যালুরকে। (একমাত্র ইউরোপিয়ান সৈনাধ্যক্ষ যিনি লিখতে পারতেন) কর্নেল স্যালুর ও অন্যান্যরা তাঁদের কর্ত্রীর আনুগত্য স্বীকার করে একটি দলিলে স্বাক্ষর করেন। এই দলিলের উপরে লেখা ছিলো 'ইন দ্য নেম অফ গড, এণ্ড অফ হিস ম্যাজেস্টি ক্রাইস্ট'!

১৮০৩ সালে মারাঠাদের পরাজিত করে ইংরেজরা যখন হিন্দুস্থানের (তখন উত্তর ভারতের এই নাম ছিলো) দখল নেয় তখন বেগমকে বন্দী করে আগ্রার কাছে জেনারেল লেক–এর কাছে পাঠানো হয়। জেমস স্কিনারের লেখা সুন্দর বর্ণনা আছে বেগমের জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাতের ঘটনাটির।

ইংরেজদের আনুগত্য স্বীকার করে নেবার পর বেগমের আয় বেড়ে যায়। তিনি তাঁর বেশির ভাগ সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেন। তিনি যেমন খুবই ধনী হয়ে ওঠেন তেমনি পরহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি রোমের পোপের কাছে ১,৫০,০০০ টাকা এবং ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপকে পাঠান ৫০,০০০ টাকা। মিরাটে তিনি একটি গির্জা নির্মাণ করান–যদিও সারধানার গির্জার মতো খ্যাতি তার নেই কিন্তু তা অনেক সুন্দর। সেখানকার রোমান ক্যাথলিক বিশপ ছিলেন যিনি তাঁর নাম ছিল জুলিয়াস সিজার! ১৮৩৬ সালের নব্বই বছর বয়সে বেগম সমরু যখন মারা যান তখন তাঁর সম্পত্তি ছিলো ৭০০,০০০ পাউণ্ড।

সারধানা চার্চের এতো বছরেও তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। গম্বুজটি ঠিকই আছে, কিন্তু উল্টোদিকে গম্বুজাকৃতি মিনার দুটো নষ্ট হয়ে গেছে। সেগুলো প্রকৃতপক্ষে মিনার নয়–পিরামিডের মতো স্তম্ভ–যেগুলো কোনো কাজেই লাগে না। ভিতরটা খুব সুন্দর এবং সংস্কার করা হয়েছে। কিন্তু প্রধান আকর্ষণ হলো এগারোটা প্রমাণ সাইজের মূর্তি এবং তিনটে বাস-রিলিফের প্যানেল। মার্বেল পাথরের এই স্মৃতিসৌধটি বোলোগনার এ্যাদামো তদোলিনি নামের এক ইতালিয় ভাস্করের তৈরি। বেগম তাঁর দামি পোশাকে চেয়ারে বসে রয়েছেন। তাঁর ডান হাতে গোটানো রয়েছে একটি দলিল–সেটা হলো সারধানার জায়গীর প্রাপ্তির বাদশাহি ফরমান। তাঁর ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সতীনপুত্র ডিক সোমব্রে এবং বাঁপাশে তাঁর মন্ত্রী দেওয়ান রায় সিং। তাঁর পিছনে বিশপ জুলিয়াস সিজার ও ইনায়েত উল্লাহ তাঁর সৈন্যবাহিনীর কম্যান্ডেন্ট।

প্যানেল তিনটির একটিতে আছে আর্চ বিশপকে উপহার দেবার সময় গির্জাকে পবিত্র করার দৃশ্য। একটিতে আছে ইউরোপিয়ান অফিসার দ্বারা পরিবৃত হয়ে বেগম দরবার চালাচ্ছেন। আর একটি বিজয়ের শোভাযাত্রায় হাতির পিঠে বসে আছেন বেগম।

আমাদের নিজেদেরই মনে হচ্ছিলো আমরা যেন অনধিকার প্রবেশকারী। আমাদের পদশব্দ নির্জন গির্জায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো। আমরা সেখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারিনি। সারধানাতে আর তেমন কিছু দেখারও নেই। আছে কেবল বেগমের প্রাসাদ–এখন যেটা স্কুল আর কিছু পুরোনো ঘরবাড়ি ও ধ্বংসস্তূপ। বেগমের সময়কার সেই জৌলুস আজ অন্তর্হিত। আজ সেখানে রয়েছে গরম, ধুলো আর নোংরা। আজ বিশ্বাস করা মুশকিল যে, এই সারধানাতেই ঘটে গেছে কতো নাটক, ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ আর প্রেমকাহিনীর অধ্যায়বৈচিত্র্য।

–রাস্কিন বণ্ড

ছবি: গণেশ শৈলী

৮৬ পৃষ্ঠার পর

কখনো রাজেশ খান্না কখনো বা রণধীর কাপুরের মনের গভীরে ডুব সাঁতার দিচ্ছেন।

এদিকে মুকেশ সম্পূর্ণরূপে কিট্টুর প্রতি মানসিকভাবে সমর্পিত। তাই কিট্টুর এই ব্যবহার তাঁকে পাগল করে তুলল। এবং বাস্তবিকই তাঁকে একদিন মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার আশ্রয় নিতে হলো। দিল্লির এই মহিলা চিকিৎসক যাঁকে সকলেই প্রায় সমব্যথী এবং আদর্শ চিকিৎসক হিসেবেই জানেন সেই আকাশ বাজাজও কিন্তু সময়ের প্রবাহ সূত্রে তাঁর প্রেমিকা হয়ে উঠলেন। মুকেশের বয়স তখন মাত্র ৩৫ আর আকাশের ৪৫ বছর। শুধু তাই নয় তিনি ছিলেন দুই কন্যার জননী ও ডিভোর্সী। কথায় আছে 'প্রীত না জানে রীত'। এ যেন সেই প্রবাদেরই বাস্তবায়ন, তাই দু'জনের উষ্ণ প্রেমালাপের রোমান্টিক এপিসোড আবার এক নতুন পথে বাঁক নিলো। দু'জনকে ঘিরে অনেক মুখরোচক গল্পও এখানে ওখানে শোনা যেতে লাগল—কিন্তু পরিণয়ের পরিণতি পর্যন্ত আর পৌঁছাতে পারলো না, তার আগেই রূপালী পর্দার রাজকন্যার তিরোন্দাজী আন্দাজ মুকেশকে জয় করে নিয়ে গেল।

সেদিন ছিল দিল্লির হৌজ খাস এলাকার 'হাই ফ্যাশান বুটিক'—এর পার্টি। যার কর্ত্রী দিল্লির উচ্চবিত্ত সমাজের মধ্যমণি বীণা রমানির ভাই গুলু লালবানি ছিলেন রেখার প্রেমাস্পদ। এই পার্টিতেই ভাগ্যচক্রে মুকেশের আবির্ভাব আর রীতিমাফিক আলাপের সূত্রপাত। রেখা মুগ্ধ মুকেশের সঙ্গে আলাপে। তাই পরিচয়ের সূত্র গড়াতে থাকলো পার্টি শেষের দিনগুলোতে। ইতিমধ্যে দুই সূত্রধরেরও সহযোগিতা মিলল এই কাহিনীর শাখা প্রশাখায়। মুকেশের বন্ধু রাকেশ মাথুর আর রেখার বন্ধু সুরিন্দর মাকন তাঁদের প্রেমপর্বকে ত্বরান্বিত করে পরিণয়ের গাঁটছড়া অবধি এগিয়ে দিলেন। ১৯৯০ —এর ৪ মার্চ রেখা আর মুকেশের বিয়ের খবর চারদিকে বেশ সোরগোল তুলল। এমন চমক যদিও রেখার চরিত্রেরই একটা অঙ্গ ছিল। তবুও যেন একটা রোমাঞ্চের গন্ধ নানা রকম গুজবের ঘেরাটোপে ঘুরপাক খাচ্ছিল বন্ধুবান্ধবদের আড্ডায়। রেখার 'প্রথম স্বামী' বিনোদ মেহরাকে নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল সেদিন। কিন্তু সে আর বেশি দিন পর্যন্ত নয়। এরই মাঝখানে রেখার মা হবার ঘোষণা—যা সাধারণ মানুষের মধ্যেও একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল, তা হলে রেখা এতদিনে গৃহিনী হলেন—ধরা দিলেন ভারতীয় আদর্শ নারীর ভূমিকায়। কিন্তু তেমন পরিণতি বোধ হয় বাস্তব জীবনীকারের পছন্দ ছিল না তাই রেখা আবার তার পূর্ব প্রেমিকদের রোমান্টিক এপিসোডে ফিরে যেতে চাইলেন। মুকেশের সঙ্গে তার সম্পর্কের বাঁধন ক্রমশই আলগা হতে লাগল। —এই নিয়ে মুকেশের পারিবারিক জীবনে আবার অশান্তি ফিরে এলো। রেখা ফিরে গেলেন তাঁর স্বপ্ন রাজ্য বোম্বের স্টারডমে। মুকেশের মা এবং বৌদি একবার শেষ চেষ্টা করতে রেখাকে ফিরিয়ে আনতে বম্বে গিয়েও বিফল হলেন। একরকম বিতাড়িতই হলেন তাঁরা রেখার বাড়ি থেকে। এদিকে মুকেশের মানসিক অবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে। ঘুমের বড়ি খেয়ে মুকেশ আত্মহত্যার চেষ্টাও করলেন এবার। সেই সময়েও আকাশ বাজাজ ঠিক সময়ে তাঁর সাহায্যদাত্রী হয়ে এগিয়ে এলেন। মুকেশ দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর সুস্থ হলেন। কিন্তু মুকেশ সে যাত্রা রক্ষা পেলেও মানসিক অশান্তি তাঁর ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল—বিশেষ করে তাঁর এই আত্মহত্যার চেষ্টায় রেখার কোনো রকম প্রতিক্রিয়া না থাকায়।

সুখস্মৃতির দিনগুলিতে

আর এই কারণেই মুকেশের দ্বিতীয় বার আত্মহত্যার চেষ্টা ও মৃত্যু এখনও রহস্যের আবর্তে। ২ অকটোবর দিল্লির উপকণ্ঠ গদইপুরে 'বসেরা' ফার্মহাউসে মুকেশ তাঁর আত্মহত্যার আগে যে দুটি চিরকুট রেখে গেছেন—তার একটিতে আত্মহত্যার জন্য তিনি নিজেকেই দায়ী করেছেন। আর অনুরোধ করেছেন তাঁর মৃতদেহের পোস্টমর্টেম না করার জন্য। আর অন্যটিতে তার ভাই অনিল আগরওয়ালকে অনুরোধ করেছেন আকাশ বাজাজ—এর ফ্যামিলিকে দেখাশোনা করার জন্য।

মুকেশ গলায় ফাঁস লাগিয়ে এই আত্মহত্যা করেন। এই আত্মহত্যার কারণ আর যাই হোক না কেন—সাধারণ বিচারে রেখাই এর জন্য দায়ী। কারণ বিয়ের মাত্র সাত মাসের মধ্যেই তার দু'বার আত্মহত্যার চেষ্টা। তাছাড়া এব্যাপারে রেখার প্রতিক্রিয়াও তেমন জানা যায় না। এই ঘটনার সময় রেখা ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তার স্বামীর মৃত্যুর খবর সেখানে তাকে দেওয়া হলেও এপর্যন্ত তার কোনো প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

রেখার মুকেশের সঙ্গে বিয়ে কি শুধুই এক আকস্মিক ঘটনা!

হারুণ অর রশিদ

৭১ পৃষ্ঠার পর

আলোড়ন তুলেছিল। কাহিনীটির ওই অভিনবত্ব অনেককেই আকর্ষণ করেছিল। রাতারাতি বেশ কয়েকটি নাটক সহ একটি ছবিও তৈরি হয়েছিল। ছবির নাম ছিল 'শেষ অংক'। কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার ছিলেন রাজকুমার মৈত্র। মূল-কাহিনীর শাঁসটুকু রেখে উনি সম্পূর্ণ বাঙালি ঢঙে যে গল্পটা সাজিয়েছিলেন তার প্রশংসা করতেই হবে। অত সার্থক কোর্টরুম ড্রামা বাংলা ছবিতে খুব কমই হয়েছে। সাম্প্রতিককালে ওই একই কাহিনী নিয়ে একটি হিন্দি ছবি তৈরি হয়েছিল। ছবিটার নাম 'খোঁজ'। সম্প্রতি ওই কাহিনীর ছায়ায় আরেকটি বাংলা ছবি হয়েছে। নাম 'মানসী'।

আলেকজাণ্ডার ডুমার বিখ্যাত উপন্যাস 'প্রিজনার অফ জেণ্ডা'র বাংলা সংস্করণ তৈরি করেছিলেন প্রখ্যাত লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম দিয়েছিলেন 'ঝিন্দের বন্দী'। তপন সিংহ ওই কাহিনী নিয়ে একটি বাংলা ছবি করেছিলেন। পরিচয়লিপিতে কোথাও মূলকাহিনীর স্বীকৃতি ছিল না। ছবিটির মুক্তির প্রায় বছর বারো পরে পরিচালক আলো সরকার তৈরি করেছিলেন 'বন্দী' নামে একটি ছবি। এতে শরদিন্দু বা মূল কাহিনীর কারোর কোনই স্বীকৃতি ছিল না। প্রথমবার ছবিটা ভালো চললেও দ্বিতীয়বার কিন্তু দর্শকেরা ছবিটা দেখতে চান নি মোটেই।

দস্তয়ভস্কির 'দি ইডিয়েট' উপন্যাসটি অবলম্বনে প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমরেশ বসু 'উল্টোরথ' পত্রিকার পূজা সংখ্যায় একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। রাতারাতি ওই কাহিনী নিয়ে পরিচালক সলিল দত্ত একটি ছবি করেছিলেন নাম ছিল 'অপরিচিত'। ছবিতে বা উপন্যাসে মূল কাহিনীর কোন স্বীকৃতি ছিল না। ছবি মুক্তি পাবার পর এ নিয়ে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সমরেশবাবু দস্তয়ভস্কির কাছে নিজের ঋণ স্বীকার করে নিয়েছিলেন। প্রয়াত ওই লেখকই বিখ্যাত 'লাভ ইন দ্য আফটারনুন' অবলম্বনে তৈরি করেছিলেন 'বিকেলে ভোরের ফুল'। এ ছবিতেও ছিল না কোন স্বীকৃতি।

পীযূষ বসু করেছিলেন 'জীবন জিজ্ঞাসা'। এটি তৈরি হয়েছিল টলস্টয়ের বিখ্যাত 'রেজারেকশন' অবলম্বনে। এতেও ছিল না কোন ঋণ স্বীকার। সমালোচকও শিক্ষিত দর্শকেরা এ নিয়ে যথেষ্ট লেখালেখি করেছিলেন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়।

তখন মানে ষাট সত্তর দশকে এদেশে কোন বিদেশি ছবি সফল হলে নির্মাতার সেই সাফল্যকে করায়ত্ত করার জন্য উঠে পড়ে লাগতেন।

এরকমই একটি ছবি হল 'রোমান হলিডে'। এ ছবিটির সাফল্যকে ধরার জন্য অন্তত তিনটি ছবি বাংলায় এ পর্যন্ত তৈরি হয়েছে। সর্বপ্রথম ওই বিষয়টি আত্মসাৎ করে ছবি করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন অধুনালুপ্ত 'যাত্রিক' গোষ্ঠি। তারা তাদের প্রথম ছবির জন্য 'চাওয়া পাওয়া' নামে যে কাহিনীটি নির্বাচিত করেছিলেন তা ছিল 'রোমান হলি ডে' প্রভাবিত। কাহিনীর অনেক রদ বদল হলেও বিদেশি ওই বিখ্যাত ছবিটার অবদান অস্বীকার করা যায় না। এরপর অজিত গাঙ্গুলি করলেন 'রাতের রজনীগন্ধা' নামে একটি ছবি। এর কাহিনীটি অবশ্য অজিতবাবুর লেখা নয়। এর লেখক হলেন নীহাররঞ্জন গুপ্ত। এটিও রোমান হলিডে' প্রভাবিত। পরবর্তীকালে প্রশান্ত দেব লিখলেন 'নায়িকা সংবাদ'। অগ্রদূত পরিচালিত এ ছবির প্রধান দুই শিল্পী ছিলেন উত্তমকুমার, অঞ্জনা ভৌমিক। সেই একই গল্প। বড়লোক কন্যার ইচ্ছে করে হারিয়ে যাওয়া এবং গরিব পাত্রকে পছন্দ করার কাহিনী। তিন ছবিতেই ওই একই কাহিনী নানা ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হয়েছে।

'সাউণ্ড অফ মিউজিক' সুপার সুপার হিট ছবির অন্যতম নিদর্শন হয়ে আজও আছে। সেই সহজ সরল কাহিনীর আলোকে মণি বর্মা তৈরি করেছিলেন 'জয়জয়ন্তী'র কাহিনী। কিন্তু ছবির কোথাও স্বীকারোক্তি ছিল না। মূল কাহিনীর কাছে ঋণস্বীকার করার কষ্টটুকুও কেউ করেন নি। যদিও তাতে সত্যকে দমিয়ে রাখা যায় নি। দর্শকেরা সকলেই বুঝতে পেরেছেন, এ কাহিনীর সফলতার পিছনে আসল রহস্যটা কি? প্রখ্যাত গুলজার ওই কাহিনী নিয়েই হিন্দিতে করেছিলেন 'পরিচয়'।

আলোকজাণ্ডার ডুমার বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস হল 'দ্য কাউন্ট অফ দ্য মন্টোক্রিস্টো'। সেই কাহিনী অবলম্বনেই তৈরি হয়েছিল বাংলা ছবি 'জীবন মৃত্যু'। উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী ছিলেন মুখ্যচরিত্রে। হীরেন নাগ ছিলেন পরিচালক। ছবিটা প্রধানত কাহিনী বৈচিত্র্যের গুণেই সফলতা পেয়েছিল। এবারেও মূলের প্রতি কোন আনুগত্য কেউ মেনে নেন নি। এমন কি একই কাহিনী নিয়ে হিন্দিতে একই পরিচালক একই নামে ওই ছবিটা করেন তখনও কোন কাহিনীসূত্র নিয়ে কোন ঘোষণা ছিল না।

ওই একই কথা বলা চলে কি একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে 'মাই ফেয়ার লেডি' অবলম্বনে 'ওগো বধূ সুন্দরী', 'টুয়েন্টি সিক্স পার্ক এভিনিউ' অবলম্বনে 'রোদন ভরা বসন্ত', 'লাভ স্টোরি' ভেঙে 'সেদিন দুজনে', 'থ্রি কমরেডস' নিয়ে 'ক্ষুধা', 'পেরেন্ট ট্রাপ' অনুকরণে 'শুভ সংবাদ' প্রভৃতি ছবিগুলির ক্ষেত্রে।

আশির দশকের ছবিগুলির সম্পর্কে কিছু বলার আগে দেশী কাহিনী অদলবদল করে নির্মিত তিনটি ছবি নিয়ে দু'চার কথা বলা যেতে পারে।

পঞ্চাশ দশকে পরিচালক সত্যেন বসু মনোরঞ্জন ঘোষের কাহিনী নিয়ে 'পরিবর্তন' নামে একটি জনপ্রিয় ছবি তৈরি করেছিলেন। বেশ কয়েক বছর পর ওই একই কাহিনীর মহিলা সংস্করণ পরিচালক রাজকুমার রায় চৌধুরী 'দুষ্টু মিষ্টি' নাম দিয়ে একটি ছবি করেছিলেন। দু'টি ছবিতেই ছিল আশ্চর্য মিল।

পরিচালক বিমল রায় পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি বোম্বেতে একটি ছবি করেছিলেন। 'মা' নামে ওই ছবিটা জনপ্রিয়ও হয়েছিল খুব। আশির দশকে শর্বানী ভট্টাচার্যের কাহিনী নিয়ে পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় 'সংসারের ইতিকথা' বলে একটি ছবি করেছিলেন। এ দু'টি ছবিতে ছিল অসম্ভব মিল।
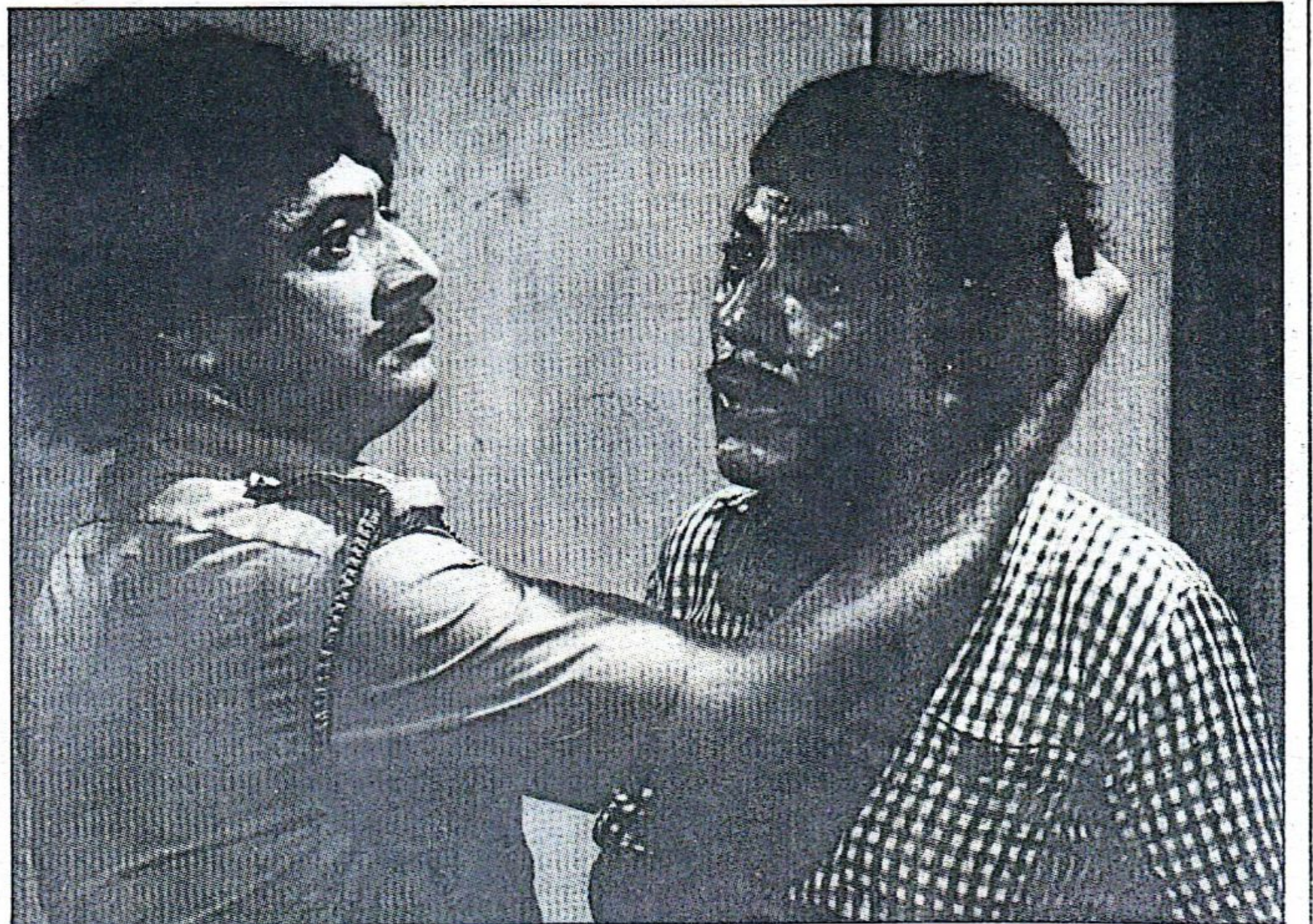
'শত্রু', হিন্দির ছায়ায় তৈরি বাণিজ্যসফল বাংলা ছবি

ওই একই ধরনের মিল লক্ষ্য করা যায় পার্থপ্রতিম চৌধুরী পরিচালিত 'রাজবধূ' ছবির সঙ্গে সুশীল মজুমদার পরিচালিত অতীতের বিখ্যাত ছবি 'যোগাযোগ' এর। বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না পার্থবাবু 'যোগাযোগ' এর দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত ছিলেন। দুটি কাহিনীর মধ্যে ছিল অসম্ভব মিল। বলাবাহুল্য সাহিত্যিক সমরেশ বসু ওই একই কাহিনী একটু এদিক ওদিক পাল্টে লিখেছিলেন 'নাটের গুরু' নামে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসটি।

মোটামুটি ভাবে ১৯৮০ সালের ২৪ জুলাই উত্তমকুমার মারা যাবার পর বাংলা ছবি থমকে যায়। কিভাবে, কোন কাহিনী বললে দর্শকেরা দেখবেন তা কিছুতেই নির্মাতারা ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। শুরুতে যে বাংলা সাহিত্যের দিকে তারা মুখ ঘোরান নি, তা নয়। কিন্তু নির্মাণের ত্রুটিতে সে ছবির একটিও জনপ্রিয়তা পায় নি। ফলে আবার সেই অসহায় অবস্থা।

এ সময়েই ঘটল অঞ্জন চৌধুরীর আবির্ভাব। ওঁর প্রথম ছবি ছিল 'শঠে শাঠ্যং'। পরিচালক ছিলেন দীনেন গুপ্ত। এ কাহিনীটি ছিল বিখ্যাত হিন্দি ছবি 'রাম আউর শ্যাম' অনুকরণে রচিত। ছবিটি দর্শকেরা গ্রহণ করেন নি।

ওই ছবিটির কিছুদিন আগে পরিচালক কনক মুখার্জি 'রাম আউর শ্যাম' এর মহিলা সংস্করণ 'সীতা আউর গীতা'র হুবহু নকল করে 'এই তো সংসার' নামে একটি ছবি করেছিলেন। মহুয়া রায় চৌধুরী ছিলেন দ্বৈত চরিত্রে। এ ছবিটিও দর্শকেরা ভালমত নেননি।

'এই তো সংসার' এর শোচনীয় রিপোর্ট দেখেও অঞ্জন চৌধুরী সাহস করে 'শঠে শাঠ্যং' লিখেছিলেন। অবশ্য তার ফলও একই হল। তা যে অঞ্জনবাবুকে খুব একটা দমিয়ে দিয়েছে তা বলা যায় না। কেননা তৃতীয় ছবির কাহিনীর মূল অংশটা উনি খুব মাথা খাটিয়ে সংগ্রহ করেছিলেন রাজেশ খান্না আর মমতাজ অভিনীত বিখ্যাত 'দুশমন' থেকে। অরবিন্দ মুখার্জি পরিচালিত 'প্রায়শ্চিত্ত'ও ভাল ব্যবসা করে নি।

বিভিন্ন সময়ে অঞ্জন চৌধুরীর কাহিনী প্রসঙ্গে নানা অভিযোগ উঠেছে। সর্বশেষ ছবি 'দেবতা' ও এর ব্যতিক্রম নয়। যে কোন ছবির সাফল্যের মূল উপাদানটিকে অবিকৃত রেখে বাকি অংশটুকু আদ্যপান্ত বদল ঘটিয়ে পুরোপুরি বাঙালি মেজাজে (অবশ্যই চড়া সুরে) উনি যে কাহিনীটি পরিবেশন করেন, তা অবশ্যই আলাদা মাত্রার দাবি জানাতে পারে। তবু কোথায় যেন একটা কিছু থেকেই যায়।

বিভিন্ন সময়ে অঞ্জন চৌধুরী রচিত কাহিনীর মধ্যে অন্য বিখ্যাত যে সব ছবির প্রভাব পড়ার অভিযোগ উঠেছে তার তালিকাটি এইরকম : বৌমা (নসিব আপনা আপনা), অভিমান (আগর তুম না হোতে), দেবতা (দয়াবান), ছোট বৌ (শ দিন শ্বাস কি), বন্দিনী (ঠগিনী), শতরূপা (হারানো সুর), গুরুদক্ষিণা (শাপমোচন), মহামিলন (দ্বীপ জ্বেলে যাই) প্রভৃতি।

বোম্বাইয়ের ব্যবসায়িক ছবির সরাসরি অনুবাদের কাজটা সম্ভবত প্রথম শুরু করেন পরিচালক তপন ভট্টাচার্য 'মমতা' ছবিতে। এটি ছিল বিখ্যাত বোম্বাইয়ের ছবি 'ফুল আউর পত্থর' এর অন্ধ অনুকরণ। ছবিটা ব্যবসায়িক সফলতা একদমই পায় নি। এ ব্যাপারটি কিন্তু কাউকেই ভাবায় নি। ফলত পরবর্তীকালে অনুকরণ প্রবণতা থেকেই গেছে।

পরিচালক হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় বিখ্যাত একটি জাপানী ছবির কাহিনীর অনুকরণে তৈরি করেছিলেন 'আনন্দ' ছবিটি। পরিচালক সুখেন দাস ওই কাহিনীটির প্রধান অংশটা রেখে তৈরি করেছিলেন 'জীবন মরণ'। পরে পরিচালক অর্ধেন্দু চ্যাটার্জি কাহিনীকার হিসাবে হৃষিবাবুর নাম দিয়ে 'আনন্দ' এর বাংলা অনুবাদ 'জীবন' তৈরি করেন। হুবহু অনুবাদ হওয়ার জন্যই হোক কি নির্মাণগত ত্রুটির জন্যই হোক 'জীবন'কে দর্শকেরা সে ভাবে নেন নি।

ছায়াছবির কাহিনীকার হিসাবে প্রযোজিকা দীপ্তি পাল ইতিমধ্যে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু তার আপাততঃ মুক্তিপ্রাপ্ত চারটি ছবির মধ্যে দু'টি ছবির কাহিনী নিয়ে অনুকরণের অভিযোগ উঠেছে। ছবি দু'টি হল, অমরসঙ্গী (ববি), আমার তুমি (প্যার ঝুক্‌তা নেহি)।

ওই একই ধরনের অভিযোগ উঠেছে, 'ঝংকার (স্বরগম), 'আক্রোশ' (জ্যোতি বনে জোয়ালা), 'মানদণ্ড' (জখমি আওরাত), 'অমর প্রেম' (যব প্যার কিসিসে হোতা হ্যায়) 'আশা' ওহ সাতদিন) তুফান (ইয়াদো কি বরাত), শত্রুপক্ষ (দীবার), 'প্রতীক' (ত্রিশূল) 'প্রতিকার' (আজ কি আওয়াজ) প্রভৃতি ছবির নামে।

বর্তমানে ভারতীয় চিত্র নির্মাতাদের কাছে ব্যবসা সফল ছবি বলতে প্রতিশোধ ফর্মুলার ছবিকেই বোঝায়। রিভেঞ্জ স্টোরির সুবিধা হল
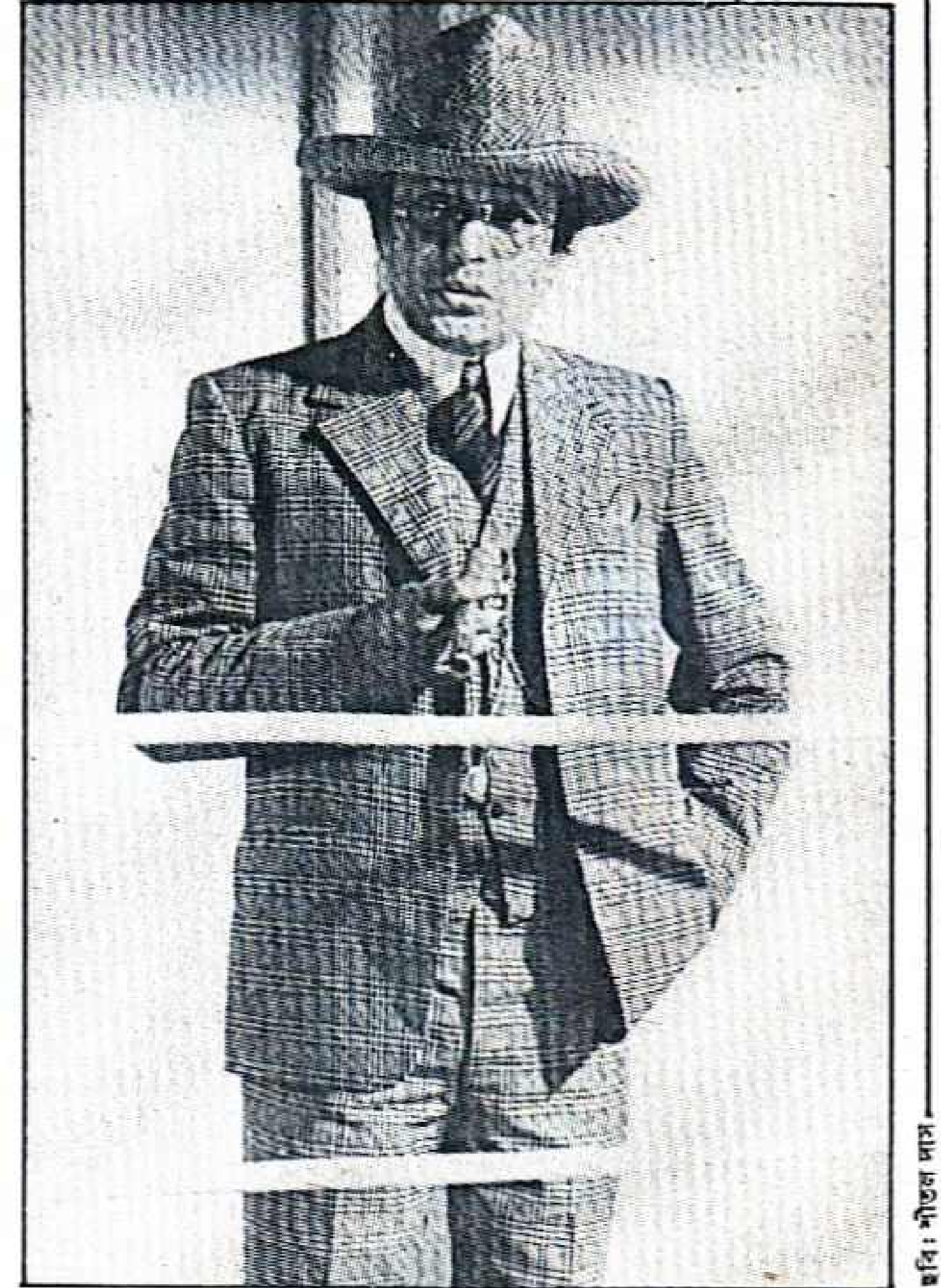
উত্তম বিহনেই কি বাংলা ছবির হিন্দি-অনুসরণ?

মারদাঙ্গামার্কা ছবিতে আমদানীকৃত বম্বের ভিলেন

এতে ইচ্ছেমত সেক্স-ভায়োলেন্স ব্যবহার করা যায়। সম্ভবত এর সূত্রপাত হয় 'ডেথ উইশ' নামে বিখ্যাত বিদেশি ছবিতে। সারা বিশ্বে ছবিটা চূড়ান্ত ব্যবসা করে, আর প্রতিশোধ স্পৃহা সকলের মধ্যেই কম বেশি থাকে। টান টান নাটকও এ জাতীয় ছবিতে খুব ব্যবহার করা যায়। সব মিলিয়ে জমজমাট ব্যাপার। তাই এখন শতকরা পঁচানব্বুইটি ছবিতেই রিভেঞ্জের কাহিনী ঘুরে ফিরে আসে।

প্রতিশোধ প্রধানতঃ তিন ভাবে দেখা যায়। এক, অত্যাচারিত মানুষটি সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে নিজেই হাতে আইন তুলে নিচ্ছেন। দুই, দুর্বৃত্তের অত্যাচারে নিহিত পাত্রের পুত্র বা কন্যা বড় হয়ে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিচ্ছে। তিন, দুই মাফিয়া দলের রেষারেষি।

একটু মনে করে দেখুন গত কয়েক বছর আপনি যে সব ভারতীয় ব্যবসায়িক ছবি দেখেছেন তার মধ্যে লাভ স্টোরি গুলি বাদ দিলে বেশির ভাগই ওই তিন ফর্মুলায় ফেলা ছবি। বাঙালি চিত্র নির্মাতারাও এর ব্যতিক্রম নন। তাই বারে বারে এসেছে প্রতিশোধের সস্তা কাহিনী।

এ মুহূর্তে সাম্প্রতিককালের যে সব বাংলা ছবি ওই ফর্মুলায় তৈরি হয়েছে তার তালিকাটি এই রকম: 'আগুন' (পরিচালনা ভিক্টর ব্যানার্জি), 'অপরাধী' (নন্দন দাশগুপ্ত), 'অন্তরঙ্গ' (দীনেন গুপ্ত), 'আলিঙ্গন' (তপন সাহা), 'অঙ্গার' (শ্রীনিবাস চক্রবর্তী) 'আমানত' (শান্তনু ভৌমিক), 'আমার শপথ' (প্রভাত রায়), 'মন্দিরা' (সুজিত গুহ), 'আবিষ্কার' (সলিল দত্ত), 'আশা ও ভালবাসা' (সুজিত গুহ), (আঘাত (দেব সিংহ) 'দেবীবরণ' (শ্রীকান্ত গুহঠাকুরতা), 'ওরা চারজন' (শমিত ভঞ্জ), 'ফয়সালা' (রাজ), 'বদনাম((শিবু মিত্র), 'কয়েদী' (টনি জুনেজা), 'কলঙ্ক' (শান্তিরঞ্জন ঘোষদস্তিদার), 'মর্যাদা' (চিরঞ্জিত) প্রভৃতি।

এতো গেল ফর্মুলা-সর্বস্ব ব্যবসায়িক ছবি। এছাড়াও কাহিনীর মিল এবং কিছু ছবিতে কাহিনীকারের নাম না থাকার প্রসঙ্গটিও উল্লেখ করা যেতে পারে।

বাংলা ছবির পরিচালকেরা কি বম্বের দিকে তাকিয়ে!

দীর্ঘদিন গবেষণা করে মদন ব্যানার্জি প্রায় ভুলে যাওয়া এন্টনী ফিরিঙ্গির জীবনী উদ্ধার করে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। কিন্তু সুনীল ব্যানার্জির ছবি 'এ্যান্টনী ফিরিঙ্গি'তে কোন কাহিনীকারের নাম উল্লেখ ছিল না। একে পরিশ্রম আত্মসাৎ ভিন্ন আর কিই বা বলা যায়।

প্রখ্যাত কাহিনীকার বনফুল 'বর্ণচোরা' নামে একটি কাহিনী লিখেছিলেন। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ছবিটা পরিচালনা করেছিলেন। ষাট দশকের মাঝামাঝি মুক্তিপ্রাপ্ত ওই ছবির সঙ্গে সঙ্গেই সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত ছবি 'দেয়া নেয়া'তে কিন্তু কাহিনীকার হিসাবে কারোরই নাম ছিল না।

ওই ভাবেই আপনি একটু চিন্তা করলেই মিল খুঁজে পাবেন, সুরের আকাশে'র সঙ্গে 'সুরের সাথী'র, 'প্রতিকার' এর সঙ্গে 'বিদ্রোহী'র, 'উৎসর্গ'র সঙ্গে 'মায়ের আশীর্বাদ' এর, 'অতিথি'র সঙ্গে 'পলাতক' এর 'সমাপ্তি'র সঙ্গে 'নতুন পাতা'র, 'সাগিনা মাহাতো'র সঙ্গে 'ধনরাজ তামাং' এর, বিমল কর রচিত 'ঘুঘু' নাটকের সঙ্গে তরুণ মজুমদারের বিখ্যাত ছবি 'ভালবাসা ভালবাসা'র।

তালিকা আরও দেওয়া যায়। কেননা চুরির শেষ নেই। লক্ষ্যণীয় দিক হল, যে অর্থনৈতিক লাভের জন্য আত্মসাতের ঘটনা ঘটে তা কি সবার ভাগ্যে জোটে?

মোটেই না। চুরি করা কাহিনী নিয়ে ক'টি ছবি দর্শক-অভিনন্দন অর্জন করতে পেরেছে? বিশেষ করে দেশি কাহিনী থেকে যে সব বাংলা ছবিগুলি হয়েছে তার মধ্যে ক'টি ছবি জনপ্রিয় হয়েছে? আর হবেই বা কি করে, আসল কাহিনীটাই তো দর্শকেরা গ্রহণ করেন নি। হিন্দি ছবিটাই ছিল সুপার ফ্লপ। সেই কাহিনী অবলম্বনে তৈরি বাংলা ছবিই বা দর্শকেরা দেখবেন কেন? এক্ষেত্রে অবশ্য নির্মাতাদেরও বিশেষ কিছু করার নেই, কেননা বেশি জনপ্রিয় ছবির উপকরণ তারা নিতে পারেন না, তাতে ধরা পড়ে যাবার খুবই সম্ভাবনা থাকে। তার চেয়ে কমজোরি কোন কাহিনী নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে ধরা পড়ার সুযোগ থাকে কম। কিন্তু ধরা পড়তেই হয়। সত্য কি কখনও চাপা দেওয়া যায়? জানাজানি হবেই, কি ভাবে দুই আর দুইয়ে চার হয়েছে দর্শকেরা ঠিকই জানতে পেরে যান।

এখন মুক্তি প্রতীক্ষায় আর নির্মীয়মান অবস্থায় যে সব বাংলা ছবি রয়েছে তার মধ্যে বেশ কয়েকটি ছবি তৈরি হচ্ছে অনুকরণ প্রথায়। যে যে হিন্দি ছবি থেকে গল্পগুলি চুরি করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে 'খুন ভরি মাঙ্গ', 'সাচ্চা ঝুটা', 'এ ওয়াদা রহা', 'ইয়াদো কি বরাত', 'দিবার', 'ডিস্কো ড্যান্সার', 'স্বয়ং সিদ্ধা' প্রভৃতি ছবির কাহিনী।

ওই সব ছবির কতটা সফলতা আশা করা যায়? বাংলা ছবির হালচাল এখন খুবই শোচনীয়-দিক বিভ্রমে বাংলা ছবি এখন একই পথে বারে বারে ঘুরপাক খাচ্ছে, স্বকীয়তা হারিয়ে সে ক্রমশই নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। এ অবস্থায় ফর্মুলা সর্বস্ব নকল ছবি কতটা জীবনসুধা বহন করে আনতে পারে, তা আর নতুন করে বলে দেবার দরকার নেই। একটা সময়ে সারা ভারতবর্ষ তাকিয়ে থাকত টালিগঞ্জের দিকে, আমাদের বাংলা ছবির গুণাবলীগুলি ওরা অনুকরণ করার চেষ্টা করত—আর আজ আমরা ওদের বাতিল উচ্ছিষ্টগুলি সুখাদ্য ভেবে গ্রহণ করে চলছি।

এই কি সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের সব থেকে বড় উদাহরণ নয়? ব্যবসায়িক বাংলা ছবি কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল আমাদের প্রাপ্তির ঘরে অন্যতম বড় আমানতকারি আর আজ তারই আরেক নাম অবক্ষয়। সময়ে কত কিছুই না বদলায়!

তপন রায়

৪৫ পৃষ্ঠার পর

যেদিন পিণ্ডদানকারী মানুষটি গয়ায় এসে পৌঁছয়, সেদিন থেকে তাঁর শুরু হয় আত্মসংযমের পালা। ওই দিন থেকে সংযম, স্বচিন্তন, বন্ধন। যজ্ঞের শেষ পর্যন্ত ওই সংযম চলে। 'চরণপূজা' অনুষ্ঠানে পিণ্ডদানকারী মানুষটি প্রেতাত্মা, দেবতা এবং দেবী ও প্রাচীন ঋষি, মৃত্যুর রাজা যম তথা পিতৃতর্পন অনুষ্ঠান ফল্গু নদীর কিনারে সম্পন্ন হয়। ব্রাহ্মণ পুরোহিত এই অনুষ্ঠানটি করে থাকেন। তর্পনকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলি যথাক্রমে–'দেব তর্পন', 'ঋষি তর্পন', 'যম তর্পন' ও 'পিতৃ তপন' বলা হয়। পিতৃ তর্পন–এ পিতা, পিতামহ এবং অন্যান্য পূর্ব পুরুষদের নামে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, তারপর মাতার পূর্ব পুরুষদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হয়। বিশেষ তর্পনে অকালমৃতদের জন্য প্রার্থনা করে থাকেন তার আত্মীয়-স্বজনেরা।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান–এর নাম পিণ্ডদান। চালের তৈরি গোল লাড্ডুকে পিণ্ড বলা হয়। পিণ্ডদান ছাড়াও আলাদা কিছু জায়গাতেও চালের পিণ্ড দেওয়া হয়ে থাকে। পিণ্ডদানের সব থেকে বড় কেন্দ্র বিষ্ণুপদ মন্দির। এই পিণ্ডপ্রদানের বিস্তৃত পদ্ধতি রয়েছে। শ্রাদ্ধ কার্যে তর্পন তথা পিণ্ডদান পুজোর দুটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। এরপর শ্রাদ্ধকর্তা দ্বিতীয় শ্রাদ্ধস্থলে যান, যেখানে মূর্তি বা গাছের সামনে পিণ্ডদান করতে হয়। এখানে পিণ্ডদানের প্রক্রিয়া অনেকটাই আলাদা। এখানে ধর্মস্থল পুষ্করণীর রূপে, এখানে জলতর্পন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া এখানে বেশ কিছু জায়গা আছে যেগুলি প্রেত বা আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। রামশিলায় শুধু যমের পুজো হয়, এখানে দুটি কুকুরকে পিণ্ডদান করার রীতি চালু আছে।

এই প্রেতশিলাতে প্রথমে প্রেত দেবতা এবং দেবীর পুজো হয়। তারপর অন্য এক পবিত্র স্থানে কাকবলী ক্রিয়া করা হয় যেখানে কাকের পুজো দেন মৃতের বংশধরেরা। নরকের কাককে পুজো দেবার জন্য এই পদ্ধতি। শ্রাদ্ধকর্তা কোন পুষ্করণীতে এসে তর্পন করে যেখানে বৈতরণী পুষ্করণীর মহত্ব রয়েছে। বৈতরণী পুষ্করণী সম্পর্কে জানা যায় যে এখানে এখানকার নদী ধরিত্রী থেকে স্বর্গ পর্যন্ত বয়ে গেছে। এই পুষ্করণীতে স্নান এবং তর্পন করলে নরকের পাপ দূর হয় বলে ধর্মীয় বিশ্বাস। কেউ কেউ পূর্বপুরুষদের নামে গরু অথবা ষাঁড় উৎসর্গ করে থাকেন।

এই গয়া শহরের উৎপত্তি নিয়ে একটি প্রাচীন কাহিনী রয়েছে। বায়ুপুরাণের ১০৫–১০৬ অধ্যায়ে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশ্বসৃষ্টিকারী ব্রহ্মার জন্ম হয় ভগবান শ্রী বিষ্ণুর নাভি থেকে উত্থিত এক পদ্ম থেকে। বিষ্ণুর আদেশে ব্রহ্মা প্রাণীর সৃষ্টি করেন। ভগবান তাঁর উগ্র স্বভাবের অনুসারে অসুরের এবং নম্র মানবিক স্বভাবের করে সৃষ্টি করলেন দেবতাদের। অসুরদের মধ্যে গয়াসুরের ছিল প্রচণ্ড শক্তি এবং সে ছিল শ্রীবিষ্ণুর পরম ভক্ত। গয়াসুর কোলেশ্বরী পর্বতে কয়েক হাজার বছর ধরে এমন ভয়ানক তপস্যা শুরু করে যে দেবতারা ভীত হয়ে ব্রহ্মার কাছে এসে বলেন, 'হে ভগবান, আপনি গয়াসুরের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন। ব্রহ্মা, তাঁদের আবেদন শুনে ভগবান শংকরের কাছে যেতে বলেন। শিব তাঁদের বলেন যে তাঁদের রক্ষা করার জন্য শ্রীবিষ্ণুর সহায়তা দরকার। তখন প্রত্যেকেই শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। তিনি তাঁদের গয়াসুরের কাছে যেতে বলেন এবং তাঁদের পেছন পেছন রওনা দেন। দেবতারা সন্ত্রস্ত হয়ে তাকে বলেন, 'হে গয়াসুর, আপনি কেন আমাদের সন্ত্রস্ত করছেন–আপনার তপস্যায় আমরা যার–পর–নাই সন্তুষ্ট, আপনার প্রার্থনার কথা জানান, আমরা পূরণ করে দেব। তাঁদের কথা শুনে গয়াসুর জানালেন যে যদি আপনারা আমার তপস্যায় তুষ্ট হন তাহলে আমার শরীরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরের থেকে বেশি পবিত্রতা দান করুন। এবং সমস্ত দেবতা, ব্রাহ্মণ, নদী, পুষ্করণী থেকেও আমাকে পবিত্র করুন। 'তথাস্ত' বলে দেবতারা ফিরে গেলেন স্বর্গে। এর ফলে যে কেউ গয়াসুরকে স্পর্শ করবেন, তিনিই পাপমুক্ত হবেন এবং সরাসরিই ব্রহ্মলোকে যেতে পারবেন। এই বরের ফলে মৃত্যুর রাজা যমের কোন কাজই রইল না। তিনি পড়লেন অথৈ জলে। উপায়ান্তর না দেখে যম ইন্দ্রদেব ও অন্য দেবতাদের গিয়ে ধরলেন। ব্রহ্মা সব শুনে বললেন, তুমি শ্রীবিষ্ণুর কাছে যাও। তিনিই তোমার ব্যবস্থা করবেন। যম শ্রীবিষ্ণুর কাছে যাওয়ার পর তিনি সব শুনে বললেন তুমি যাও, গয়াসুরের শরীরের একটি অংশ চেয়ে নাও যজ্ঞ করার জন্য। দেবতারা গয়াসুরের কাছে পৌঁছলেন। ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাদের দেখে গয়াসুর রীতিমত আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। ব্রহ্মা বললেন, হে গয়াসুর, পৃথিবীর কোনও স্থানই আমার সাধনার জন্য পবিত্র নয়। তুমি শ্রীবিষ্ণুর আশীর্বাদ প্রাপ্ত। তুমি আমাকে তোমার পবিত্র শরীর প্রদান কর। গয়াসুর বললেন, আমার কি পরম সৌভাগ্য যে আপনি আমার শরীর গ্রহণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমার পূর্বপুরুষরা পবিত্র হবে যদি আপনি আমার শরীর গ্রহণ করেন। আপনাদের দ্বারাই এই শরীর রচিত হয়েছে, আবার আপনাদেরই তা কাজে লাগলে আমি ধন্য হব।' এই কথা বলে গয়াসুর কোলাহল পর্বতের দক্ষিণে পা রেখে উত্তর দিকে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। ব্রহ্মা অন্যান্য দেবতাদের নিয়ে যজ্ঞ শুরু করলেন। এবং আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে গয়াসুরের শরীর স্থির নয়, মৃদু মৃদু কাঁপছে। এই দেখে তিনি যমরাজকে ডেকে বললেন, যাও ঘর থেকে ধর্মশিলা নিয়ে এসে গয়াসুরের মাথায় রাখ। যমরাজ তা করার পরও গয়াসুরের শরীর দুলতে লাগল। তখন তিনি শিব ও অন্যান্য দেবতাদের বললেন যে আপনারা ধর্মশিলার ওপর বসে পড়ুন। তখনও গয়াসুর কাঁপতে লাগলেন। অনন্যোপায় হয়ে তিনি শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। শ্রীবিষ্ণু ক্ষীরসাগর থেকে বেরিয়ে এসে অবির্ভূত হয়ে গদাধর রূপে ধর্মশিলার ওপর বসলেন। ব্রহ্মাও বসলেন, সঙ্গে গণেশ, লক্ষ্মী, সীতা, গৌরী মঙ্গলা, গায়ত্রী, সাবিত্রী, ত্রিসন্ধ্যা একসাথে বসার পর গয়াসুরের শরীর গতিহীন হয়ে গেল। ক্ষুব্ধ গয়াসুর

পিণ্ডদানের আগে ফল্গু নদীতে স্নান

পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করছেন তীর্থযাত্রীরা

জিজ্ঞেস করলেন, কেন আপনারা এ রকম করছেন যখন আমি আমার নিজের শরীর ব্রহ্মাকে ইতি-মধ্যেই দান করেছি । কেন, আমি কি বিষ্ণুর অনুরোধে শান্ত হইনি ? কেন আপনারা সকলে মিলে আমাকে অভিশাপ দিচ্ছেন ? দেবতারা বল-লেন, আমরা তোমার ওপর বড়ই প্রসন্ন । বল, কি বর চাও ? তখন গয়াসুর বললেন, যতক্ষণ চন্দ্র সূর্য তারা পৃথিবী পর্বত রয়েছে, ততদিন বিষ্ণু ও মহেশ এই ধর্মশিলার ওপর বসে থাকবেন। আপনারা অর্থাৎ দেবতারাও বসে থাকবেন। এবং এই স্থান আমার নামানুসারে গয়া হবে। এই ভাবেই গয়া নামের উৎপত্তি । গয়াসুরের সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করার পর গয়ায় এসে যারা তর্পণ পিণ্ডদান করেন, তাদের পূর্বপুরুষরা ব্রহ্মলোকে চলে যান। গয়াসুরের চরণ স্পর্শ করার পর সকলেরই পাপ-মুক্তি ঘটে ।

গয়াসুরের ওপর রক্ষিত 'ধর্মশিলা' পাথর নিয়ে আকর্ষণীয় একটি গল্প চালু আছে । যমরাজের মেয়ের সঙ্গে ব্রহ্মার পুত্র ঋষি মারীচের বিবাহ সম্পন্ন হয় । ব্যস্ততা থাকার দরুন ব্রহ্মা সেই বিয়েতে যোগ দিতে পারেন নি । একদিন যমরাজ কন্যা ধর্মব্রতা মারীচের পায়ের কাছে শুয়েছিলেন সেই সময় ব্রহ্মা এসে হাজির । নিজের স্বামী নিদ্রামগ্ন ধর্মব্রতা ব্রহ্মার পা স্পর্শ করতে উদ্যত হলেন । এই সময় মারীচের নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং স্ত্রীকে দেখতে না পেয়ে মারীচ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন । ক্রোধে অন্ধ মারীচ ধর্মব্রতাকে শাপ দিয়ে পাথরে পরিণত করলেন । পরে যখন তিনি বুঝতে পারলেন ধর্মব্রতা নির্দোষ তখন তিনি আবার ধর্মশিলাকে স্পর্শ করে পুরনো রূপে ফিরিয়ে দিলেন। ওই পাথরটিই ধর্মশিলা নামে খ্যাত । পরে দেবতারাও ওই পাথরের বুকে পবিত্র যজ্ঞ সম্পাদন করেন ।

এই কারণে ধর্মশিলা গয়াসুরের বুকের ওপর প্রোথিত করা হয়। এবং যজ্ঞ করার জন্য সকল দেবতা একত্র হন । ব্রাহ্মণেরা এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করে তাঁদের যজ্ঞে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেন। তখন ব্রহ্মা কুশ থেকে ১৪ গোত্রের ১৪ জন ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করলেন । যজ্ঞ শেষে যখন গয়াসুর উঠবার চেষ্টা করলেন তখন বিষ্ণু ধর্মশিলার ওপর পা রেখে নামিয়ে দিলেন । এভাবেই ধর্মব্রতার মুক্তি হয়। দেবযজ্ঞ করার সময় ব্রহ্মা রচিত 'ব্রহ্ম কল্পিত ব্রাহ্মণকুল' যজ্ঞের পর নিজের জীবিকা নিয়ে বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন । যজ্ঞের পরে তিনি দৈবী ভোজনের স্বাদ গ্রহণ করেন । এই অভাবের জন্য ব্রহ্মা ফল্গু ও সরস্বতী নদীর সঙ্গমে এক নতুন নদীর জন্ম দেন । যে নদীতে মধুর স্রোত বয়। এই নদীর নাম মধুসর্বা। এছাড়া তিনি ব্রাহ্মণ-দের আশীর্বাদ করলেন তোমাদের হাত সর্বদাই আশীর্বাদের জন্য উত্থিত হবে। এ কারণে গয়াবাসী ব্রাহ্মণরা পিণ্ডদানের সময় শুধু আশীর্বাদ করে থাকেন।

পিণ্ডদান তাঁরা নিজেরা করেন না। কারণ দক্ষিণা নেবার জন্য হাত তুললে তা বিবশ হয়ে পড়বে। তবে ব্রহ্ম কল্পিত ব্রাহ্মণদের নিয়ে বিতর্কও আছে । ওদের সৃষ্টি করার সময় স্ত্রী ব্রহ্মকল্পিতা ব্রাহ্মণী সৃষ্টি করা হয়নি । এ কারণে ওরা অন্য ব্রাহ্মণ স্ত্রীদের বিবাহ করলে তাদের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয় । মাধবাচার্যদের গুরু প্রদ্যুম্নাচার্য স্পষ্টই বলেছেন, 'আপনারা কি ব্রহ্মাকে নেহাৎ বোকা ঠাউরেছেন ? তিনি ১৪ জন ব্রাহ্মণকে সপত্নী সৃষ্টি করেছেন। এভাবেই বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে। গয়াবাসী ব্রাহ্মণ যাঁরা পিণ্ডদান করে থাকেন তাঁদের ব্রহ্মকল্পিত ব্রাহ্মণ বলা হয় । এঁদের কথা বায়ু পুরাণ, গরুড় পুরাণে উল্লেখ রয়েছে ।

ট্র্যাজেডি হল, ব্রহ্মার পরিকল্পনা সৃষ্ট ব্রাহ্মণ নিজ ধর্মপরায়ণতা এক অসুরের প্রতি নির্দিষ্ট এবং হিন্দু সমাজের মানুষেরা এক অসুরের সহায়তায় পিতৃ-পুরুষকে পাপ থেকে মুক্ত করে থাকেন ।

ব্রহ্মার এই নিয়ম পরিহাস ছাড়া আর কি বলা যায় !

বিকাশ কুমার ঝা

ছবি : সঞ্জীব ব্যানার্জি

৪৪ পৃষ্ঠার পর

শিবালিক অঞ্চলে পৌড়ি, গাড়োয়াল ও নৈনিতাল জেলার অন্তর্গত কর্বেট ন্যশনাল পার্ক ভারতের প্রথম জাতীয় পার্ক। এই পার্কের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট হলো যে এর সীমায় কোনো দেওয়াল বা বেড়া নেই। ৫২৯ বর্গ কিলোমিটারের এই বিশাল পার্কে শাল, শিশু, সেগুন প্রভৃতি গাছ প্রচুর পরিমানে আছে। বর্ষাকালে বিভিন্ন ঝোপঝাড় গজিয়ে আরও ঘনো হয়ে ওঠে ঐ জঙ্গল। তখন ঐ জঙ্গল বাঘ, চিতা, হাতি, ভাল্লুক প্রভৃতি বন্য জন্তুদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

১৬ জুলাই নেগী বাকি সুরক্ষা কর্মীদের নিয়ে চারটি অনুসন্ধান দল গঠন করেন। এবং তাদের প্রশিক্ষিত হাতির পিঠে করে ঘনো জঙ্গলে ঢুকে জগ্গার খোঁজ করার আদেশ দেন।

সারাদিন তল্লাশীর পর বিকেল চারটে নাগাদ একটা দল জঙ্গলের এক জায়গায় কিছু জিনিসপত্র পড়ে থাকতে দেখে। ওখানে তাঁবু উঠিয়ে নেওয়ার চিহ্ন আর উনুন ছিলো। এর ফলে বোঝা যায় যে জগ্গা সেখানে সাময়িক ডেরা পেতেছিলো। এ খবর নেগীকে জানানো হয়।

নেগী ঘটনাস্থলে যান। ঘটনাস্থলটি ছিলো কর্বেট পার্কের পটরে পানি রেস্ট হাউসের প্রায় ৬কিলোমিটার দূরে একটা ছোটো টিলার নিচে। ওখানে তাঁবু খাটানোর চিহ্ন ছাড়াও বিন্নি হুইস্কির খালি বোতল, সিগারেটের টুকরো, পাঁউরুটির কভার, ডিমের খোসা, খালি দেশলাই বাক্স, উনুনে আধপোড়া কাঠ ইত্যাদি পড়ে থাকতে দেখা যায়।

নেগী টাওয়ারের রক্ষীদের নির্দেশ দেন, যে কোথাও ধোঁয়া দেখলে যেন তাঁকে জানানো হয়।

১৭ জুলাই চিড় চৌটি টাওয়ারের এক রক্ষক তার দূরবীনে দেখতে পায়–টাওয়ার থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে লক্কড়ঘাট রেস্ট হাউসের কাছে সাতজন লোক একসাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা কোন দিক থেকে এসেছিলো বা কোন দিকে গেছে তা সে বুঝতে পারেনি। যাইহোক, এই খবরের ভিত্তিতেই ঐ জায়গায় তিন কিলোমিটার এলাকা তন্নতন্ন করে খোঁজ করা হয় কিন্তু কাউকে পাওয়া যায় না।

১৮ জুলাই বিকেল পাঁচটা নাগাদ লক্কড়ঘাট রেস্ট হাউসের কাছে বরসাতি নালা থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। নেগীর নির্দেশ মতো নৌটিয়াল এবং বন্যপ্রাণী প্রতিপালক গোরখনাথ যাদব ২৬ জন সশস্ত্র রক্ষক নিয়ে ঐ এলাকা ঘিরে ফেলেন।

সেখানে জঙ্গল খুবই ঘন ছিলো। ঐখানে পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিলো। নৌটিয়াল এবং যাদব আগে আগে যাচ্ছিলেন। জগ্গা এবং তার সঙ্গীসাথীদের বন্দুকের ভয় ছাড়াও বন্য জন্তু জানোয়ারের ভয়ও ছিলো। নৌটিয়াল এবং যাদব একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে দেখতে লাগলেন।

ঐ জায়গায় একটা তাঁবু খাটানো ছিলো।
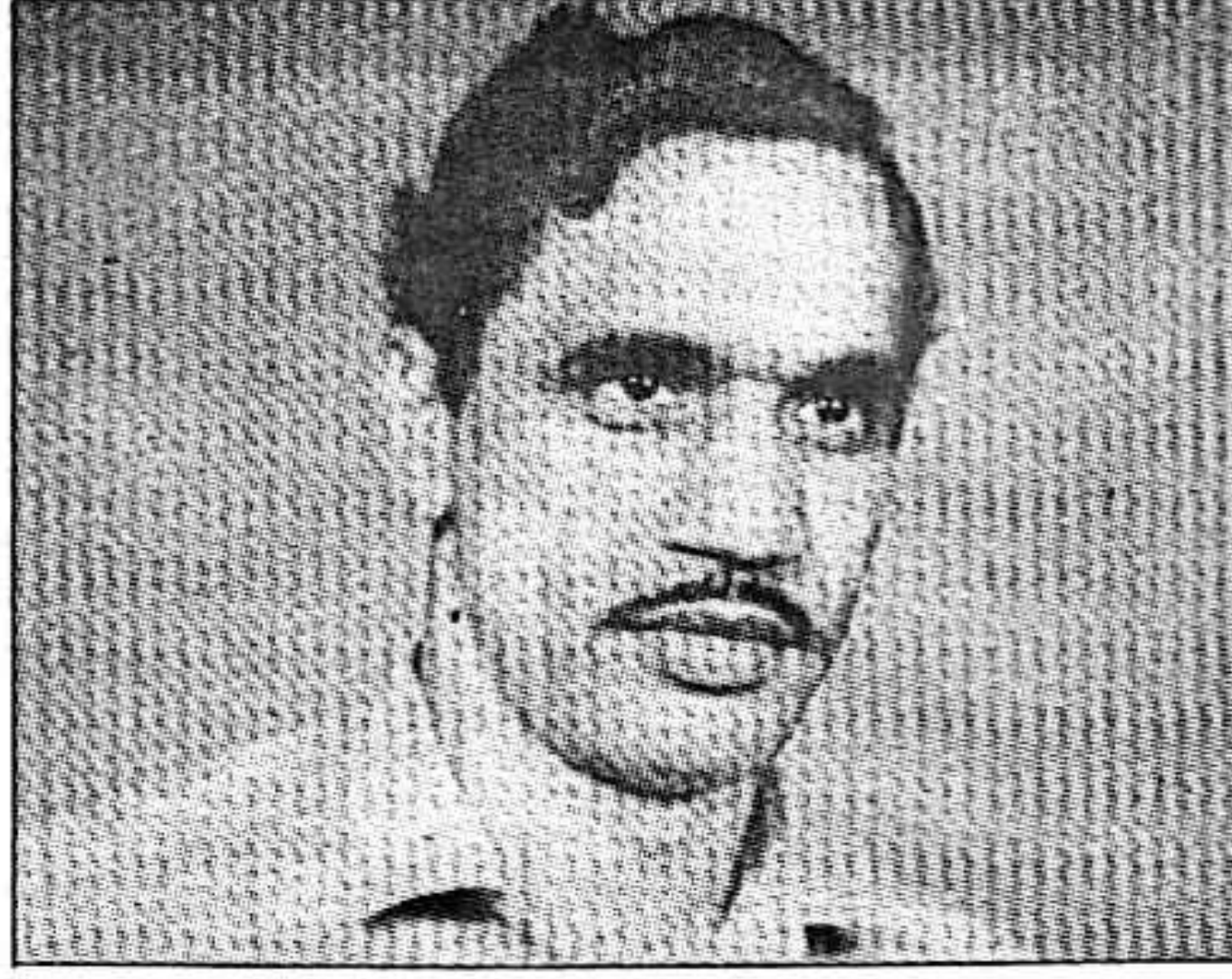
ন্যাশনাল পার্কের কনজারভেটর জি.এন.যাদব

তাঁবুর ভেতর দড়ি দিয়ে ঝোলানো ছিলো জ্বলন্ত লণ্ঠন। কাপড় দিয়ে লণ্ঠনটি আড়াল করা, যাতে আলো তাঁবুর বাইরে না আসে। তাঁবুর ভেতর কয়েকটা ক্যানেস্তারা আর কয়েকটা পোঁটলা নজরে এলো। তাঁবুর বাইরে জ্বলন্ত উনুনে একটা বড়ো পাত্র চাপানো ছিলো।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও কাউকে দেখা গেলো না। দুই অফিসার ভাবছিলেন বনকর্মীদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে সবাই পালিয়ে গেলো, না লুকিয়ে পড়ে জগ্গা এবং তার দলবল আক্রমণের জন্যে তৈরী হচ্ছে।

হঠাৎ 'খটাক' শব্দে লণ্ঠন ভেঙে গেলো। অন্ধকারেই তাঁবু থেকে মালপত্র সরিয়ে নিয়ে যাবার শব্দ কানে এলো, যাদব সার্চ লাইট জ্বালানোর হুকুম দিলেন। দেখা গেলো, জগ্গার কয়েকজন সঙ্গী তাঁবু তোলার চেষ্টা করছে। আলো দেখে তারা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো। আর সেখান থেকেই সাঁচলাইট লক্ষ্য করে গুলি চালালো।

যাদব আলো নেভানোর সঙ্কেত দিলেন। অন্ধকারে ডুবে গেলো চারদিক। যাদব জগ্গাকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'তোমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। ভালো চাও তো অস্ত্র ত্যাগ করো।'

কোনো জবাব এলো না ওপক্ষ থেকে। তখন যাদব গুলি চালানোর হুকুম দিলেন। দু'পক্ষই গুলি বিনিময় করতে লাগলো। বনরক্ষীদের গুলিতে জগ্গার এক সঙ্গী ঘায়েল হলো। ও পক্ষ থেকে গুলি চালানো বন্ধ হয়ে গেলো।

নৌটিয়াল আর একবার সাবধান করে দিলেন। কিন্তু অস্ত্র ত্যাগের বদলে ও পক্ষ থেকে আবার গুলি ছোঁড়া শুরু হলো।

কর্মীরা অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে প্রায় রাত দশটা নাগাদ পটরে পানি রেস্ট হাউসে নিয়ে এলো। নেগী আগে থেকেই সেখানে ছিলেন।

জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেলো যে, জগ্গা ১৯৭৬ সাল থেকেই এই পার্ক থেকে বন্য জন্তু মেরে তার ছাল বিক্রি করে। এক ধরনের লোহার তৈরী ফাঁদ পেতে সে বাঘ, চিতা ইত্যাদি ধরে। আরো জানা গেলো যে, এইসব জন্তুর ছাল সে দিল্লিতে রঞ্জিত মালিক নামে এক ব্যক্তিকে বিক্রি করে। তবে তার ঠিকানা জগ্গা জানে না। যখন মাল দরকার হয় তখন রঞ্জিত নিজেই যোগাযোগ করে। চাঁদনি চকের এক জায়গায় মাল দেওয়া নেওয়া হয়।

জগ্গার বক্তব্য অনুযায়ী, রঞ্জিত ঐ ছাল ফ্রান্স এবং ব্রিটেনে বিক্রি করে। দাম মেলে, বাঘ এবং চিতার ছাল ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা। আর রঞ্জিত জগ্গাকে দেয় ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা।

চুরি ডাকাতি থেকে জগ্গা এই ব্যবসায় হঠাৎই আসে। ১৯৭৬ সালে এক ডাকাতি কেসে জড়িয়ে পড়ে সে। পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্যে নিজের ছেলে ১৬ বছরের রাম সিংহকে নিয়ে পার্কের কালাগড় রেঞ্জে লুকোয়। একদিন রাতে তারা চিতার সামনে পড়ে। নিজেদের জীবন বাঁচাতে ঐ চিতাকে গুলি করে মারে। হঠাৎ তার মনে হয় চিতার ছাল বিক্রি করা যায়। সে চিতার ছাল ছাড়িয়ে নেয়। ছাল নিয়ে বহুদিন সে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু বিক্রি করার লোক খুঁজে পায়না। শেষে দিল্লিতে দারা নামে এক বন্ধুর সূত্রে রঞ্জিতের সঙ্গে তার আলাপ হয়। রঞ্জিত ঐ ছাল আট হাজার টাকায় কেনে এবং বলে গুলি করে ছাল খারাপ না করলে আরো বেশি দাম পেতো জগ্গা। রঞ্জিত আরো বলে যে জগ্গা যদি মাল দিতে পারে সে আরো নিতে রাজি আছে। জগ্গাও রাজি হয়। রঞ্জিত পাঁচটা ছালের অর্ডার দেয় এবং ১০ হাজার টাকা এ্যাডভান্স দেয়।

জগ্গা ঠিক সময়ে মাল সাপ্লাই করতে পারে না। কেননা, তার একার পক্ষে এতোগুলো ছাল সংগ্রহ করা সহজ ছিলো না। সে তখন লক্ষণ সিং ও অমরজিৎ সিং নামে দুই ভাইকে দলে নেয় এবং প্রতিবছর ১৫ জুন থেকে ১৫ নভেম্বর–এই সময়ের মাঝে সে শিকার করতে থাকে। কেননা, ঐ সময় পার্ক পর্যটকদের জন্যে বন্ধ থাকে আর জানোয়ারও বেশি পাওয়া যায়।

১৯৯০ সালের মার্চে রঞ্জিত একটা বড়ো অর্ডার দেয়। ১৫ টা চিতা, ১০ টা বাঘ এবং ৫ টা ভাল্লুকের চামড়া। এই কারণেই আরও লোকের দরকার হয়। মোহনলাল, নত্থুরাম এবং রামকিষণকে দলে নেওয়া হয়।

গ্রেপ্তারের পর অভিযুক্তদের কাছ থেকে দুটো চিতার ছাল, দুটো দেশি রিভলবার, প্রচুর কার্তুজ, চারটে রামপুরী ছুরি, টর্চ, লোহার ফাঁদ ও কিছু খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যায়। ১৯ জুলাই অভিযুক্তদের পৌড়ি আদালতে পেশ করা হয়।

খোঁজখবর নিয়ে জানা যায়–দারা কিছুদিন আগে একটা দুর্ঘটনায় মারা গেছে। আর রঞ্জিত মালিকের কোনো খোঁজই পাওয়া যায়নি। অনুমান–জগ্গা হয়তো মিথ্যে নাম বলেছে অথবা রঞ্জিত মালিক ঐ ব্যক্তির ছদ্মনাম।

লক্ষ্মীদত্ত ম্যান্দোলিয়া